স্বাধীনতাব স্বাদ প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র

লেখকের কথা

এই উপন্যাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিনবছর আগে—শেষ হয় '৫৭-এর গোড়ার দিকে।

এক

দারুণ গুমোট-করা বর্ষার দুপুর। আকাশটা যেন গাঢ় ভাপ্‌সা চাপ হয়ে নগরের বুকে চেপে নেমে এসেছে, মরা বাতাস নড়ে না। শ্মশানপুরীর মতো চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম, জনহীন রাজপথ। কদাচিৎ দু-একটি গাড়ি সচল শঙ্কার মতো হুস পার করে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ক্রমাগত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুতপদে হেঁটে চলেছে দু-একজন পথিক। চারিদিকে ভয়, জমজমাট কৃত্রিম আতঙ্কে। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসে। সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও টের পাওয়া যায় তীক্ষ্ণ কুৎসিত হিংসার ধার। দোকানগুলি বন্ধ, রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলির একটি ঘরের জানালাও খোলা নেই। কোনো জানালার পাট একটু ফাঁক করে, কোনো জানালার খড়খড়ি একটু তুলে ক্ষণিকের জন্য ভয়ার্ত ক্লিষ্ট মুখ উঁকি দেয়।

এর মধ্যে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখা যায়। গলির মোড়ের কাছে বড়ো রাস্তার মাঝখানে থেমে ট্যাক্সিটা একজন প্রৌঢ় বয়সি ভদ্রলোক ও একটি যুবককে নামিয়ে দেয়।

রাস্তার এদিকের এলাকায় গলির মধ্যে কারফিউ। ট্যাক্সিতে ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন শিখ—এদের সাথে না নিয়ে দেড় টাকার পথে পনেরো টাকায় আসতেও ট্যাক্সিটা রাজি হয়নি। দোষ দেবে কে ? মৃত্যুর আতঙ্কে থমথম করছে চারিদিক, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করা যায়, জীবনের মূল্য নিয়ে কে দরদস্তুর করবে ? গুমোটে ঘেমে ঘেমে প্রমথর শরীর ভিজে গিয়েছিল, এতক্ষণে কেঁপে শিউরে উঠল জলে-ভেজা কুকুরের গা-ঝাড়া দেবার মতো !

সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে প্রমথ ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বারংবার সে তাকাচ্ছে প্রণবের দিকে। প্রণবের দীর্ঘ বেঢপ দেহ, মোটা কাপড়েব বিনা নীলে সাবান-কাচা পাঞ্জাবি, চশমা আর সিগারেট তার আশা, ভরসা ও সাহস।

ডাস্টবিনের ময়লা ছাপিয়ে উঠে রাস্তায় ছড়িয়েছে, পচে গেঁজে উঠেছে পরশুর মুষলধার বৃষ্টিতে। ভাড়া পেয়েই ট্যাক্সিটা দিশেহারার মতো সেই ছড়ানো ময়লা তছনছ করে এ এলাকা থেকে বেরিয়ে গেল। চার পা শূন্যে তুলে পড়ে আছে মরা কুকুরটা, বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। মানুষের পচা কুৎসিত মৃত্যুর সত্য ও বাস্তব প্রতীকের মতো। সন্তর্পণে কয়েকটি খড়খড়ি উঠল কয়েক বাড়ির কৌতূহলী জানালায়, বন্ধ পানের দোকানের পাটাতন ফাঁক করে উঁকি মারল দুটি পশ্চিমদেশীয় মুখ। গলির মুখে দোতলা বাড়ির রকের ছায়ায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত পাগলির উলঙ্গ দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে ঝিমোচ্ছিল, ধীরে ধীরে উঠে এসে গরম পিচের তপ্ত তাপে ক্ষণেক মোহাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাঁকা আঙুলগুলি আধ সোজা করে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ঝেঁঝে বলল, পয়সা দে !

মৃতপুরীর প্রেতিনীর মতো তার সর্বাঙ্গ আলস্যে শিথিল, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ—জীবন্ত প্রখর সূর্যালোকে মানুষ যখন ইটের কোটরে কোটরে আত্মগোপন করে থরথর কাঁপছে, একা সে রানির মতো ভয়ার্ত মুহ্যমান জগৎকে জয় করে পথে দাঁড়িয়ে তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে পথিক-প্রজার কাছে খাজনার মতো দাবি করছে ভিক্ষা !

এই অকথ্য অস্বাভাবিকতাই যেন গায়ের জোরে হয়েছে স্বাভাবিক !

ভাগেন মশাইরা, ভাগেন ! কোথাকার বোকা হাঁদা ? পালান, পালান !

যে চেঁচায় তাকে দেখা যায় না, কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গাঢ় স্তব্ধতায় এমন-ভাবে হারিয়ে মিশিয়ে যায় গলার আওয়াজ বনে-জঙ্গলে গভীর রাত্রে নিশাচর পাখির আচমকা

চিৎকারের মতো যে পরক্ষণে খটকা লাগে সত্যই কেউ চেঁচিয়েছে কিনা ! তারপর একদিক থেকে মিলিটারি ট্রাকের ঘর্ঘর ধ্বনি দ্রুতগতিতে চড়তে চড়তে ভেসে এসে সব শব্দের রেশ আর নিঃশব্দতা ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। হাত ধরে প্রমথকে প্রণব গলির মোড় থেকে অপর দিকের ফুটপাথে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারফিউ এলাকার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো নিরাপদ কিনা জানা নেই। অনেক কিছুই জানা নেই। কীসে কী হয় বোঝা অসাধ্য। কার আইন, কেই বা জানে, মানেই বা কে।

গা ছমছম করছে, প্রণব।

এত দূর এসে দু পা যেতে ? এই গলি তো ?

দ্বিধার সঙ্গে প্রমথ সায় দেয়। এই সংশয়ের জন্যই এতক্ষণ ইতস্তত করা, হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকে পড়তে মন সরছে না। এমনভাবে বদলে গিয়েছে পথটার চেহারা, এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে চিনিয়ে দেবার চিহ্নগুলি যা স্মৃতিকে সাহায্য করতে পারত। দর্জির একটা দোকান ছিল মনে আছে, ওই আধপোড়া কালচে-মারা ঘরটা কি সেই দর্জির দোকান ? সারি সারি রঙিন কাপড় ব্লাউজ ফ্রক শুকোত একটা দোতলা বারান্দায়, তারই উপরে তেতলার বারান্দায় ফেলা থাকত চিক—ওই যে খাঁ-খাঁ করছে শূন্য বাড়িটা, মানুষ নেই, জামাকাপড় নেই, চিক নেই, জানালা দরজা এলোমেলোভাবে হাঁ করে অথবা বন্ধ হয়ে আছে, ওটা কি সেই বাড়ি ? গলিটা জনহীন। গলিতে স্রোতের মতো একটানা আনাগোনা ছিল মানুষের।

প্রণব বাস্তববাদী মানুষ, বাস্তব অবস্থার অভাবনীয় উদ্ভট পরিবর্তন ঘটলে বিচলিত হয়, দিশেহারা হয় না।

এ ঠিকানায় ওরা না-ও থাকতে পারে !

প্রমথ একটু ইতস্তত করে বলে, না, এখানেই আছে। চিঠি পেয়েছি।

মণি চিঠি লিখেছে ? আশ্চর্য তো। কদিন আগে ?

চার-পাঁচদিন হবে।

চার-পাঁচদিন ! প্রণব মনে মনে ঝাঁঝালো কৌতুক অনুভব করে। দশ-বিশবছরের লোকজনে ভরপুর বাড়ি একবেলায় বিনা নোটিশে খালি হয়ে যাচ্ছে, প্রমথ হিসাব ধরেছে চার-পাঁচদিন আগে পাওয়া চিঠির ! মুখে সে কিছু বলে না। প্রাণের মায়া প্রমথর কম নয়, বিপদের পরিমাণটাও তার অজানা নেই। তাকে আরও বেশি ভড়কে দিয়ে কোনো লাভ হবে না।

হ্যাঁ, তার নিজেরই লাভের হিসাব। টাকাপয়সা নামযশের লাভ নয়। কালোবাজার লাভালাভের ব্যাকরণগত মানে পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছে। প্রণবের হিসাবে লাভ নেই মানে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেটা পালন করা, সম্পন্ন করার জন্য প্রমথকে ভড়কে দিয়ে লাভ নেই !

এটা সত্যই আশ্চর্য যে নিজেও সব দেখেশুনে ভালো করে অবস্থা বুঝেও আর না এগোবার কথা প্রমথ একবারও বলেনি। এখানে এসেও ফিরে যাবার কথা সে ভাবছে না, তাহলে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিত না। প্রাণের মায়া যত থাক, যতই ভীরু তার প্রকৃতি হোক, ভয়ে বিবর্ণ আধমরা হয়েও সে বাকি পথটুকু এগিয়ে যাবে !

হয়তো একেই মনের জোর বলে ! প্রণব জানে না। তার এত ভয়ও নেই, এত বেশি মনের জোরের দরকারও তার হয় না। সবটাই তার কাছে অভিনব।

গলির ভেতরে একটু এগোলেই মণিমালাদের বাড়ি, বেশি দূর নয়। হয়তো কোনো বিপদ ঘটবে না। কারফিউ ভাঙার জন্য তো নয়ই।

দাঁড়িয়ে লাভ নেই, যেতে যদি হয় চলুন।

গলির মধ্যে উষ্ণ ভাপসা ছায়া। ভয় তারা করছিল গলির ভিতরটাকে, দু-পা এগোতে না এগোতে আক্রমণ কিন্তু এল বড়ো রাস্তার দিক থেকেই। গলির মোড়ে অতক্ষণ ইতস্তত করাটা তাদের বোকামি হয়েছে, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা হনহন করে গলিতে ঢুকে পড়লে ওরা মনস্থির করতে করতে তারা গলির মধ্যে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত।

ছোরা আর লোহার ডান্ডা হাতে দুজন মানুষ দ্রুতপদে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে, নিঃশব্দে, উল্লাস বা ধিক্কারের আওয়াজ না তুলে, হত্যা করতে। কলের মতো যেন নকল করছে বুনো শিকারি পশুর। এরা দুজন আর ওরা দুজন পরস্পরকে জীবনে কখনও দ্যাখেনি, শুধু জামাকাপড়ের পার্থক্য থেকে পরস্পরকে শত্রু বলে চিনেছে। অতর্কিতে আঘাত হানতে এরা নিঃশব্দে আক্রমণ করেছে কিন্তু এদিক-ওদিকে ততক্ষণ সোরগোল উঠেছে ছড়ানো বহু কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকারে, তারই প্রতিধ্বনি উঠেছে তেমনি চিৎকার ও শাঁখের শব্দে। শহরের সাম্প্রতিক জীবনে এ নিত্যকারের ঘটনা, সকাল-সন্ধ্যা দিবা-রাত্রির কাহিনি—দুজন আর দুজনের সংঘাত বিরাট সমগ্র ঘটনার সামান্য একটা তুচ্ছ অংশমাত্র। প্রমথ প্রায় প্রতিরোধের সময়ও পায় না, সে হকচকিয়ে গিয়েছিল, তার খালি হাত দিয়ে আঘাত ঠেকাবার অন্ধ দিশেহারা চেষ্টার পাশ কাটিয়ে একটা ছোরা কাঁধের নীচে ঢুকে যায়। প্রণবের কোমরে গোঁজা ছিল কৃপাণ, সতর্ক উৎকর্ণ থাকা আর দিশেহারা না হওয়াটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অভ্যাসে।

তবে সে-ও নিজেকে বাঁচাতে পারত কি না সন্দেহ। এদের দেখেই চেনা যায় এরা শহরের এ ব্যবসায়ে পুরানো ঘাগি লোক, ছোরা ডান্ডা চালাবার কায়দা জানে, বিদ্বেষে উন্মাদনায় হঠাৎ যাদের মাথায় খুন চেপেছে, এরা তারা নয়। সাধারণ আনাড়ি লোক এভাবে দুজনে মিলে আক্রমণ করে না। দল বেঁধে দলীয় উন্মত্ততায়, দিশেহারা উত্তেজনায় এলোমেলো বিশৃঙ্খল হানা দেয়। দুপক্ষেই এই নিয়ম।

এক বাড়ির ছাদ থেকে ইট পড়ছিল, এ পাশের বাড়ির রোয়াকের নীচে একটা ফটকা বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল, লক্ষ্যটা খুব বেঠিক হয়েছে, হয়তো তাদের বাঁচিয়ে ছুঁড়তে হওয়ার জন্য। তারপর একটা বন্দুকের আওয়াজ হল।

চোখের পলকে আক্রমণকারী দুজন মিলিয়ে গেল গলির মোড়ের দিকে।

প্রণবের মাথার বাঁ দিক খানিকটা কেটেছে, ডান্ডা পিছলে যাওয়ায় মাথা ফাটেনি। কাঁধে ঘা লেগে বাঁ হাতটা একটু অবশ বোধ হচ্ছে। প্রমথর ক্ষতের মুখে হাতের তালু দিয়ে চেপে তাকে জাপটে ধরে সে এগোয়। প্রমথ টলতে টলতে চলে। কয়েকখানা বাড়ি পেরিয়ে দোতলা বাড়িখানার দিকে সে কষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে ক্ষণকাল চিনবার চেষ্টা করে।

এই বাড়ি।

প্রমথ মুখে রক্ত তুলে বলে।

মধ্য ভারতের এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র শহর থেকে মণিমালার চিঠি পেয়ে এত দূরে এসে বাড়ির দুয়ারে এভাবে প্রমথ মারা যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। সাত বছরে কত বদলে গিয়েছে জগৎ, মণিমালার জন্য সে টান কি আর ছিল প্রমথর, মণিমালারই কি আছে ? তবু মামার জন্য তার অসহ্য আশ্চর্য শোক দেখে কে বলবে সাত বছর স্নেহ মমতার আদান-প্রদান চিঠিপত্রেও এক রকম বন্ধ ছিল। সাত বছর আগে কী উপলক্ষে এসে কয়েকটা দিন সে এ বাড়িতে থেকে গিয়েছিল সেটাও মণিমালার ভালো মনে নেই, হয়তো কোনো উপলক্ষই ছিল না। আসলে মণিমালাকে দেখতেই সে এসেছিল, সেই আসল কারণটাই তার মনে আছে। তবে বিশেষভাবে দুঃখ পাবার বিচলিত হবার কারণ

মণিমালার আছে। কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় টেঁকা যায় না বলে কিছুদিন গিয়ে মামার কাছে থেকে আসবার ইচ্ছা জানিয়ে সে এতকাল পরে চিঠি লিখেছিল প্রমথকে। চিঠি পেয়ে প্রমথ নিজেই এভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে অত দূর দেশ থেকে, এটা অবশ্য সে আশা করেনি। পুরানো দিনেব মতো প্রমথর ভালোবাসার এই অভাবনীয় প্রমাণ পাওয়ার জন্য হয়তো তার দুঃখটা এত বেশি জোরালো হয়েছে।

ও মামা, তুমি এমন দাগা দিলে তোমার মণির মনে ?

মরা মানুষটাকেও প্রাণে ব্যথা দেবার অনুযোগ দিয়ে কাঁদা পুরানো মণিকে যেন আবার নতুন করে চিনিয়ে দেয় প্রণবের কাছে। বহুদিনের অসাক্ষাতে পরিচয়টা তার মনে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। মৃদু কোমলভাবেই মণি কাঁদে, চেঁচামেচি তার কোনোদিনই আসে না। তার একগুঁয়ে মৃদুতার জোরটা প্রণবের মনে পড়ে যায়। শহরের জীবনের একটানা আতঙ্কের চাপে মনটা চড়া সুরে বাঁধা বলেই বোধ হয় মৃদুস্বরে হলেও কথা বলে সে কাঁদছে, নইলে হয়তো নিয়মমতো গুম খেয়ে শুয়ে পড়ে নিজের মনে নিঃশব্দেই কাঁদত।

সুশীল বলে, তোমাকে আজ থাকতে হয় প্রণব। কারফিউর মধ্যে যাওয়াও উচিত নয়, তা ছাড়া নানারকম হাঙ্গামা আছে—

ঠাকুরপো না থাকলে হবে কেন ?—কান্নার মধ্যেই মণি বলে।

থাকতে তাকে হবে প্রণব জানত, এদের মুখ থেকে স্পষ্ট আবেদন শুনে নিশ্চিন্ত হল। তাকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল সুশীল, মণিরও তাতে সায় ছিল,—অন্য একটা বাড়ি থেকে। এদের মতিগতিতে তার ছেলেবেলা থেকে বিশ্বাস কম, কখন কীসের জেব টানবে এরাই সেটা ভালো জানে। নিজে থেকে থাকার কথাটা যে তুলতে হল না তাই ভালো। সে-ই এক রকম হাঙ্গামা সাথে করে বয়ে এনে ঘরে তুলেছে, তার দায়িত্বের ঘোষণাটা এদের মুখেই মানানসই হয়েছে !

থাকব বইকী। ব্যবস্থা যা করার করতে হবে।

কাল সকালে ছত্রিশ ঘণ্টার কারফিউ শেষ হবে, তার আগে কোনো বিষয়ে কিছু কবার উপায় নেই। তার আশ্বাসে সুশীল-মণিরা স্বস্তি পেয়েছে আন্দাজ কবা গেল সহজেই।

মনটা ঢিল দেয় প্রণব। তা ছাড়া উপায় কী। সপরিবারে মণিকে সে দেখল অনেকদিন পরে। শহরের অন্য প্রান্তের বাড়িটা থেকে তাকেই উপলক্ষ করে মণিরা ভিন্ন হয়ে চলে আসার পর বছর চারেক আগে একবার দেখা হয়েছিল সুরেন কাকার বাড়িতে। সুরেন কাকার বাড়িতে ছিল তার মেয়ের বিয়ের সমারোহ, দেখা হলেও কথাবার্তা কিছুই হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে আর সুশীলকে সঙ্গে নিয়ে সুরেন কাকার বাড়ির দরজায় মণিকে সেই যে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল, সেই ছবিটাই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে তার মনে আছে। মনে হয়েছিল, একটি কিশোরী মেয়ে যেন বড়ো বড়ো ছেলেমেয়ে ও প্রৌঢ় স্বামীর মস্ত সংসারের গিন্নি সেজে আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে। সেটাই যেন সব, স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলি যেন নিছক তার ওই গিন্নি সাজারই একটা অঙ্গ। মণির আর ছেলেমেয়ে হয়নি, এটা খুবই আশ্চর্য, তবে হয়তো অসম্ভব নয়। একসাথে থাকার সময় সে বাড়িতে কীভাবে সে যেন মানিয়ে যেত সংসারের বউ-গিন্নি হিসাবে, তার কচি কিশোরীর মতো চেহারা চোখেও পড়ত না, শুধু মনে হত সে বড়ো রোগা। বাইরে কোথাও গেলে কিন্তু তাকে দেখে আর ভাবা যেত না সে এতগুলি সন্তানের মা, চারটি দেওর, দুটি ননদ, কয়েকটি ভাগনে-ভাগনি, বিধবা পিসশাশুড়ি আর একটি পেনশনভোগী রায়বাহাদুর শ্বশুরের বিরাট সংসার সে চালায়। সে বাড়িতে তাকে যেমন পাকা গিন্নিই মনে হত, আজও তাই মনে হল। ক-বছরে ছেলেমেয়েরা

বেড়েছে, লম্বা-চওড়া হয়েছে। বড়ো ছেলে সুধীন পড়ছে কলেজে, বড়ো মেয়ে আশা ষোলোয় পা দিল। আশা পেয়েছে এ বংশের ধাঁচ, বর্ষার কলাগাছের মতো তার বাড়, তার চেয়ে আজ অনেক ছোটোখাটো মণিমালা, গড়ন তার মেয়ের তুলনায় অনেক বেশি কিশোরী মেয়ের মতো। তবে মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, সে লাবণ্য আর নেই, ফরসা হাতে নীল শিরা দেখা যায়।

তোমার শরীর কেমন আছে মণি-বউদি ?

আমার আবার শরীর, তার আবার কেমন থাকা !

রাত প্রায় সাড়ে-নটার সময় এই প্রশ্নোত্তরে সবাই যেন খানিকটা মাটির মানুষের আলাপ-আলোচনার ধাতে ফিরে এল। মামার জন্য কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিও এসেছিল মণিমালার।

তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ ঠাকুরপো। সে চেহারার চিহ্ন নেই তোমার।

সুশীল বলে, সেদিন কাগজে তোমার নাম দেখছিলাম। এক কোণে ছোটো করে লিখেছে, হঠাৎ চোখে পড়ল। ইংরেজ সবকার, লিগ কংগ্রেস সবাইকে গাল দিয়ে নাকি বক্তৃতা করেছ। চিরকাল তো গাল দিয়ে এলে, কিছু হল কি ?

যাক গে না।—মণি অস্ফুট স্বরে বলল কী বলল না।

অ্যাঁ ? না, তা বলিনি।—সুশীল মাথা নেড়ে নেড়ে কার কথায় সায় দিল সেই জানে, চশমা খুলে কোঁচড়ের খুট সাফ করে বলল, সভায় বক্তৃতা দাও, যা কর, সেটা আমি অত বুঝি না। মানে, ইতমধ্যে স্থিতি-টিতি করে নিয়ে বসা তো উচিত ছিল তোমার ! একটা ভালো পোস্ট—চাকরি না কর, সাপ্লাই-টাপ্লাইয়ের একটা ভালোমতো কন্ট্রাক্ট—

যাক গে না।—মণি আবার অস্ফুট বিরক্তির সুরে বলে।

অ্যাঁ ? তা যাক গে, তুমি যা ভালো বুঝেছ—

তোমাদের ওদিকে তো ভয় নেই, না ঠাকুরপো ?

না, ভয় নেই।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা আলাপ চলে, যার মোট কথাটা এই যে সব দিক দিয়েই জীবনটা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই, মাঝে মাঝে দূরাগত আওয়াজ শুনে উৎকর্ণ হওয়া, তারপর আবার কথা বলা। শুয়ে পড়ে লাভ নেই, ঘুম আসবে না। সুধীন মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে নজর বুলিয়ে আসে চারিদিকে, ছোটো ছেলেটা খেলার ছলে ছটফট করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। আশার চুল উশকো-খুশকো, মাথা ধরার যন্ত্রণায় সে থেকে থেকে মাথায় ঝাঁকি দেয়, তার কথার মৃদুস্বরে তীব্র বিরক্তির একটা ক্ষীণ কিন্তু কাঁসার মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ বাজে। আজ বড়ো গরম, আকাশে মেঘ জমেছে। দু-একফোঁটা বৃষ্টি বুঝি এক সময় পড়েছিল, তারপর আর বৃষ্টিপাতের লক্ষণ নেই।

মামার জন্য মণির মনঃকষ্ট, তা সে যেমন কষ্টই হোক, শেষ হয়ে গেছে বলা যায় না। তবে কষ্টটার অভিনবত্ব ইতিমধ্যে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। দোতলার ঘরে বসে কথা বললেও নীচের তলায় চাদর-ঢাকা প্রমথকে কেউ ভুলে যায়নি, ইতিমধ্যে সহ্য হয়ে গিয়েছে। গত কয়েকটা বছর কোন স্তরে ঠেলে দিয়েছে এ বাড়ির শান্ত-কোমল অল্পে-কাতর মানুষগুলির চেতনাকে ! আগে অবাঞ্ছিত আশ্রিত কেউ এ বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে মরলেও তার ধাক্কা অন্তত কয়েকটা দিন সকলকে নিষ্ক্রিয় মুহ্যমান করে দিত। আজই শেষ দুপুরে পথ থেকে শোচনীয় ভয়ংকর মৃত্যুর রূপ নিয়ে শ্রদ্ধেয় পরমাত্মীয় আচমকা এ বাড়িতে ঢুকেছে, তার দেহটা পর্যন্ত এখনও শ্মশানে চালান যায়নি, এদের পক্ষে আজ তবু সম্ভব হয়েছে সাধারণভাবে সুখদুঃখের ঘরোয়া আলাপ।

আগের দিনের সে ঘবোয়া সুখদুঃখ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো জলের মতো জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন। সন্দেহ নেই যে তাই থেকেই এ সহনশীলতা, ব্যাকুলতার এই আত্মনাশের আপস ! সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কি না জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কি না জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়িতে সকলে একত্রে উদ্‌বেগ-আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।

তবু তারা আলাপ করে, অবস্থা তাদেরও নিজের তালে গড়ে-পিটে সাথে সাথে টেনে নিয়ে চলেছে বলে।

প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়ে প্রণব স্টেশনে গিয়েছিল। তখন সে জানত না তার সঙ্গে তাকেও এ বাড়িতে আসতে হবে। হয়তো বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেত, হয়তো ভেতরে ঢুকে বসে যেত কিছুক্ষণ। অত চুলচেরা জটিল হিসাব সে করেনি, সেটা তার আসে না। কবে সুশীলেরা পণ করেছিল তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে না, হয় সে যাবে নয় তারা যাবে বাড়ি ছেড়ে,—সেই পণ বজায় রাখার অজুহাতে দশজনের হইচই-হট্টগোল-ভরা সংসারের অসুবিধা এড়িয়ে নিভৃতে নিজেদের মনে স্বাধীনভাবে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে এ বাড়িতে উঠে এসেছিল, মনে তার আছে সব কথাই। কিন্তু সেই অকারণ মিথ্যা কলহ আর অশান্তির কোনো গুরুত্ব সে দেয় না, দেবার দরকাব হয না। তার ক্ষোভও নেই, অভিমানও নেই।

ইংরেজ রাজের পুলিশ একদিন তার ঘরটা সার্চ করেছিল। তাতে সরকাবি কলেজের অধ্যাপক পরিবারের কাছে এমন বিপজ্জনক বিপ্লবী যদি হয়ে উঠেই থাকে যে তার সঙ্গে একত্র বসবাস আব উচিত মনে করা যায়নি, সেটা খাপছাড়া কিছু হয়নি। ভাই বলেই বরং বিপদের ভয় ছিল বেশি। স্বদেশি ছেলে স্বদেশি ভাইয়েব শুধু বাপ-ভাই হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব হওয়ার জন্যও এ দেশে অনেকের ভাগ্যে কম লাঞ্ছনা জোটেনি। তবে তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য এবা অমন উঠে-পড়ে লেগেছিল কেন প্রণব ভালো বুঝতে পারেনি ! শুধু তার সঙ্গ বর্জন করাটাই মণির বাড়ি ছাড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। অন্য সবার সাথে থাকার দায়িত্ব ঝক্কি আর বিড়ম্বনা এড়িয়ে নিজেদের রোজগার শুধু নিজেদের জন্য খরচ করে নিজেদের মনের মতো স্বাধীন সুখী নীড় গড়ার প্রবল সাধটাও ছিল। তাকে তাড়ালে তো এ সাধ মিটত না, বরং দায়িত্ব আরও বেড়ে যেত।

পরে মনে হয়েছে, ভিন্ন হবার সংকোচ কাটাতে এরা অত বেশি বাড়াবাড়ি করেছিল তাকে নিয়ে, সকলকে ফেলে সরে যাওয়া যে স্বার্থপরতা নিজেদেরই, এ বোধ থাকায় অজুহাতটা ফেনিয়ে বড়ো করেছিল।

মণিরও কিছুই ভুলে যাবার কথা নয়। গোড়া থেকে মনে বোধ হয় তার অনেক স্মৃতিই বিঁধছিল। সুশীল বেশি রাত্রে শুতে যাবার পর সে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রণবকে বলে, এ বাড়িতে তুমি এই প্রথম এলে। তোমাকে দোষ দিই না ঠাকুরপো। সত্যিই দিই না। কেন আসবে তুমি ? তোমাদের ভাইদের মধ্যে কী হয়েছে না হয়েছে আমি অত তার ধার ধারি না, কদ্দিন ভেবেছি তোমায় একটা চিঠি লিখি, আমাদের তো আর ঝগড়া হয়নি। কিন্তু লিখতে পারিনি। তোমার কাছে তো আমি তোমার দাদার বউ। কে জানে তুমি কী ভাববে !

দাদার বউ নও নাকি ?

মণি এই প্রথম একটু হাসে। তার হাসিও প্রায় তেমনই আছে, পাতলা দুটি ঠোঁটের হাসি নয়, সমস্ত মুখ দিয়ে যেমন হাসত। কেবল আগের মতো তেমন তাজা নয় তার হাসিটা। ভিন্ন হয়ে স্বাধীন-ভাবে নিজের ঘরকন্না গড়ে তুলতে মুখের হাসি তবে ম্লান হয়ে গেছে মণির ? আকাশ-কুসুমের সাধ বুঝি তার মেটেনি !

যার-ই বউ হই, তোমায় আমায় কীরকম ভাব ছিল বলো তো ?

সে কথা মিথ্যা নয়, তাই পরবর্তী পরিণতিটা আজও প্রণবের ধাঁধার মতো লাগে ! মণির উৎসুক ব্যাকুল প্রশ্নে সমস্ত অতীতটা নতুন করে আনন্দময় ছেলেমানুষির এক নিষ্ফল অধ্যায়ের মতো মনে ভেসে আসে। ছোট্ট অপটু শরীর আর মিষ্টি কচি মনটুকু দিয়ে জীবনের আশেপাশের পরিসরটুকু মণি জয় করতে চেয়েছিল। দু-চারজনকে ছাড়া মাঝারি আকারের পরিবারটিকে পর্যন্ত মুগ্ধ করতে পারেনি বলেই কী মণির হাঁপ ধরেছিল। আরও ক্ষুদ্র পরিসর চেয়েছিল অবাধ মোহ বিস্তারের, সবাই যেখানে তারই মায়ায় পোষ মানবে, বশ হবে ? টান কম ছিল না প্রণবের, মণি বাপের বাড়ি গেলে ব্যাকুল হয়ে সে তাকে দেখতে যেত, তাগিদ দিয়ে ফিরিয়ে আনত। হাসি কথা সমবেদনায় তাদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়, সাধারণ পারিবারিক সম্বন্ধ কি তাদের প্রাণের সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি ? কিন্তু হলে কী হবে। মন-প্রাণ তো প্রণব সঁপে দিতে পারেনি মণিকে, বাইরে তার ছড়ানো জীবন গুটিয়ে এনে তার নিজস্ব চিন্তা-জগৎ আলতো করে রেখে মণির মনের মতো হতে পারেনি। মণির মনের সাথে সে চলবে ফিরবে ভাববে বাঁচবে, মণি তার বিয়ে দিয়ে বউ আনাবে, সুখ আনন্দে তার জীবনটা সার্থক করবে মণি। তাই যদি না হয় তবে কীসের ভাব, কীসের মায়া ?

মোটেই যে আপন হল না—সে নয় চুলোয় গেল, কিন্তু ব্যাকুল আগ্রহে যে তার স্নেহ মেনে নিল তার জীবনটাও যদি আত্মসাৎ না করা যায় মিছে বেঁচে আর তবে সুখ কী ? তাই হয়তো এত জ্বালা হয়েছিল মণির !

তাই বোধ হয় সে পুরানো দিনের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রণবকে বোঝাবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে কীভাবে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল সবার জন্য কিন্তু কেউ তার মর্যাদা দেয়নি, মান রাখেনি, এতটুকু প্রতিদান তাকে দেয়নি।

চুপি চুপি কত কেঁদেছি, কেউ তোমরা টের পেয়েছ কোনোদিন ? কেউ কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছে আমার দিকে ? পরের ঘর থেকে এলাম, মানিয়ে নিতে আমার কত কষ্ট। কীরকম চালচলন সংসারের, কার মনটা কীরকম, কত ঘা খেয়ে তবে তা আমায় জানতে হয়েছে। বুক দুর-দুর করেছে দিনরাত, কাউকে বলিনি। সবাই দেখেছে হাসিখুশি, সবাই জেনেছে যার যা চাই আমার কাছে চাইলেই পাবে, একদিনের তরে কোনো বিষয়ে কেউ আমার নালিশ শুনেছে ? আমি যে একটা মানুষ—

মণির কান্নাও মৃদু, হাসির মতো সমস্ত মুখখানা দিয়েই সে কাঁদে। কথায় বাধা পড়ে না, আঁচলে নাক মুছে বড়ো জোর দুবার ঢোক গিলতে হয়, চোখে যেটুকু জল আসে তা চোখেই শুকিয়ে যায়। যা সে বলে তার সাধারণ মানে খুব সহজ : মানুষের সেই চিরন্তন নালিশ, কেউ তার ত্যাগের দাম দিল না। কিন্তু এইটুকুই তো সব কথা নয় আসলে, আসল কথাও নয় ! যার চাপে প্রাণে ক্ষোভ আর বেদনা, সেটা জানা না থাকায় সবার মতো মণিরও প্রকাশ করার ব্যাকুলতাই সার হয়, বেরিয়ে আসে সাদা-মাটা সস্তা নালিশ। কী সে দিল মানুষকে আর কীসের দাম কেউ তাকে দিল না মণির তা জানা নেই। জিনিসের দাম টাকায় হয়, তার ত্যাগের দামটা কীসে হত, এ সব তো আর মণি ভাবেনি।

আমার মনটা যদি তোমরা বুঝতে ঠাকুরপো, বুঝতে কেন ভিন্ন হয়েছি। আমার নিন্দেটাই শুধু রটত না চাদ্দিকে, আমারই সব দোষ হত না।

তোমার দোষ ? তোমায় কে দোষ দিয়েছে ?—প্রণব শান্ত সুরে বলে, তোমার নিন্দেও রটেনি চাদ্দিকে ! এতে নিন্দের কথা কী আছে, সব সংসারেই এ রকম ভিন্ন হয়, তোমরা প্রথম নও।

আসল কথা আড়ালেই থেকে যায়। ভিন্ন হওয়াটা সংসারে চালু হয়ে গেছে সত্য, তাতে নিন্দা-প্রশংসার প্রশ্ন নেই, মণিরাও সোজাসুজি তফাত হয়ে এলে এতদিন পরেও এই অপরাধ-বোধ টিকে থাকত না। ভিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটা হয়েছিল কুৎসিত, সেটাই আজও এদের পীড়ন করছে, মণির অস্বস্তিও সেই জন্যই। এ সব পুরানো কথা ঘাঁটাঘাঁটি করার ইচ্ছা প্রণবের ছিল না। বাজে তুচ্ছ হয়ে গেছে এ সব তার কাছে। সে চেষ্টা করে তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বিষয় আলোচনা আরম্ভ করে। শুরু হতে না হতে আলোচনা এসে ঠেকে বর্তমান অবস্থায় ! একমাত্র অতীতের আলোচনায় কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়, অন্য সমস্ত কথায় দাঙ্গা এসে ঢুকবেই, এমন তার ব্যাপ্তি। ঘুম পেতেই প্রণব মণিকে ক্ষুণ্ণ করেই কথার ছেদ ফেলে শুতে যায়। দিনের পর দিন মারামারি চলবে বলে দিনের পর দিন রাত জেগে জটলাও চালাতে হবে, তার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু আত্মহত্যায় রত শহর কেন মানুষকে ঘুমোতে দেবে ? ঘুম ঘনিয়ে আসতে আসতে সে কোলাহল শোনে—আগুন লেগেছে, আগুন !

কোথায় লেগেছে, আগুন ? ছাদে উঠে দেখা যায়, বড়ো রাস্তার ওপারে অল্প দূরে বস্তিতে আগুন ধরেছে। পাকা বাড়ির আড়ালে বস্তির ঘর দেখা যায় না, বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে শিখা, হলকা আর স্ফুলিঙ্গ। আকাশে আভা পড়েছে।

কেন এরা এমন করছে ঠাকুরপো ?

প্রণব শুনতে পায় না। সে তখন পাশের বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো মোটা ভদ্রলোকটির কথা শুনছে। গলার আওয়াজে ভদ্রলোককে বেশ খুশি আর পরিতৃপ্ত মনে হল। সুশীলকে ডেকে সে বলছিল, দুপুরে গলির ভেতর এসে তিনজনকে সাবাড় করে দিয়েছিল না, এই তার জবাব দেওয়া হল। হাঃ, বেটারা মনে করেছিল, চুপচাপ মার হজম করে যাব, এবার বুঝুক। এমনিভাবে ঠান্ডা করতে হয়, ব্যাটারা কারফিউ পর্যন্ত মানবে না মশায় !

মিশ্র কোলাহল শোনা যাচ্ছিল, হিংস্র গর্জনকে ছাপিয়ে উঠেছে বহু কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। শহরের এ এলাকা প্রণবের ভালো চেনা নেই, তবু সে অনুমান করে, ওটা মজুরবস্তি নয়। মজুররা এ দাঙ্গায় নামেনি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে তারা পাহারা দেয়। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগে এটা কর্তাদের অন্য প্রতিশোধ হলে আলাদা কথা।

সুধী, নীচের দরজাটা দিবি আয় তো।

কোথায় যাচ্ছ ?

ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রণব একটু ব্যাপারটা দেখে আসতে চায় শুনে সুশীল আর মণি সত্রাসে কলরব করে ওঠে। সুধীন আর আশা প্রায় একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে, সত্যি যাবে কাকা ?

তুমি কি পাগল হলে ঠাকুরপো ? কী বলছ তুমি ? ওখানে এখন মানুষ যায় ? এ কোন দেশি বাহাদুরি ?

মণির কাছে যেন এক মুহূর্তে মুছে গেছে মাঝখানের এতগুলি বছরের ব্যবধান এমনি তার ব্যাকুল তীব্র তিরস্কার !—

প্রণব শান্তকণ্ঠে বলে, বাহাদুরি নয়, ও সব বীরত্বের ধার ধারি না। মিছামিছি কেউ যেচে প্রাণ দিতে যায় ?

তুমি জ্যান্ত ফিরবে ভেবেছ ?

তাই তো আশা করি। নেহাত যদি তা না হয়, উপায় কী ? কথাটা কী জান, লোকজন হয়তো এলোমেলো ছুটোছুটি করছে দিশেহারা হয়ে। আমি বলে নয়, যে-কেউ একজন গিয়ে যদি হাঁক দেয়

খানিকটা শৃঙ্খলা আসবে, আগুন নেবানো, মানুষ বাঁচানোর চেষ্টা হবে। অনেকে যারা ভয়ে আসছে না তারাও এসে জুটবে। অনেক কিছু হতে পারে, গিয়ে না দেখলে বুঝব কী করে ?

ছাদের আবছা আলোয় মণির চোখ দেখা যায় না। প্রণবের পিছু পিছু সমস্ত পরিবারটি নিঃশব্দে নীচে নেমে আসে। প্রণব বাইরের দরজা খুলছে, সুধীন হঠাৎ বলে, কাকা, আমি যাব।

আবদার করে নয়, জোরের সঙ্গে বলে। সুশীল ধমকে ওঠে, বাজে বকিসনে।

কিন্তু যুদ্ধ-বিপ্লবের ঢেউ-লাগা কড়া বাস্তবে পাক দেওয়া এ যুগের তরুণ মন ধমকে অত সহজে কাবু হয় না।

কিছু হবে না, আমি যাই কাকার সঙ্গে।

মণি মৃদুস্বরে বলে, যেতে চাও, যাও।

শুনে প্রণবও আশ্চর্য হয়ে তাকায়। এখানে প্যাসেজের আলোতে মণির মুখচোখ দেখা যাচ্ছে। সুশীল প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে, যাও মানে ? যাবে কী রকম ? মাথা খারাপ না কি তোমার ?

ইচ্ছে হয়েছে, যাক। ঠাকুরপোর কিছু না হলে সুধী-রও কিছু হবে না।

এবার আর প্রণব দ্বিধা করে না। সে নিজেই ধমক দেয় সুধীনকে। বলে, পাগলামি করো না সুধী। তুমি ঝোঁকের মাথায় বাহাদুরি করতে যাবে, আমি তোমাকে সামলে বেড়াব ? এ সবের মধ্যে যেতে হলে আগে থাকতে তৈরি হতে হয় !

প্রণব শুধু সুধীনকে নিরস্ত করতে ধমক দিয়েছে, কিন্তু তার কথায় সত্যই ধার ছিল—অপমান ছিল। সুধীনের মুখ কালো হয়ে যায়। নীচের ঠোঁট কামড়ে মণি মাথা হেঁট করে।

পরদিন প্রমথের দেহ সংক্রান্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে এসে প্রণব বিদায় নেবে, মণিমালা মরিয়া হয়ে বলে, তোমাকে বলার মুখ রাখিনি আমরা, তবু তোমাকেই বলি ঠাকুরপো।

বলো।

ভিন্ন হওয়ার স্মৃতি মণি কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অথচ নিজে সে সত্যই কারও সঙ্গে একদিনের জন্য ঝগড়া করেনি, অশান্তির সামান্যতম বিষয়ে কোনো পক্ষে টেনে কখনও একটি কথাও বলেনি। শেষদিন পর্যন্ত এ ভাবটাই সে দেখিয়ে এসেছে যে ও সব গোলমালের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে ভাব রাখতে চায় সবার সঙ্গে ! বাড়ি ছাড়বার সময় মুখভার করে নয়, সবার কাছে কেঁদেই সে বিদায় নিয়েছিল। তার যেন একান্ত অবাঞ্ছিত এই ঘটনা, নিরুপায় সে অনিচ্ছায় দুঃখ বরণ করল। বোধ হয় সেই জন্যই আজ এই প্রতিক্রিয়া, নিজে ঝগড়া করে এলে হয়তো এ দুর্বলতা তার আসত না।

তুমি তো অনেক খবর রাখো, ভালো পাড়ায় একটা বাড়ি দেখে দেবে ? এখানে যেভাবে দিন কাটাচ্ছি ঠাকুরপো, আমি পাগল হয়ে যাব।

প্রণব একটু চিন্তা করে।

বাইরে কোথাও যেতে পার না ?

কোথায় কার কাছে যাব ? মামার কাছে যেতে পারতাম, মামার প্রাণটা গেল আমার জন্যে। ভাইদের কাছে গেলে তারা খরচপত্র নেবে না, বিরক্ত হবে। কদ্দিন থাকতে হয় তাই বা ঠিক কী ? ওভাবে গিয়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না, তার চেয়ে মরাও ভালো। কী যে বিপদে পড়েছি ঠাকুরপো !

সুশীল বাড়ি ছিল না। কাল কারফিউর জন্য কামাই হয়েছে, আজ শ্মশান থেকে সে সোজা আপিস চলে গেছে। প্রণব চিন্তিতভাবে বলে, বাড়ি পাওয়া মুশকিল। রোয়াকটুকু বারান্দাটুকু নিয়ে

গ্যারেজে গুদামঘরে লোকে গাদাগাদি করে আছে। এমনি যাদের ঘরে কুলোয় না, তাদের বাড়ি দশজন আত্মীয়স্বজন আশ্রয় নিতে এসেছে।

তবে ? তবে কী হবে ?

প্রণব খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে পাব। এমনি অসুবিধে হবে, কিন্তু কে কী মনে করছে ভেবে অস্বস্তি ভোগ করতে হবে না।

মণি একবার চোখ তুলে চেয়ে পায়ের গোড়ালি খুঁটতে থাকে। গোড়ালিটা তার অযত্নে ফেটে চৌচির হয়ে আছে, ফাটার দাগে কালো কালো ময়লা জমেছে। তার মসৃণ সুশ্রী টুকটুকে পায়ের অবস্থা নজর করে প্রণবের দুঃখ হয়। ওর মনটাও যে চৌচির হয়ে ফেটেছে, এ তার আরেকটা লক্ষণ।

তাতে কিছু দোষ নেই। ভিন্ন হলেই কি শত্রু হতে হবে ?

কাল মাঝরাত্রে মণি যেমন আচমকা প্রণবের সঙ্গে ছেলেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে যাবার অনুমতি দিয়েছিল, এখন তেমনিভাবে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলে সে বলে, তাই যাব। তুমি ব্যবস্থা করো।

সুশীলের মতামতের প্রশ্ন কেউ তোলে না। মণি একবার বলেও না যে উনি ফিরে আসুন, ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি। সোজাসুজি সে প্রণবকে ব্যবস্থা করাব কথা বলে দেয়।

বিকালের দিকে সুশীল ফিরে এলে দেখা যায় তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে এতবড়ো সিদ্ধান্ত করে ফেলার জন্য কিছু মনে করা দূরে থাক, মণির প্রতি সে রীতিমতো কৃতজ্ঞতা বোধ করছে।

প্রণব খুঁজে পেতে একটা লরি জোগাড় করে আনে। সেই দিনই শেষ বেলায় তারা এবাড়ি ছেড়ে যায়। মধ্য ভারতেব শহরে মামার কাছে যাবার কথা ভেবে ঘটনাচক্রে মণি ফিবে যায় সেই বাড়িতে সাত-আটবছর যে বাড়িতে ফেরার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তখনও গতরাত্রেব আগুন লাগানো বস্তি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সমস্ত এলাকায নতুন কারফিউ শুবু হতে আর মোটে আধঘণ্টা খানেক দেরি ছিল।

দুই

মণির মনে পড়ে প্রণব একদিন বলেছিল : জানো, জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না।

দর্শনের সূত্রের মতো এমন ছাঁকা কথাটা সে কী প্রসঙ্গে বলেছিল মণির মনে আছে। প্রণবের সঙ্গেই সেকেন্ড ইয়ারে বিজ্ঞান পড়ত একটি ছেলে, নাম তার আশীষ,—সে সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। চশমা-পরা সুশ্রী লাজুক ছেলেটিকে মণি কতদিন চা খাইয়েছে আলাপ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোনোদিন তার লজ্জা ভাঙতে পারেনি। ঘটনাচক্রেও সে একটিবার মণির চোখে চোখে তাকিয়েছে কি না সন্দেহ। প্রণবের তীব্র ব্যঙ্গ মণি ভোলেনি।—একটু ভদ্রতা রেখেছে, সায়ানাইড খেয়েছে, গলায় দড়ি দেয়নি। ছেলেবা যখন ফাঁসিতে ঝুলছে তখন গলায় দড়ি দিলে—?

প্রণব তখন ভাবপ্রবণ ছিল, গলায় গলায় ভাব ছিল মণির সঙ্গে। তার মনও গভীরভাবে নাড়া খেয়েছিল, একসুরে বাঁধা দুটি মন হলে একের ঝংকারে অপরটি যেমন সাড়া দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মরণে সুখ ! কোন জীবন ? কী বিশ্বাস ? এ প্রশ্নের জবাব মণি কখনও জানেনি। জীবিতের সুখদুঃখকে মরণের সঙ্গে জড়ানো তার অদ্ভুত মনে হয়েছে। বিশ্বাসের জন্য মরেও সুখ আছে, এটা চলতি কথা, সবাই জানে। কিন্তু সে হল বিশ্বাসের জন্যই জীবন আর বিশ্বাসের জন্যই মরণের কথা, তেমন আর কটা লোকের হয় ? সংসারে সাধারণ মানুষের যে জীবন, সুখদুঃখের যে ঘটা, তাতে

বাঁচার মধ্যেই সব, ওটাই সীমা। এ জীবনের কীসে কোন বিশ্বাসটা থাকলে মরাও সুখকর হয়, সায়ানাইড খাবার মারাত্মক অবস্থাটা ছাড়া ? তখন তো মরণেই বিশ্বাস, জীবনে নয় ! নিজের মনের এই মেয়েলি তর্কাতর্কিতে অবশ্য মণির খটকা আছে অনেক, কারণ জীবনে সে একটা জিনিসে বরাবর হোঁচট খায়—নতুনত্বে। কোনো নতুনত্বের জন্যই নিজেকে সে কল্পনার সাহায্যে ভেবেচিন্তে এটুকু প্রস্তুত করে রাখতে পারে না যাতে শুধু অবাক হয়ে অভিভূত হয়ে পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করতে পারে, নিজেও মানিয়ে যায় অভিনব যা এল তাকেও মানিয়ে নিতে পারে। সে সোজাসুজি হোঁচট খায় ! প্রতিবার টের পায়, তার ভাবার চেয়ে অনেক বেশি বা অনেক কম অভিনব হয়েছে বলে তার মুশকিল নয়, ব্যাপারটাই একেবারে অন্যরকম। মোটে সে ধরতে পারেনি, তার ধারণায় আসেনি। যেটুকু তার পরিধি ছিল জীবনের কোনো একটা কিছু নতুনত্ব আসবার আগে, যত অভিজ্ঞতা ছিল, যা এল তা যেন সে জগতের নয়। অন্য এক জগৎ থেকে অজানা বিস্ময়, অভাবনীয় অভিজ্ঞতা এসেছে। অথচ কী আর এমন সৃষ্টিছাড়া পরিবর্তন তার জীবনে ঘটেছে আজ পর্যন্ত, এক জগতের আরেক জগতের যোগ ঘটার মতো ? সাধারণ বাপের বাড়িতে সাধারণভাবে মানুষ হয়ে সাধারণ শ্বশুরবাড়ি আসা, কিছুদিন বউ সেজে সকলের সঙ্গে ঘরকন্না করে স্বামীর সঙ্গে অন্য বাড়িতে ভিন্ন হওয়া, ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার করা। এই সাধারণ জীবনের প্রতিটি সাধারণ বড়ো ঘটনা তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে-চুরে অপ্রস্তুতে ফেলেছে। পনেরো বছরে বিয়ে হয় অনেক মেয়ের, যেমন তারা আশা ও কল্পনা করে শ্বশুরবাড়ি তেমন তাদের হয় না, কিন্তু তার মতো কার মনে হয়েছে যে কুমারী-জীবনের মানুষদেব সংসার থেকে একেবারে অন্যরকম জীবদের মধ্যে এসে পড়েছে ? স্বাধীন সুখী জীবনের কল্পনায় মশগুল আত্মহারা হয়ে ভিন্ন বাড়িতে এসে দেখতে পেয়েছে সেটা আরও ছোটো খাঁচা, আরও বৈচিত্র্যহীন পরাধীন জীবন ? ছেলেমেয়ে বড়ো হয়েছে খেয়াল করে, নিজের বয়স বেড়েছে জেনে, এত ছোটো পরিবারের এত সংকীর্ণ জীবনটুকু কানায় কানায় ভরে তুলতে না পারার কষ্টভোগে, বারবার তাকে অপ্রস্তুতে ফেলেছে জীবন।

এতদিন পরে এ বাড়িতে ফিরে এসে তারই আরেক পালা শুরু হল !

এ বাড়িব মানুষের ভিড়টা নয়, তাদেব একাকার জীবনযাত্রার বহর মণিকে আবার ওলট-পালট খাওয়ায়। তার মনের হাল পানি পায় না। এ সবই তাকে প্রণব খুলে বলেছিল। ছোটো দোতলা বাড়িতে এমনিতেও লোক বরাবর বেশি, দাঙ্গার জন্য আরও অনেক আত্মীয়বন্ধু এসে ভিড় বাড়িয়েছে। ধরাবাঁধা পাবিবারিক নিয়মের বাঁধুনি এ বাড়িতে চিরদিনই শিথিল, এখন আরও বিপর্যয় এসেছে তাতে।

কোণের সেই ছোটো ঘরটা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারব। খুব কষ্ট হবে মণি বউদি।

ছাঁত করে হিংসা ঝলক মারে প্রথমে ! ছোটো ঘরটা ছেড়ে দিতে পারব ! দয়া, অনুগ্রহ ! স্বেচ্ছায় তারা দখলিস্বত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে যেন এ বাড়িতে মণির স্বামীর অংশও বাতিল হয়ে গেছে ! কিন্তু না, মণি নিজেই বোঝে, কথাটা তা নয়। প্রণব তা বলেনি। তাদের খাতির করেই ছোটো হলেও আস্ত একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ বাড়িতে এখন একটি সম্পূর্ণ ঘর কারও দখলেই নেই। মণিদের ছোটো ঘরটা ছেড়ে দিলে অন্য [illegible]লের থাকা খাওয়া বসার ঘোরালো স্থান-সমস্যা আরও ঘোরালো হবে। তা হোক। ও সব অসুবিধা এখানকার সকলের গা-সওয়া আছে, মণিদের মোটে অভ্যাস নেই ওভাবে থাকা।

হিংসা ছাঁত করে বুক ছুঁয়েছিল, সব শুনে প্রতিক্রিয়া হল বিপরীত।

তুমি আমায় কী ভাবো ? সবার কষ্ট হবে, আমি আরামে থাকতে চাইব ? আমায় তুমি চিরদিন ভুল বুঝলে ঠাকুরপো !

আরামে থাকবে না মণি বউদি। কষ্টই পাবে।

চাই না আরাম। মিলেমিশে কষ্ট অসুবিধা সওয়ার চেয়ে সুখ আছে ?

কী ভেবে সে এ কথা বলেছিল, আর কী দেখল এখানে এসে। কষ্ট ? অসুবিধা ? মনে তো হয় না এতটুকু বাড়িতে জনকুড়ি স্ত্রী-পুরুষ আর গন্ডা আড়াই কাচ্চা-বাচ্চারা ছ্যাঁচরা-পোড়া ডালভাত খেয়ে ঘরে-বাইরে রোয়াকে বারান্দায় শুয়ে-বসে জীবন কাটাতে কোনো কষ্ট, কোনো অসুবিধা বোধ করছে। এ যেন খেয়াল-খুশির হাটে এসে পড়েছে মণি, স্বামীপুত্র নিয়ে সেই শুধু এসেছে বাধ্য হয়ে, অন্য সকলের সাধ করে বেড়াতে আসা ! কী খাবে, কোথায় শোবে, কী করে একটু আড়াল পাবে কারও তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা এবং সেটা অকাতরে মেনে নেওয়া যে তাই সই, তাই সই ! সুখে-স্বচ্ছন্দেই বেশ আরামে আছি বলে ভাঁড়ামি করা নয় নিজের সঙ্গে। আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়ে মুখ আলো করে কেউ বসে নেই, দুর্ভোগ হচ্ছে প্রত্যেকের। বর্ষায়, গরমে, ভালো খাওয়ার অভাবে, সবার চেহারাতেই ক্লিষ্টতার ছাপ, টিকে থাকার এত বাস্তব ক্লেশ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছেলেমেয়ের অসুখ-বিসুখ, তারা রোগা হয়ে গেছে, তারা কাঁদে। শুধু এ সব নিয়ে কারও অনর্থক নালিশ নেই, কেউ হা-হুতাশ করে না !

না, শুধু তাই নয়। শুধু মন-মেজাজ বিগড়ে গিয়ে হতাশা ঠেকানো নয়। বাড়িতে সেবার একসঙ্গে তিনজনের গুরুতর অসুখের সময় এবং এবার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সে যেমন মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য শরীর-মন শিথিল করে দিত যে যা হবার হোক তার কিছু এসে যায় না,—এ বাড়িতে সবাই যেন পরামর্শ করে একসঙ্গে তেমনি আলগা করে দিয়েছে ভাবনা-চিন্তা-কষ্টবোধ।

বোধ হয় তাও শুধু নয়। কেমন একটা সামঞ্জস্যও করে নিয়েছে দাঙ্গা-পীড়িত শহরের বেঁচে থাকার সব রকম দুর্দশার সঙ্গে, যেটা নিষ্ক্রিয় গা-এলিয়ে দেওয়া সামঞ্জস্য নয়। তাই এত গল্পগুজব তর্ক-বিতর্ক হাসি-তামাশা, তাই এত গাঁ-ঘেঁষা অন্তরঙ্গতা যাতে হোটেলখানার মতো মায়ালো রসালো ভাবালুতা একেবারে বাদ,—এত এলোমেলো হইচই পর্যন্ত।

সদর দরজায় মোটাসোটা সন্তানবতী একটি বউ মণিকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায়। তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য সে সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেনি, কয়লার টুকরির দর করছিল। রোগা ঢ্যাঙা, একফালি ময়লা ন্যাতা পরনে এগারো-বারো বছরের একটা মেয়ে, তার মাথায় চারটি ছোটো ছোটো কয়লার টুকরি। চোরা কয়লার ছুটকো ফিরিউলি। দশ আনায় একটা টুকরি, সেব আড়াই কয়লা। দশ টাকা মন দাঁড়ায় !

দরদস্তুর স্থগিত রেখে মোটাসোটা বউটি বলেছিল, এসো ভাই। বলে বস্তির অকালে-পাকা ন্যাংটো-প্রায় মেয়েটাকে বলেছিল, দিয়ে যা। কী আর বলব তোকে। তোকে গাল দিয়ে আর কী হবে ! তোর কয়লাওয়ালা বাবুটার যেন পোলাও খেয়ে কলেরা হয়, কয়লা বমি করে কয়লা হেগে নরকে যায় !

দোতলার দক্ষিণ কোণে ছোটো যে ঘরটি মণিকে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে এই সরস্বতীও থাকত। আরও তিনটি বউয়ের সঙ্গে থাকত, যাদের মোট সাতটি কচিকাচা। সরস্বতী শুধু চেহারায় এবং এ রকম চোরা কয়লার দরদস্তুরেই গিন্নি-বান্নি, বয়স তার মোটে তেইশের কোটায়। চিদানন্দ নামে প্রণবের চেয়ে বয়সে ছোটো যে বন্ধুটিকে একদিন মণি জানত, তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। কোলে দেড় বছরের একটি মেয়ে, মাস চার-পাঁচ পরে আরেকটি ছেলে বা মেয়ে হবে। সরস্বতীকে এ জন্য একটু বেশি মোটা দেখায়।

অন্য তিনটি বউ মণির একেবারে অজানা। প্রণব তাদের কী বলল সেই জানে, হুকুম না অনুরোধ, চারজনে হাত লাগিয়ে দেখতে দেখতে জিনিসপত্র সরিয়ে ছোটো ঘরটা খালি করে দিল।

লজ্জা-সংকোচে মণি হয়তো মরে যেত। কিন্তু এ বাড়িতে ও রকম বাজে মরা সম্ভব ছিল না। অনেক কাল একা থেকে প্রবল হৃদয়াবেগ সামলে চলার অভ্যাস মণি হারিয়েছিল। রোগা ঢ্যাঙা ফরসা বউটি কুলুঙ্গি থেকে তার বেতের ঝাঁপিটি নামিয়ে নিচ্ছে, আচমকা তার হাত চেপে ধরে মণি নাটুকে খাপছাড়াভাবে যে কথাগুলি গলগল করে বলে গেল, সে সব সামান্য কারণে শরমে মরে যাবার অবস্থারই সস্তা কথা।

বউটির নাম নীলিমা, ত্রিশ-ঘেঁষা বয়েস, মুখে একটা আশ্চর্য শ্রান্তির ভাব, স্থিরতার মতো ম্লানিমা। তার স্বামী গিরীন এক ইংরাজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। তার মুখেও অবিকল এই রকম ক্লান্ত-স্থৈর্যের ছাপটাই মণির প্রথম চোখে পড়েছে এবং দুজনের এই মিল তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। নীলিমা নীরবে মন দিয়ে তার কথা শুনে বলে, কেন ভাবছ ভাই ? আমরা কি নালায় ভেসে যাচ্ছি তোমার খাতিরে ? আমাদের ব্যবস্থাও হচ্ছে।

ব্যবস্থাই বটে। খোলা ছাদে খানকয়েক মরচে-ধরা টিন পড়েছিল, আর ছিল চুন-সিমেন্ট মাখানো কতগুলি বাঁশ। যুদ্ধের ঠিক আগে দোতলা সম্পূর্ণ করার জন্য কেনা, পুরানো সস্তা মাল। দুজন মিস্ত্রি পাড়াতেই ছিল, কাল্লু ও রহমত। তাদের মধ্যে কাল্লুকে ডাকামাত্র পাওয়া গেল, রহমতের জ্বর। একজন ছোকরাকে সাথে নিয়ে কাল্লু খোলা ছাদে অস্থায়ী একটা চালা খাড়া করার কাজে লেগে গেল।

ওদের কেউ কিছু বলে না ঠাকুরপো ?

এখনও বলেনি।

এ পাড়ায় কাল্লু-রহমতদের বসবাস আশ্চর্য মনে হলেও রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়।

খাটুনে গরিব কিন্তু একচেটিয়া পেশা, ওদের বাদ দিয়ে দালান ওঠে না। এই ইটের অরণ্যে যুদ্ধোত্তর দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেও চুন-সুরকি-সিমেন্ট-ইটের শিল্পসৃষ্টি যথেষ্ট চলছে এবং সেটা অত্যন্ত লাভজনক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনট্রাক্টর মাধববাবু এ পাড়ারই বাসিন্দা, প্রণবদের এই ছাদ থেকে তার তেতলা বাড়ির জমকালো উপরের অংশটা দেখা যায়, যদিও নীচের দুটো মোটরের গ্যারেজ আড়াল থাকে। মালমশলা দুষ্প্রাপ্য অথচ মাধবকে কনট্রাক্ট দিলে সে তিন মাসে তেতলা দালান তুলে দেবে ! কিন্তু সে জন্য কাল্লু-রহমতদের দরকার। পথটা ভেতরের দিকে গিয়ে যেখানে একটা মাঝারি ও একটা সরু গলিতে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানকার বস্তিটার একাংশে এরা কয়েক ঘর বাস করে।

গোড়ার দিকের উন্মত্ততায় আক্রমণের একটা চেষ্টা হয়েছিল। প্রণব এবং পাড়ার দশ-বারোটি ছেলে ছুটে গিয়ে বুক পেতে রুখে দাঁড়িয়ে সেটা ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, দামি গাড়ির নিঃশব্দ উদারতায় মাধব এসে হাজির।

হুঙ্কার দিয়ে সে বলেছিল, তোমরা কী চাও ? আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ ! আমি সহ্য করব না। হিন্দু কখনও নিরীহ শান্ত মানুষকে মেরেছে, বিধর্মী বলে ? এরা আমার লোক।

এ পাড়ার রতন সান্যাল সবচেয়ে উগ্র, ব্যক্তিগতভাবেও দাঙ্গায় সে সত্যই নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রতিহিংসায় তার পাগল হওয়া আশ্চর্য নয়। রতন ক্ষোভে চিৎকার করে বলেছিল, ওদের পাড়ায় ওরা মারছে না নিরীহ শান্ত মানুষকে ?

মারছে ? ওদের সেই পাড়ায় যাও ! সেখানে গিয়ে ধ্বংস করে ফেলো ওদের। আছে সে বুকের পাটা ?

এটা প্রকাশ্য নাটক, বাজে অভিনয়। তা দিয়ে ঠেকানো যায়নি। তাহলে খাঁটি আন্তরিক চেষ্টা দিয়ে প্রণবেরাই ঠেকাতে পারত। আসল কথা, মাধব এভাবে রুখে দাঁড়ালে এ পাড়ায় কারও সাধ্য নেই প্রাণের সাধ মিটিয়ে হিংসার ঝাল ঝাড়ে। কারণ এই মাধবই গায়ের ঝাল ঝাড়ার অন্য অয়োজনের নেতা। তার অন্য ক্ষমতাও অনেক !

বাড়ির আনাড়ি সহকারীদের সাহায্যে আটটার মধ্যে কানু ছাদে চালা খাড়া করেছিল। কয়েকজন পুরুষ এ চালায় এল। ছোটো ঘরের বাসিন্দা বউ কজন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গেল তাদেব ছেড়ে দেওয়া ঘরে। ব্যবস্থা হল এই। সহজ, সংক্ষেপ ও ঢালাও !

মণি কোথায অবাক হবে, তার হল জ্বালা।

তুমি এ জন্য আমায় এনেছিলে ঠাকুরপো ? এভাবে অপমান করতে ?

মণিকে সে যেন জোর করে টেনে এনেছে, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ! মাঝরাত্রি যখন পার হয়ে গেছে, শ্রান্তিতে যখন আকাশের চাঁদ আর অবুঝ জগৎ সহজ স্পষ্ট বাস্তব ঘুম চেয়ে ধৈর্য হারাতে বসেছে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, তখন এ রকম ন্যাকামিতে মহাপুরুষেরও রাগ হয়।

অপমান হয়েছে ? বেশ, কাল ফিরে যেয়ো।

সে অপমান নয়।

কোন অপমান তবে ?

তুমিও আমায় বুঝলে না ঠাকুরপো !

কথা হচ্ছিল সিঁড়িতে। প্রণব ছাদে উঠছিল। নতুন চালাটার নীচে হোক, খোলা আকাশটার নীচে হোক, কোনো এক জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। মণি নীচে নামছিল ছাদ থেকে নিজের মনে অজস্র মনগড়া অপমান কুড়িয়ে মর্মাহত হয়ে,—ছোটো হোক বড়ো হোক একটা ঘর তাকে দেবার জন্য একবেলায় এ রকম চালা তোলা, সকলেব বসবাস উলটে-পালটে দেওয়া ! এরা তাকে ভেবেছে কী ?

মণি জানত না আবেগেরও সীমা আছে। সে সীমা দেহের—সহ্যশক্তির, হৃদয়ের নয়। প্রণবও বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল যে অতীত সহজে মরেও মরে না মণিদেব জীবনে। এতদিন পরে এত বয়সে পুরানো ছেলেমানুষির পুনরভিনয় তাকে প্রথমটা প্রায় থতোমতো খাইয়ে দেয়। মণির কিন্তু বাঁধ ভেঙেছে। সে অনায়াসে হাতের ভাঁজে মুখ রেখে তার নিঃশব্দ ভঙ্গিতে কাঁদে।

কেন মিছে এমন করছ মণি বউদি ? শান্ত হও।

শান্ত হচ্ছি ঠাকুরপো।

সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই সে শান্ত হয়। করুণভাবে একটু হাসে।

এই বোধ হয় প্রথম, না ঠাকুরপো ? যেচে তোমার মায়া চাইলাম ? মনের জোর এমন কমে গেছে আমার !

সেই আত্মনাশা অহংকার। অহংকার অবিকল সেই সরলা ক্ষীণা আনাড়ি তরুণীর বিজয়িনী হতে চাওয়া, জগৎকে জয় করার ইচ্ছা ছেঁটে ছেঁটে শ্বশুরবাড়িটা পর্যন্ত আয়ত্ত না করতে পেরে আরও গুটিয়ে শুধু স্বামীপুত্রের নীড়টুকু সম্বল করা, যেখানে অন্তত সে সর্বতোময়ী। প্রণব একটু আশ্চর্য হযে যায় ! এভাবে নিজেকে সামলাবার জোর তবে সেই মণি পায় কোথায় ?

তুমি তেমনি আছ।

আছি ? তেমনি আছি ঠাকুরপো ? তবে কেন তুমি ভালো করে কথা কইছ না আমার সঙ্গে ? কেন পর পর হয়ে তুমি ভালো থাকছ ? শুধু আমি বলে ঠাকুরপো, অন্য মেয়ে হলে, এ রকম ভাব হলে, তোমার সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্ক হয়ে যেত। যেত না ? তুমিই বলো ! সবাই কানাকানি করেছে, উনি পর্যন্ত সন্দেহ করেছেন, কিন্তু আমাদের মনে এতটুকু ময়লা আসেনি। আমরা গ্রাহ্যও করিনি লোকে কী ভাববে, লোকে কী বলবে। নয় কী ?

এত কথার জবাবে প্রণব মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোবে না ?

অপমানে মণি চোখ বোজে। কিন্তু সে ছোটো হয়েছে, জীবনের পরিধি ছোটো করে এনেছে, কখনও হার মানেনি। আজও সে হার না মেনে গাঢ় স্নেহের মৃদু হাসি হেসে বলে, তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে ?

শেষরাত্রে আচমকা ঝড় ওঠে, মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ছাদের চালা উড়ে ছত্রখান হয়ে পড়ে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই। প্রণব সিঁড়ির নীচে একতলায় দুজন ঘুমন্ত মানুষের মাঝখানে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে জাগে না। ছাদের মানুষগুলি মাদুর-বিছানা বগলে নীচে নামে, সিঁড়ির নীচে আর পাশের ঘরে শোয়া-বসার আয়োজন করে। গন্ডগোলে প্রণবের ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু সে জাগে না। বস্তুতে গড়া দেহ মানুষের, বিশ্রাম ছাড়া চলবে কেন। তার অনেক কাজ।

একটি দুটি দিন চলে যায়, প্রণবের কাজের চাপটা মণির ঠাহরে আসে। ভাব দেখে মনে হয়। কোনো বিষয়ে প্রণবের এতটুকু তাড়াহুড়া নেই, কিন্তু কীভাবে কত কাজ সে করে সেটা শুধু আন্দাজ করা যায় তার দিকে না চেয়ে তার কাজের হিসাব করলে।

হিসাব করাটা মণির পক্ষে খুব সহজ নয়। শুধু তাকে আর তার কটা ছেলেমেয়ে নিয়ে যে ছোটোখাটো সংসার, সেটা চালিয়ে আসছে সুশীল। এই দায়িত্ব নিয়েই সে কত ব্যস্ত, কত ব্যতিব্যস্ত, রোজ একেবারে হিমসিম খেয়ে যায় ! সে সব ছিল ফেনানো কাজ, একটা কাজের সঙ্গে অসংখ্য অকাজ। তুচ্ছ কাজের তুচ্ছ খুঁটিনাটিকেও অযথা গুরুত্ব দিয়ে নিখুঁত করার চেষ্টা। এই নিয়েই কী সে ছিল ? এ বাড়ির মোটা কাজ আর মোটা ব্যবস্থা, খুঁটিনাটি নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামানো বর্জন, মণিকে তার সংসারের কথা মনে পড়িয়ে উতলা করে তোলে। ছেলেপিলে সম্পর্কে এদের গা-ছাড়া ভাবকে মনে মনে যথেষ্ট নিন্দা করেও সে সুখ পায় না। ভালোই আছে ছেলেপিলেরা এখানে, যথেষ্ট ভালো আছে, চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে না থেকেও !

বারবার ছোটো ঘরটিতে গিয়ে মণি বসে, আকাশ-পাতাল ভাবে। বেশি ক্ষণ ভাবতে পারে না, দম আটকে আসে তার। একটা আস্ত বাড়িতে তার যে সংসার ছিল, এই বাড়িতে এতটুকু এই ঘরটি ভরাট করার মতোও যেন তা যথেষ্ট বড়ো নয়, আরও ে টা আরও সংকীর্ণ। কারণ, একা সে-ই কেবল একটি ঘর পেয়েছে এ বাড়িতে।

সেদিন সকালে গিরীন বাড়ি ফিবল না। বাত্রে সে আজকাল বাড়ি ফেরে না, কাগজের আপিসেই শুয়ে থাকে। রাত জাগলে বাড়ি ফিরতে তার বেলা হয়, অন্যদিন সকাল সকাল একপ্রস্থ বাজার বা রেশন নিয়ে পৌঁছে যায়। পথে বিপজ্জনক এলাকা পড়ে কিন্তু একটা সুবিধা আছে গিবীনের, আপিসের ভ্যান তাকে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছে দেয়। তবে যে অবস্থা শহরের কিছুই আজকাল বলা যায় না। লাটপ্রাসাদের এলাকা ছাড়া কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। গিরীন না এলেও তার সহ-সম্পাদনার খবরের কাগজখানা এসে পৌঁছেছে। হকারদের কাগজ বিলি করা পর্যন্ত কিছু ঘটেনি আশা করা যায়, ঘটলে কাগজের সঙ্গে সে খবরটাও সে দিত। আপিস থেকে বেরিয়ে কোনো কাজে কোথাও কি গিয়েছে গিরীন ? ে থাও আটকে গেছে ? কোনো বিপদ ঘটেছে তার ?

পাড়ার রসময়দের বাড়ি থেকে নীলিমার ভাই গোকুল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আপিসে টেলিফোন করে আসে এগারটার সময়, প্রণব বাড়ি ছিল না। মণি প্রথম জানতে পারে এ বাড়িতে নীলিমার একটি ভাইও থাকে এবং গোকুল নামে নীলিমার মতো রোগা ঢ্যাঙা ও তুলনায় বেশ একটু কালো ছেলেটিই তার সেই ভাই। নীলিমা যে ভাইকেও আগে চিনিয়ে দেয়নি তাও বোধ হয় এদের রীতি। গোকুল খবর নিয়ে আসে, গিরীন ভোরেই আপিস থেকে যথারীতি বেরিয়েছে। বিশেষ কাজে তার কোথাও যাওয়ার খবর কেউ জানে না।

সরস্বতী বলে, তবে তো ভাবনার কথা হল !

উষা বলে, আপনার উনি তো এ রকম খবর না দিয়ে কোথাও যান না দিদি ?

উষা প্রণবের পিসতুতো বোন। পার্ক সার্কাস অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। সর্বস্ব ফেলে সবাই মিলে শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, উষার তাই যেমন রাগ যত বিদ্বেষ, তেমনি ভয়। যখন তখন সে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে গলা ছেড়ে অভিশাপ দিতে শুরু করে, কোনো একটা বা দশটা বিশেষ মানুষকে নয়, একটা সম্প্রদায়ের নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্বকে। অভিশাপ দিতে দিতে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দেয়। প্রণব একদিন তাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে তাদের মতো অনেকে এ অঞ্চল থেকেও তার ছেড়ে আসা এলাকায় পালিয়েছে, শুধু সম্পত্তি নয় আপনজনের প্রাণও রেখে গেছে। উষা বোঝেনি। বুঝবার কথাও নয় তার। প্রণবও আর চেষ্টা করেনি। শুধু বলেছে, কয়েক কোটি লোককে শাপ দিয়ে কী করবি ? কারও গায়ে লাগবে না তার চেয়ে নাম ধরে গাল দে, মনে শান্তি পাবি। প্রণব কয়েকটা দেশি বিলাতি বড়ো বড়ো নাম তাকে শুনিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক নেতার নাম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারের নাম।

উষা আশ্চর্য হয়ে বলে, সাহেবদের শাপ দেব কেন ? ওরা আমার কী করেছে !

মণি এ আলাপ শোনেনি, তখনও সে এ বাড়িতে আসেনি। শুনলে হয়তো উষার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে খুশি হত। ইতিহাস বা রাজনীতি কোনোটা নিয়ে কোনোদিন মাথা না ঘামালেও এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ফসলের চাষের জন্য ইংরাজের প্রাণপাত সাধনা সম্পর্কে সাধারণ চলতি জ্ঞানটুকু তার ছিল।

ভূপেন গিরীনের খবর এনে দেয়।

ভূপেন ভোরে স্নান করে কাজে বেরিয়ে যায়, দুপুরে খেতে আসে। খেয়ে উঠে আধঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা নাগাদ। অনাত্মীয় প্রৌঢ়বয়সি সাদাসিদে নিরীহ মানুষ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, খুব অল্প কথা বলে। খাই-খরচা বছরখানেক এ বাড়িতে আছে, বৈঠকখানায় একটি তক্তপোশে শোয়। ভিড় হওয়ার পরেও এ বাড়িতে শুধু তার শোয়ার ব্যবস্থা অবিকল রয়ে গেছে, কারণ, তক্তপোশটি তার হাত দুই চওড়া, প্রায় একটি চওড়া বেঞ্চের মতো, তাতে একজনের বেশি দুজনের শোবার উপায় নেই।

বৈঠকখানায় প্রণবের বাবা অনুকূল ও বাড়ির আরও তিনজন পুরুষ গিরীনের সম্পর্কে ফলাও করে উদ্‌বেগ প্রকাশ করছিল, জামা খুলতে খুলতে ব্যাপার জেনে ভূপেন আবার বোতাম এঁটে বেরিয়ে যায়। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে জানায় যে গিরীনের খবর পাওয়া গেছে। মারাত্মক আহত এক বন্ধুর সঙ্গে সে হাসপাতালে গেছে। নিজে সুস্থ এবং অক্ষত আছে গিরীন।

খবর শুনে, নীলিমা এসে শুধায়, কোন বন্ধু, নাম শুনেছেন ?

তোমাদের মনসুর।

কবি মনসুর ? ইস্ !

মণি একটু অবাক হয়ে তাকায় নীলিমার দিকে। তার মামার মৃত্যুসংবাদ নীলিমা নীরবে শুনেছিল। তবে তার মামা নীলিমার অচেনা, কবিটি তার চেনা লোক। তবু ?

উষা কাছে ছিল। সে বলে, মোসলা ? ঠিক হয়েছে।

তারপর হঠাৎ সে আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার উনির মোসলা বন্ধু দিদি ? এটা কী রকম কথা হল ?

সে আমারও বন্ধু ভাই।

শুনে উষার মুখ একটু হাঁ হয়ে যায়।

তিনটে নাগাদ গিরীন ফেরে, তার কাছে ব্যাপারটা জানা যায়। শহরের ব্যাপক ও স্থায়ী দুর্ঘটনারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার, মানুষটা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং গিরীনের চোখের সামনে ঘটনাটা

ঘটেছে এইটুকু শুধু এ ব্যাপারের বিশেষত্ব। একটু অবিবেচনার পরিচয়ও হয়তো গিরীন দিয়েছে। মনসুরও বাস্তব অবস্থা ঠিকমতো বিচার করতে পরেনি। সে সেই ধরনের মানুষ, বিশেষ মত পথ বা আদর্শ ধরে যার ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উপরে ওঠার প্রচেষ্টা ছিল না, আপনা থেকে স্বাভাবিক-ভাবেই ও সব বিশ্বাস ও সংস্কার তার মোটামুটি খসে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে নানাস্থানে নানা জাত ও ধর্মের মানুষের ঘনিষ্ঠতায় বড়ো হয়ে তার হৃদয়-মন বিশেষ একটা গড়ন পেয়েছে। নিজেই সে জানে না সে নাস্তিক কি না, তার কথাবার্তা চালচলন খাপছাড়া কি না, তার মানবতা-বোধ আছে কিনা,—ও নিয়ে কখনও মাথাও ঘামায়নি। কবি হিসাবে নজরুলের আধুনিক সংস্করণ হবার চেষ্টাটা তার আন্তরিক, বোধ হয় সেই জন্যই তার কবিতায় সরলতা এবং জটিলতার চরম সমাবেশ ঘটে, একটা লাইন হয় গ্রাম্য ছড়া এবং পরের লাইন শব্দার্থক ধাঁধাকে ছাড়িয়ে যায়,—কবিতা ভালো হয় না। তাতেও মনসুরের যেন দুঃখ নেই। গিরীন তার কবিতার নিন্দা করে সবচেয়ে বেশি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে অফুরন্ত হাসি হেসে যায়, যেন উপভোগ করছে অসংযত ঘরোয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা।

নীলিমা হেন নারী, তারও মায়া হয়েছে। বাধা দিয়ে বলেছে, থামো তুমি। ছাই কবিতা লিখছে সবাই, মাথামুন্ডু নেই। ওর কবিতার তবু দু-চারলাইন বোঝা যায় !

সহানুভূতি জানিয়ে মনসুরের কৃতজ্ঞতা অর্জন করা গেছে কিনা সেটা কিন্তু বোঝা যায়নি।

সকালে আপিসের ভ্যান থেকে এসপ্ল্যানেডে নেমে তার সঙ্গে গিরীনের দেখা হয়। আজকাল ভোরে গিরীন একটু ক্লান্তি বোধ করে, মনটা ভালো থাকে না। চারিদিক থেকে যে সব উত্তেজনাকর খবর এসে জমা হতে থাকে পরদিন পরিবেশনের জন্য তার একটা প্রচণ্ড কষ্টকর চাপ আছে, একটা দুর্বিষহ বিষণ্ণতার দিক আছে, রাত্রে সেটা টের পাওয়া যায় না। সকালে একটা শারীরিক গ্লানির মতো, মাথা ধরে থাকার মতো, নিরানন্দ কষ্টকর ভাবটা অনুভব করা যায়। সারারাত্রি যখন ভয়ানক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের চাপে ঘুম হয়নি। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলি কেটে-ছেঁটে চেলে নিতে নিতে প্রতিদিন যে সমগ্র তাৎপর্য পাওয়া যায় তা শুধু অশুভ ইঙ্গিতের, মারাত্মক সম্ভাবনার। সহজে সর্বনাশা দাঙ্গার আগুন নিভবে, সহজে দেশজোড়া বিক্ষোভের মীমাংসা হবে, কল্পনা করাও অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

দেখা-সাক্ষাতে কিছুদিন ছেদ পড়েছিল, দুজনেই খুশি হয়। মনসুর তাকে চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে চা-ও খাওয়ায়, একটা কবিতাও শুনিয়ে দেয়.

নতুন কবিতা ? নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

কাল লিখেছে।

কবিতার আরম্ভটা মনে আছে গিরীনের : শত সংঘাতে টুটিবে না ভালোবাসা, ভাষা যে রে একাকার ! কবিতা পড়ে চিরদিনের মতো সাগ্রহে মনসুর জিজ্ঞাসা করেছে, কেমন লাগল ? এবং চিরদিনের মতোই হাসিমুখে নিন্দা শুনেছে। ফকিরচাঁদ লেনে 'কালের কথা' মাসিকপত্রের আপিস, সম্পাদক কেদারনাথের বাড়িরই বৈঠকখানায়—কবিতাটি সেখানে পৌঁছে দিতে বার হয়েছে মনসুর।

গিরীন বলেছিল, ডাকে পাঠিয়ে দিয়ো। নিজে নাই বা গেলে ?

কী হবে ? আমি কাকে ডরাই ! আমার কেউ শত্রু নেই।

এগুলি কবির কথা। আসলে অনেকদিন যাওয়া হয়নি, কেদারের ওখানে গিয়ে আড্ডা দেবার জন্য মনসুরের প্রাণটা আনচান করছিল। গিরীনের প্রাণটাও হঠাৎ কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেদারের ওখানে কেন, বহুদিন সেও দশ মিনিটের জন্য বাড়ির বাইরে কোথাও আড্ডা দেয়নি। আকাশে মেঘ নেই,এই সকালেই চন্‌চনে রোদ উঠেছে, এতক্ষণে চৌরঙ্গির এদিকটা যান-মানুষের সরগরমে জীবন্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করার কথা। মাঝরাত্রি পর্যন্ত যেখানটা গাড়ি-মানুষে গমগম করত, সন্ধ্যা হতে

না হতে আজকাল যে সেখানটা জনবিরল হয়ে আসে, সকালেও যেন তার জের চলছে, ভয়ে সংকোচে অনিচ্ছায় আস্তে আস্তে আংশিক প্রাণ পাচ্ছে। ট্রাম-বাস অর্ধেক খালি। তার জীবনেও এই ছোঁয়াচ লেগেছে। আপিসে যায়, সেখানেই ঘুমায়, সকালে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, সারাদিন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে গতিবিধি মেলামেশা।

চলো কবি, আমিও যাব।

কাছাকাছি আশেপাশে হাঙ্গামা হয়েছে গিরীন জানত, ফকিরচাঁদ লেন থেকে কোনো গোলমালের খবর পাওয়া যায়নি। গুরুতর কিছু ঘটে থাকলে গিরীন জানতে পারত। আর যদি ঘটেই থাকে তাতেই বা কী ? মানুষ কি শুধু আতঙ্কের হিসাব কষেই দিন কাটাবে ! বিশ্রী হতাশা আর ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় গিরীনেরও অদ্ভুত একটা বেপরোয়া ভাব এসেছিল।

এদিকে ফকিরচাঁদ লেনেই রাত তিনটেয় ঘটে গিয়েছিল বীভৎস বিপর্যয়, খবর হয়ে খবরের কাগজের আপিসেও পৌঁছতে পারেনি সকাল পর্যন্ত। সে ঘটনার সঠিক বর্ণনা হয় না, ভাষায় তার রূপায়ণ নেই। পাশের এক পাড়া থেকে এসেছিল সংগঠিত আক্রমণ, অন্ধকারের সেই গোপন অভিযানের সেনাপতি ছিল এই এলাকার ছত্রপতি কলকাতার এক বিখ্যাত গুন্ডারাজ। সহকারী দলবল দিয়ে উন্মাদ জনতাকে হত্যা ও লুঠপাটে পরিচালনা করার এমন সুযোগ তার জীবনে কেন, তার পূর্ববর্তী নামকরা ফারুক সর্দারের একষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত একচেটিয়া স্বরাট গুন্ডামির জীবনেও কখনও আসেনি। ফকিরচাঁদ লেনের হৃদয় প্রতিহিংসায় পুড়ে যাচ্ছিল। কতগুলি বাড়ি থেকে বারংবার টেলিফোন করে পুলিশ বা ফৌজ আনানো যায়নি। কথা বলতে বলতে ফকিরচাঁদ লেনে খানিক এগিয়ে গিরীন হঠাৎ সেই অস্বাভাবিকতা আঁচ করেছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চল ফিরে যাই। অবস্থা সুবিধে নয়।

মনসুর রাত জেগে কবিতা লিখেছে, সে তখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

তুমি তো বড়ো ভীরু ?

তারপর ফকিরচাঁদ লেনের বিক্ষোভ ডজনখানেক যুবকের মারফতে কবির উপর আছড়ে পড়েছিল। মনসুরের পরনে ছিল লাল পায়জামা !

পায়জামা ? মনসুর সত্যি পাগল !

পাগল ছাড়া কী। ধুতি-পায়জামা-প্যান্টালুন ইতিমধ্যেই শহরের দাঙ্গা সম্পর্কে মর্মান্তিক রসিকতার মর্যাদা পেয়েছে। মানুষের গায়ে তো আর লেখা থাকে না তার ধর্ম বা সম্প্রদায়। কালা দেশের কালো মানুষের চেহারা প্রদেশে প্রদেশে একই রকম। পোশাক ছাড়া চেনাই দায় হিন্দু কি মুসলমান—যদি না বিশেষভাবে চেনাবার জন্যই দাড়ি-গোঁপ ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। কোট-প্যান্ট-টাই-হ্যাটের নিরাপত্তা দাঙ্গার একমাসের মধ্যে জানা হয়ে গেছে। ট্রাউজার পরে সায়েব সেজে নাকি যে কোনো সময় শহরের যে কোনো এলাকায় গিয়ে নিরাপদে পাক দিয়ে বেড়ানো যায় সাত ছোরার পাশ কাটিয়ে !

পায়জামা পরার জন্যই প্রাণটা যেত মনসুরের। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গিরীন যদি না হঠাৎ দিশেহারার মতো গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করত, এঁকে মারবেন না, ইনি কবি, ইনি—কবি !

আপনি কে মশাই ?

আমার নাম গিরীন রায়। আমি বই লিখি, ইনিও বই লেখেন। এঁর নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রব ওঠে : ছেড়ে দাও।

পাঁচ-সাতটি ছেলের গলা, তারা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, কিছুই করার ছিল না তাদের। প্রাণটা রয়ে গেল কবির, চেঁচামেচি বিশৃঙ্খলার মধ্যে ওই ছেলে ক-জন একটা গাড়ি জোগাড় করে এনে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

বাঁচবে তো ?

হয়তো বাঁচবে। ঠিক নেই।

এতক্ষণ পরে নীলিমা প্রথম জিজ্ঞাসা করে, তোমার কিছু হয়নি তো ?

এক ঘা ডান্ডা খেয়েছি।

বাঁ হাতটা প্রায় অবশ, টনটনে ব্যথা। মণি এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গিরীনের মুখে যাতনার ছাপটা সবখানি কবি মনসুরের জন্য তার বেদনাবোধের প্রমাণ বলে ধরে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এ রকম বন্ধুত্ব কল্পনা করতে গেলে তার অনেক বিষয়েই মুশকিলের সীমা থাকে না।

সন্ধ্যার সময় এক খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে। চাল-আটা কম পড়েছে এ বেলা, মেয়েরা আলোচনা করছিল সে বিষয়ে কী ব্যবস্থা করা যায়। কিছু চোরাবাজারি চাল এনে রেশনের ঘাটতি পুরনের কথা ছিল গিরীনের, চাল সে আজ আনতে পারেনি। আচমকা একটি মেয়ে আসে এ বাড়িতে, তার চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর। তাদের মতো তাদেরই ধরনে শাড়ি-ব্লাউজ পরা, আলগা খোঁপা এবং মাথার পিছনে আঁচল ঠেকানো ঘোমটা। শুধু সিঁথিটা সাদা। নীলিমা তাকে সবিস্ময়ে অভ্যর্থনা জানায়, রশৌনা ! তুমি এখানে ?

তার নাম শুনে মণিরা থ বনে থাকে। রশৌনার চোখ-মুখের কাঠিন্য সুস্পষ্ট, নরম গাল পাতলা ঠোঁটের আড়ালে সে যেন দাঁতে দাঁতে কামড়ে আছে।

তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করতে এলাম।—রশৌনা বলে।

হাসপাতালে গিয়েছিলে ভাই ? সরস্বতী তার মোলায়েম গলায় শুধায়।

সেখান থেকেই আসছি।

নীলিমার মুখে উদ্‌বেগের ছাপ পড়ে।—কী হয়েছে ? ব্যাপার কী ? কবি ভালো আছে তো ?

শরম লাগল না জিগ্যেস করতে ? গলায় আটকাল না ?—আবেগে ফেটে পড়ে রশৌনা, তীব্রতায় তীক্ষ্ণতায় চমকপ্রদ মনে হয় তার জ্বালা আর ক্ষোভ—ফন্দি করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মারলে,—কী হয়েছে, ব্যাপার কী, ভালো আছে তো ! ম' যে বলত তোমাদের জাতটাকেই বিশ্বাস নেই, এমনি করে তার প্রমাণ দিলে ? বন্ধুকে খুন করিয়ে ?

খুন করিয়ে ? নীলিমার চমক লাগে, কী বলছিস তুই ? তিনটের সময় ও দেখে এল—

তুই তুই করিস নে তুই আমাকে ! তুই আমার বন্ধু নোস। তোরা খুনে, তোরা জাহান্নামে যাবি।

উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপে, এলোমেলো নিশ্বাস নেয় কিন্তু তার ঘৃণা-বিদ্বেষের তীব্রতা ভুল করার উপায় নেই, শুধু বেদনায় অভিমানে সে আত্মহারা হয়নি। নীলিমা তাকে ঘাঁটাতে না চেয়ে শুকনো সুরে সোজা প্রশ্ন করে, মনসুর কি বেঁচে নেই ?

মারতেই তো চেয়েছিলে, পারলে না বলেই তো জ্বলেপুড়ে মরছ !

যাক, কবি তাহলে বেঁচেই আছে, শোকের ধাক্কায় মাথা খারাপ হয়ে রশৌনার এ পাগলামি নয়। ছেলেবেলা থেকে স্কুলে তারা একসাথে পড়েছে, ভাব তাদের আজকের নয়, তাদের সখিত্বের ভিত্তিতেই গিরীন আর মনসুরের পরিচয়, বন্ধুত্ব ! আচমকা এভাবে এসে রশৌনা এ রকম আবোল-তাবোল কথা বলতে শুরু করায় মনে মনে নীলিমা চরম দুর্ঘটনাটাই ঘটেছে বলে ধরে নিয়েছিল। সেটা সত্য নয় জেনে নীলিমা যে কী ভরসা পেল !

রশৌনা সহজেই আবেগ সামলে নেয়। সে সত্যই মনগড়া অভিমানে কাতর হয়ে নালিশ জানাতে আসেনি, রাগের জ্বালা সইতে না পেরে অসময়ে এত দূরে ঝগড়া করতে এসেছে। তার পরের কথা ব্যবহারে সেটা আরও স্পষ্ট হয়। নীলিমা তাকে বসতে বলে, জানতে চায় তাদের

দোষটা কী—যে জন্য এত জ্বালা হয়েছে রশৌনার। রশৌনা বলে সে বসতে আসেনি, কেন তারা এমন কুৎসিত এমন জঘন্য কাজ করেছে তার কৈফিয়ত চাইতেও আসেনি। সে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এসেছে, জানিয়ে দিতে এসেছে আজ থেকে সেও তাদের শত্রু, তাদের সর্বনাশ করা আজ থেকে তার পণ।

তোমরা কাফের, তোমরা পার মুখোশ পরে বন্ধুকে ভুলিয়ে প্রাণে মারতে, আমরা পারি না। আমরা জানিয়ে শত্রুতা করি। তাই বলতে এসেছি, পরে যেন দোষ দিয়ো না বন্ধু সেজে ক্ষতি করেছি।

এ সব কথা মাথা বিগড়ে যাবার লক্ষণ, কিন্তু এ হল্‌কা যে সত্যসত্যই মনে লাগানো আগুন থেকে আসছে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে রশৌনার পাগলামির পিছনে। নীলিমা কী বলবে ভেবে পায় না। একদিনে এককথায় তাদের এত দিনের বন্ধুত্ব বাতিল হয়েছে মেনে নেবার অভিনয় করাটাও তার কাছে হাস্যকর মনে হয়।

বন্ধুর মতোই সে তাই বলে, কার কাছে আবোল-তাবোল কী শুনেছিস, ব্যাপার তুই কিছুই জানিস না রশৌনা।

যার জান নিয়ে ব্যাপার, তার কাছেই শুনেছি।

কবি বলেছে ? কবি বলেছে ওকে ভুলিয়ে—?

বলবে না ? তোমরা শয়তান, তোমরা ধাপ্পা দিয়ে জানে মারবার চেষ্টা করবে—

শুকনো চোখ রশৌনা দুবার রগড়ে দেয়। তার সুন্দর চোখ দুটি একটু লাল ও কর্কশ হয়ে আরও অপরূপ হয়েছে।

দাঁড়া, ওকে ডাকি। নীলিমা বলে।

ডাকো না, ডাকো। আমি কাউকে ডরাই না ! রশৌনা বেপরোয়াভাবে বলে।

হাতের ব্যথায় গিরীন একটু কাতরাচ্ছিল, ব্যাপার শুনে সে কাতরানি ভুলে যায়। চিন্তিত হয়ে বলে, যা বলে বলুক মেনে নিয়ো, তর্ক কোরো না, ঘাঁটিয়ো না। সঙ্গে কেউ আসেনি ? কী মুশকিল !

গিরীনকে দেখে গ্রীবা তুলে যে ঘৃণা ও হিংসার দৃষ্টিতে যে ভঙ্গিতে রশৌনা তাকায় তাতে আপাতত তাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করার কথা গিরীন ভাবতেও পারে না।

আপনার কিছু বলার আছে ?

কিছু না। ডান্ডা খেয়ে আমার অবস্থাও একটু কাহিল।

এ কথাটা গিরীন না বললেই পারত।

ও সব চালাকি জানি।

গিরীন একটু নীরব থেকে বলে, কবির জ্বর বেড়েছে ?

আপনার জেনে দরকার ?

গিরীন শান্ত সুরেই বলে, চলুন না কাল একসঙ্গে দেখতে যাই ? নীলিমাও যাবে।

রশৌনার চোখে ছুরির ধার ঝলকে ওঠে, ওঁর ধারে কাছে আপনারা কেউ গেছেন যদি শুনি, পরের বার ছোরা নিয়ে আসব।

গিরীন ও নীলিমা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। সরস্বতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বলে, রাত হলে ফিরতে অসুবিধা হবে ভাই।

ঝেঁঝে উঠে কী একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে রশৌনা চেপে যায়। মুখে কথার বদলে তার দু-চোখে জল নামে। দেখে আবার আরেকটা স্বস্তি বোধ করে নীলিমা।

সরস্বতী বলে, একজন এগিয়ে দিয়ে আসুক। তোমায় খাতির করে বলছি না। তুমি যেচে এসেছ, আমরা ডাকিনি। একজনকে সঙ্গে যেতে দেওয়া তোমারই কর্তব্য। মনে যাই থাক, অন্যায় কোরো না ভাই, হাতজোড় করে বলছি।

প্রণববাবু আছেন ?

এতদিনের বন্ধুবা শত্রু হয়ে গেছে কিন্তু শত্রুপুবীর প্রণবকে সঙ্গে যেতে দিতে তার আপত্তি নেই। প্রণবকে মণি আজ আবার নতুন কবে চেনে।

প্রণব ফেরেনি। আমি যাই ? সরস্বতী বলে।

না।

স্পষ্ট নিষেধ জানিয়ে যেমন এসেছিল তেমনিভাবে রশৌনা চলে যায়, তফাৎ থাকে এই যে এবার তাকে চোখের জল মুছে নিতে হয়। সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, শহরের বর্তমান অবস্থায় একা তাকে এভাবে যেতে দেওয়া অসম্ভব। এখানে অথবা মনসুরের ছোটো ফ্ল্যাটটি যে এলাকায় সেখানে হাঙ্গামা নেই, কিন্তু দাঙ্গার সুযোগে গুন্ডা-বদমায়েশরা শহরের নরক গুলজার করে রেখেছে। গোকুলকে তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে পাঠানো হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে রশৌনার ঠিক সঙ্গে সে যাবে না, একটু তফাতে থাকবে।

মণি সংশয়ভরে বলে, পাগল তো মনে হল না ?

মনে খুব ঘা লেগেছে। কবির কিছু হলে ও সইতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে নীলিমা গিরীনকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যখন এলে কবির জ্ঞান হয়নি ?

ভালো জ্ঞান হয়নি। এলোমেলোভাবে চেতনা হচ্ছিল, আবার ঝিমিয়ে যাচ্ছিল।

কী এমন বলল যে রশৌনা খেপে গেল ?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

চাল-আটার সমস্যাটা মুলতুবি ছিল। তাকে তুলে রেখে একবেলার জন্য ভুলে থাকার মতোও নয় সমস্যাটা, এতগুলি লোক আজ রাত্রে খাবে কী ?

মণি হঠাৎ বলে, আমার কাছে কিছু চাল আছে, দিচ্ছি।

তুমি চাল পেলে কোথা ? তুমি যা সঙ্গে এনেছিলে সে তো খরচ হয়ে গেছে ?

ভালো চাল তোলা আছে।

ছেঁড়া জামা-কাপড়ের ট্রাংকে সের সাতেক সুগন্ধি আতপ তোলা ছিল, পায়েস-পোলাউ খাওয়ার দামি চাল, সচরাচর মেলা কঠিন। হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে নীলিমা মাথা নাড়ে, না বাবা, প্রাণ ধরে এ চালের ভাত রেঁধে খেতে পারব না শাকপাতা দিয়ে—তোমবা পারবে ? ভাতের চাল আনা হোক, এ চাল দিয়ে কাল বরং ভোজ হবে।

ভূপেন পাড়ার যাদুগোপালেব মুদি দোকান থেকে চোরাবাজারের দরে দশ সের সাধারণ মোটা চাল নিয়ে আসে। মুদি দোকানের সঙ্গেই রেশনের দোকান, একই মালিক। পাড়ার ভিতরের দিকে বস্তির অনেকগুলি কার্ডের রেশন এ দোকান থেকে নেওয়া হয়, সব কার্ডের পুরো রেশন নেবার পয়সা অনেক মেয়ে-পুরুষের সব সপ্তাহে থাকে না, সহায়হীন বুড়িদের সংখ্যাই বেশি এর মধ্যে। তারা যে আটা-চাল ছেড়ে দেয় বাধ্য হয়ে, ওজনের কায়দায় এবং অন্য রকমে যা বাড়তি হয়, যাদুগোপাল সেটা মুদি দোকান থেকে চোরা দরে ছেড়ে দেয়।

প্রণব একটু বেশি রাত্রে বাড়ি ফেরে। মণির কাছে সে রশৌনার খবর শোনে, প্রতিদানে তার খবরটা সে কিন্তু বিশেষ করে মণিকে শোনায় না, খোলা ছাদে রাত্রের আড্ডায় সকলকে শোনায়। বিকালের দিকে একটা মিলিটারি লরি একটি ছেলেকে চাপা দেওয়ায় রাস্তার লোকে লরিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে প্রণব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, লরিটা তখন পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখছিল, এই অপরাধে তাকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে।

যেখানে যে হাঙ্গামা হোক, তোমার কী সেখানেই যাওয়া চাই ঠাকুরপো ?

মণি একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তার জ্বালা হয়েছিল যে প্রণব এতক্ষণ তাকে এ কাহিনি শোনায়নি।

সাধ করে কী যাই !

পরদিন হাসপাতালে মনসুরকে দেখতে গিয়ে তার কাছে গিরীন যে অভ্যর্থনা পেল তা সত্যই চমকপ্রদ। দেখামাত্র মনসুর যেন তাকে কামড়ে দেবে। দু-মিনিটে যে গালাগালিটা সে দিল ঝাঁঝের তার তুলনা হয় না—কবি মানুষ, তাতে আবার নজরুলের ভক্ত, ভাষার তার জোর কত ! মনসুরের কাছে এ সব শুনে বাড়ি বয়ে গিয়ে রশৌনা যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব খারিজ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসবে সেটা এখন আর গিরীনের কাছে খাপছাড়া মনে হয় না। বিদায় হবার সময় তবু স্বভাবতই তার চোখে জল এসেছিল।

ডাক্তার ইশারা করে। গিরীন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

আহত অসুস্থ মানুষ, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় যে চড়া জ্বর চলছে। সাময়িকভাবে তার মাথাটা যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে কারও কিছু বলার নেই। এটা নিছক ব্যারাম, ভ্রান্তি,—বিকার। সারা ভারতের স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমানের অবিশ্বাস ও হিংসা কি এই রকম মিথ্যা ভ্রান্তির বিকার নয় ? গিরীনেরা শুকনো মুখে আলোচনা করে। ষোলোই আগস্টের সংগ্রাম-ঘোষণার কৈফিয়ত তাই। নেতাদের কৈফিয়ত অবশ্য, কিন্তু নেতা কি আকাশে ঝুলে থাকে, জনতার মাথাই সব নেতার পা দিয়ে দাঁড়াবার একমাত্র আশ্রয়, আত্মীয় নেতা ছাড়া। যে নেতা জনতার আত্মীয় সে শুধু সামনে এগিয়ে থাকে, মাটিতেই দাঁড়ায়। উপরে তাকিয়ে থেকে থেকে এতই কি ঊর্ধ্ব-সর্বস্ব হয়েছে এ দেশের মানুষ যে মাথায় চাপা নেতাদের কথার ঘায়েই মাথা খারাপ হয়ে যায় ? অথবা মনসুরকে ধরে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার অতিশয় পার্থিব, অত্যন্ত বাস্তব সংঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে আছে ? হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের আল্লার মতো সর্বশক্তিমান তো ইংরেজ নয়, তাদেরও নিজেদের গড আছে। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির যতই কৌশল জানা থাক, ইংরেজেরও সাধ্য কি ভিত্তি ছাড়া ভেদ-সৃষ্টির এমন ভেল্‌কি দেখায়, কোটি কোটি হৃদয়ের শাণিত অভিশাপ থেকে গা বাঁচিয়ে ওই কোটিদেরই পরস্পরের গলা কাটতে নিযুক্ত করে ?

সে ভিত্তিও কি ইংরেজের তৈরি ? একা ইংরেজের ?

'দাঙ্গার ভিত্তি' নাম দিয়ে গিরীন সেদিন সম্পাদকীয় লেখে, পুরো দু-কলমের মতো। ভাষা এমন জোরালো হয় যেন কালির হরফে প্রাণটা তার কথা কইছে। পড়তে পড়তে প্রধান সম্পাদক প্রবীণ সত্যহরি বারবার আত্মবিস্মৃত হয়ে মাথা চুলকোতে যায়, বারবার মসৃণ তেলালু টাকে আঙুল পিছলে গিয়ে তার বিরক্তির সীমা থাকে না।

এটা কী লিখেছ গিরীন ?

কোনটা ?

আগাগোড়া সবটা। ধর্মকে এভাবে গাল দেবার কোনো মানে হয় ?

ধর্ম নয়, ধর্মপ্রবণতাকে। জগতে ধর্মের পাট অনেক কাল চুকে গেছে, পাঁক সার হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস আজ তাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে দেশে যত বেশি জিইয়ে রাখা হয়েছে সে দেশের আজ তত বেশি সর্বনাশ—

আহা, এ সব তো লিখেইছ, পড়লাম। কিন্তু ধর্ম কাকে বলে তুমি যে তাই জানো না গিরীন। ধর্মের নামে অধর্ম চললে সেটা কি ধর্মের দোষ ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ সব রইল, ধর্ম শেষ হয়ে গেল ? ধর্মভ্রষ্ট হয়েছি বলেই আমাদের এত দুর্দশা। তুমি লিখেছ উলটোটা, ধর্মের জন্যই যেন যত ফ্যাসাদ।

ধর্মের নামেই তো চলছে সব। রাজনীতি, হত্যা, জাল-জুয়াচুরি—

আহা, কথাটাই তো তাই ! ধর্মের নামে এ সব চলছে মানেই তো মানুষ ধর্ম মানছে না, অধর্মের রাজত্ব চলছে। গান্ধীজির অহিংস নীতি শুধু রাজনীতি হলে কি এমন ফ্যাসাদ হত না আমরা এমন ফাঁদে পড়ে কোঁকোঁ করতাম ? উনি নিলেন ধর্মের অহিংসা, তাকে করলেন রাজনীতির কৌশল। এটা অধর্ম, তার ফলও ফলছে। তুমি বরং এটা একটু ঘুরিয়ে লেখো গিরীন, ধর্মভ্রষ্ট হলে জাতির কী অবস্থা হয়। এমনি বেশ হয়েছে লেখাটা কিন্তু—

ধর্ম কী বলুন তবে। কীসের থেকে ভ্রষ্ট হওয়ায় লোকে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে ? কেন ভ্রষ্ট হয়েছে তাও বলুন।

ধর্ম কী বুঝে এডিটোরিয়াল লিখতে হলেই হয়েছে ! সত্যহরি একটু হাসে।

সত্যহরির হাসিটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গিরীন নাছোড়বান্দার মতো বলে, ধর্ম বুঝতে চাই না সত্যহরিদা, ধর্ম সম্পর্কে একটা ধাঁধা মিটলেই আমার চলে যাবে। ধর্ম আছে বলছেন, ধর্ম যদি আছেই তবে মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে কীসের থেকে ? মানুষ যদি ধর্ম ছেড়েই থাকে, ধর্মটা তবে রইল কোথায় ? মানুষকে বাদ দিয়েও ধর্ম বেঁচে থাকে ? তা যদি বলেন, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জল-স্থল-আকাশ-জীবজন্তুর ধর্মকে ধর্মের নামে মানুষের হানাহানির মধ্যে টানি কী করে ?

সত্যহরি মিছেই সম্পাদকত্ব করে প্রবীণ হয়নি, ধাঁ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে স্মিতমুখে সকৌতুকে বলে, তাহলে ওভাবেই ঘুরিয়ে লেখো না যে দেশে ধর্ম নেই। ধর্ম নেই বলেই মানুষ পশু হয়ে গেছে !

এবার গিরীন ক্লিষ্টভাবে একটু হাসে, এটা ছাপবার জন্য নয় সত্যহরিদা, এমনি লিখেছি। গায়ের জ্বালায়।

লেখা স্লিপগুলি ছিঁড়ে গিরীন টুকরিতে ফেলে দেয়, সত্যহরি মাথা নেড়ে-নেড়ে বলে, উঁহুঁ, ওটা মিছে বললে ভাই। প্রাণের কথাই লিখেছ, ছাপবার সাধ নিয়েই লিখেছ। তবে সাংবাদিক বটে তো, এও তুমি বেশ জানো, প্রাণের কথা স্বাধীনভাবে ছাপবার সাধ প্রাণেই থাকে ! এই আপশোশে মাথায় আমার টাক পড়ে গেল ভাই !

সত্যহরির মুখে মুচকি হাসি।

একই নিশ্বাসে সত্যহরি জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, ওই যে লিখেছ ওয়াহাবি রাখিবন্ধন খিলাফৎ চরকা হরিজন সব কিছুর উৎস স্বাধীনতার কামনা, কিন্তু বাধ্য হয়ে ধর্মের আবরণ নিতে হওয়ায় ভেস্তে গেছে। আসলে ওটা তুমি কী বলতে চেয়েছ গিরীন ?

বলতে চেয়েছি, আমাদের ধর্মপ্রবণতা বাঁচিয়ে রেখে, মধ্যযুগে ঠেলে রেখে, শুধু এই একটা চালে ইংরেজ আমাদের—

ওঃ ! বুঝেছি, বুঝেছি।

গিরীন চটে বলে, না, আপনি বোঝেননি। আপনারা বোঝেন না। স্কুলে-স্কুলে ইতিহাস কেন শেখায় বন্দুকের টোটা কামড়ালে গো-মাতাকে কামড়াতে হয় বলে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল, আপনারা তা বোঝেন না। বরং গর্ব অনুভব করেন ! এই যে নৌ-বিদ্রোহ হল, যে জন্য রাতারাতি মন্ত্রী মিশন এলেন, এটা একশো-দেড়শোবছর আগে ঘটলে আমরা স্কুলের ইতিহাসের টেক্সট বুকে পড়তাম : যদিও জাহাজে ছাগলের মাংসই দেওয়া হইত তথাপি দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীরা গুজব রটায় যে গোরু ও শূকরের মাংস খাওয়ানো হইয়াছে, তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নৌসেনারা বিদ্রোহ করে। পড়ে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠত। আর যাই হোক, আমাদের নৌসেনারা ধর্মের অপমান সহ্য করেনি, গোরু-শূকরের মাংস খাওয়ানোর প্রতিবাদে বিদ্রোহ করেছে। কী মহান এই দেশ ! কত প্রাচীন এই দেশের সভ্যতা !

বাস্ রে বাস্ ! একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি একেবারে বক্তৃতা দিয়ে বসলে ! এত ফাঁকিবাজি আর সয় না।

সত্যহরি ঘণ্টা বাঁজায়। উমেশ এলে বলে, দুকাপ চা আন তো বাবা। চললি যে ? শোন।

হাফপ্যান্ট শার্ট-পরা বেঁটে জোয়ান একুশ বছরের উমেশ ঝকঝকে দাঁত বাব করে হাসে, বলে, চা আনুম। আর কী আনুম কন ?

তিন

ট্রাম চালু আছে, বাসও এলোমেলোভাবে চলে। কোনো সেকশানে হাঙ্গামার ফলে একবেলার জন্য বা দু-একদিনের জন্য ট্রাম বন্ধ থাকে, আবার সে লাইনে ড্রাইভার ট্রাম চালায়, কন্ডাক্টর টিকিট কাটে। কোনো কোনো সাংঘাতিক এলাকায় ট্রামে ড্রাইভারের পাশে রাইফেলধারী ইউনিফর্ম দেখা যায়, দৃশ্যটা হাস্যকর ঠেকে নগরবাসীর কাছে। অনেক মোড়েই রাইফেল ও ইউনিফর্মের, মিলিটারি ইউনিফর্মেরও ঘাঁটি বসেছে, রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে সশস্ত্র ট্রাক, নগরে তবু ছুরি-ছোরা অ্যাসিড-বোমার খুন-জখম, লুটপাট, আগুন দেওয়ার সমারোহ বেড়েই চলেছে। নিরাপত্তা কমছে, শঙ্কা বাড়ছে, অরাজকতার সীমা-পরিসীমা নেই। নগরবাসীর তিতো অভিজ্ঞতা তিতো হতে হতে হাস্যকর মনে হওয়ায় ঠেকেছে, আগুনে লাল হতে হতে লোহা চোখ-ঝলসানো শুভ্র দ্যুতিতে ঝলসে ওঠার মতো ক্রোধ আর ঘৃণার উত্তাপ বাড়তে বাড়তে যেমন উগ্র পরিহাস, উজ্জ্বল ঝকঝকে বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ হাসি হয়ে দাঁড়ায়।

দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে ! হায় রে তামাশা !

বয়সের ভারে নানি বাঁকা হয়ে গেছে, ঢিলে হয়ে চামড়া ঝুলে গেছে, মাথা-ভরা শনের নুড়ি, নগরের ফুটপাতে গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়, দেয়ালে সে ঘুঁটে থাবড়ে শুকিয়ে সেই ঘুঁটে বেচে সে বেঁচে আছে, সেও বার্ধক্যের হাসিহীন বিদ্রুপের ভাষায় বলে, যত ঢং তত সং। ঢং দেখে সং দেখে বুড়িয়ে গেলাম, আল্লার দোয়ায় এবার গেলে বাঁচি। বড়ো-বড়ো ঘুঁটে বাছা, মোটে মাটি নেই, ন-আনা শ দিবেন। আ লো নাতনি, তুই না দিলে কে দেবে বল ? তোর কাচ্চা মোরে দেখলে বলে, ইলেললায়লা নানি ! আহা, বেঁচে থাক।

সরস্বতী বলে, কী বলছিলে নানি ?

ততক্ষণে নীলিমা মণিরাও এসে দাঁড়িয়েছে। নানিকে পাড়ার সকলে ভালোবাসে। নানির উপযুক্ত একটা ছেলে আছে—পাঁচ-সাতবছর তাকেও পাড়ার প্রায় সব ঘরের মেয়েরা মুখ-চেনা চিনেছে এই জন্য যে, বিয়ে করে তিন-চারবছর ছেলেটা এই মাকে খেতে দেয় না। ছেলেটার বউটা সুন্দরী। মাঝে মাঝে রাস্তার কলে জল নিতে আসে, মাঝে মাঝে দোকানে সওদা করতে যায়। শান্ত সুশ্রী রং, ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, টিকলো নাকে নকল মুক্তার নাকছাবি !

নানি বলে, বলছিলাম, মোড়ে যে কামান নিয়ে গাঁড়া গেড়েছে, ও সব হল সং। রাজা-বাদশারা ঢং করে এমনি সং দিত, রানিও তাই দিয়েছে।

রানি ? রানি কে, কোন রানি ? সরস্বতীকে খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে হয়, রানি মানে কুইন ভিক্টোরিয়া। নানি কী আর জানে না দেশের এখন অন্য রাজা, মহারানির যুগ বহুকাল গত হয়েছে ? অত সে হাবা নয়, তাহলে এই মারাত্মক শহরে গোবর কুড়িয়ে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। আজ যিনি মহামান্য সম্রাট তাঁর নাম পর্যন্ত নানি জানে ! তবে আজও প্রথম বয়সের রাজশক্তির সেই প্রতীকটি মনে তার গাঁথা হয়ে আছে। শুধু প্রতীক, কিছু এসে যায় না। নানি এও

জানে যে টাকা-পয়সায় আঁকা মূর্তি বদল হয়েছে বলেই গরিবের দুঃখ-দুর্দশা বাড়েনি। গরিবানাই বেড়েছে মানুষের।

চলা-ফেরায় নানিও এখন খানিকটা সতর্ক হয়েছে, আগের মতো তাকে আর যখন তখন এদিকে দেখা যায় না। তার ছেলের সুন্দরী বউ এবং বস্তির আরও যে কয়েকটি অল্পবয়সি মেয়ে-বউ এই রাস্তার কলে আসত তারা বস্তির ছেঁড়া পর্দার আড়ালে লুকিয়েছে। বেশি বয়সের স্ত্রীলোকেরা সন্ত্রস্তভাবে আসে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে মাটির কলসি, তারে ঝোলানো টিন বা লোহার পাত্রে জল ভরে চলে যায়।

রসময়বাবুর মেজোছেলে গজেন কিছুদিন থেকে নানির ছেলের বউটির দিকে একটু নজর দিচ্ছিল, অন্য কোনো বাছবিচার করে নয়, বউটির ছিপছিপে সুন্দর চেহারার জন্যই।

বস্তির গরিব ঘরের সুন্দরী বউ বলেই বড়োলোকের ছেলের লোভ করা—তাও খুব ভয়ে ভয়ে, সাবধানে। বউটির নাম পরীবাণু, বাপের বাড়ি বরিশাল জেলায়। নানিও বরিশাল থেকেই অল্প বয়সে স্বামীর সঙ্গে প্রথম কলকাতা এসেছিল। পরীবাণুকে কেন, তার বাপ-মাকেও নানি চোখে দেখেনি, ছেলের বিয়ের সময় সে শুধু ভেবেছিল, ও বাড়িতে মেয়ে যদি থাকে সে খাপসুরত হবে। সেই ভাবনার ফলে পরীবাণু সায়েব-ফার্মের আপিসের দপ্তরি নাজিমের বউ হয়ে কলকাতার বস্তিতে এসেছে। এই ক-বছরে ওদিকে যুদ্ধ-মন্বন্তরের কল্যাণে পরীবাণুর বাপ-চাচারাও ভূমিহীন খেত-মজুরে পরিণত হয়েছে, চাষের সময়টা ছাড়া গাঁ ছেড়ে সদর শহরের বস্তিতে গিয়ে ডেরা বাঁধছে খেটে খেয়ে বাঁচবার জন্য।

তার দুঃখের কাহিনির অঙ্গ হিসাবেই নানি এ সব বিস্তারিত কাহিনি শোনায়। তার দুঃখের কিন্তু হদিস মেলে না দু-একটা অস্পষ্ট হা-হুতাশ ছাড়া। অন্যকে তারা অবস্থা বুঝে দুঃখটা অনুমান করে নেবার বরাত দিয়েই সে যেন খুশি।

তা পরীবাণু বাড়ির সামনের কলে আসে না বলে ডিম-মুরগি কেনার ছলে গজেন বুঝি দু-একবার বস্তিতে তাদের ঘরের দুয়ার পর্যন্ত আনাগোনা করেছিল। নাজিম বউ নিয়ে আরও উত্তরের বড়ো বস্তিটায় উঠে যাচ্ছে। এ বস্তিটা ছোটো, প্রায় চারিদিকেই হিন্দু। মীরবাগান বস্তিতে শুধু বস্তিবাসী গরিব মুসলমানের সংখ্যার ভরসাই পাবে না, সংলগ্ন অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী মুসলিমপাড়ার রক্ষণাবেক্ষণও মিলবে। গজেনের অবশ্য এটা নিছক চ্যাংড়ামি, প্রশ্রয় না পেলে এর বেশি এগোবার সাহস তার হবে না, সে সাধ্যও নেই। হিংসায় যতই বিষিয়ে থাক মানুষের মন, গজেন জানে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে বউটি জাতে মুসলমান বলেই পাড়ার লোকে তার অন্যায় বরদাস্ত করবে না, সে নিজের পাড়ার লোকের কাছেই ঠেঙানি খাবে। একটা ফিঁচকে ছোঁড়ার ফিচলেমির জন্য নাজিমের বস্তি ছেড়ে পালাবার দরকার ছিল না। এই কথাটা নীলিমা নানিকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হিন্দু বলে একটা বজ্জাত ছেলের ভয়ে একটি গরিব মুসলমান পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাবে এটা ভাবতেও তার গা-জ্বালা করছিল।

নানি সায় দেয়, বাঁকা পিঠ একটু সোজা করে শান্ত স্তিমিত চোখে তাকায়, বলে, নাতনি লো, ও ছোঁড়াটা করত কী ? মোর জোয়ান ছেলে কি ও ছোঁড়াটাকে ডরায় ?

যে ছেলে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না তার গর্বেই বুড়ি যেন লাঠির ভর ছেড়ে আরেকটু সিধে হয়ে দাঁড়ায়। না, ওই ভয় নাজিমের স্থানত্যাগের কারণ নয়, কথাটা অন্যরকম। সময় বড়ো খারাপ, মন মেজাজ বড়ো বিগড়ে আছে মানুষের, মাথাগুলি সব বেঠিক। আগে যা হত তুচ্ছ ব্যাপার, সামান্য হাঙ্গামা, দু-চারজনের বেশি লোকে টেরও পেত না কী ঘটেছে না ঘটেছে আজ হয়তো তাই থেকেই সাংঘাতিক কাণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে। কোন ব্যাপার কী দাঁড়াবে কে বলতে পারে ? নানি তো পারে না, নীলিমা কি পারে ? বুঝি নীলিমার ঠাকুর নানির আল্লাও পারে না ! তাই এই সাবধানতা। নয়তো

বজ্জাতের নজর গায়ে না মেখে বা তাদের চ্যাংড়ামির চেষ্টা না ঠেকিয়ে গরিব দুঃখী মেয়ে-বউয়ের দিন গুজরান হয় ?

তা ঠিক নানি। তুমি ঠিক বলেছ। সময়টা সত্যি খারাপ।

এ কথাটা নীলিমার খেয়াল হয়নি। চারিদিকে উদ্যত অসহিষ্ণু হয়ে আছে অন্ধকারের পশুশক্তি, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারকে অবলম্বন করে এ এলাকায় এত যত্নে বজায় রাখা শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। অতি সাবধান, অতি সতর্ক হওয়াই আজ দরকার। নানি পর্যন্ত এটা ঠিক ধরেছে ! নীলিমা বিস্ময়ের সঙ্গে নানির দিকে তাকায়।

কত না জানি বয়স হয়েছে নানির, কবরের শেষ সমাপ্তির আবেশ কতখানি না জানি অবসন্ন অবশ করে এনেছে তার মাথার ভিতরটা তবু সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তার বাস্তব বুদ্ধি আজও বিহ্বল হয়নি। কত সুস্থ সবল বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষের মতামত কত অল্পে গুলিয়ে যায়, জীবনে কখনও সহজ বিচার-বিবেচনা খোলে না—ঘুঁটে-বেচা নানির নিজস্ব স্পষ্ট মতামত আছে। হয়তো ঘুঁটে বেচে খায় বলে, এই বয়সেও খেটে খাওয়ার বিরাম হয়নি বলে। সংসারের মোটা নিয়ম মোটা কৌশল ভুলে গেলে এ লড়াই চালাবে কীসে ?

বেদম বেখাপ্পা লড়াই। রেশন কার্ড হাতেই ছিল, এ বাড়ির দরজায় সরস্বতীর কাছে ঘুঁটের দাম পেয়ে নানি যাদুগোপালের ওই রেশনখানার দোকানে ধন্না দেয়। মানুষ এ দোকানে লাইন দেয় না, কারণ যাদুগোপাল কার্ডগুলিকেই লাইন দেওয়ায়, কোনোদিন পাশাপাশি, কোনোদিন উপরে-নীচে সাজায়। এতে একটা সুবিধা আছে, কার্ড বেছে খাতিরের লোককে আগে বেশন দেওয়া চলে। কিউ দিয়ে দাঁড়ালে অতিশয় মানী ব্যক্তিরও লাইন ভেঙে আগে রেশন লেখানো মুশকিল হয়—সমস্ত লাইনটা হইহই করে ওঠে। কার্ড সাজিয়ে নিরপেক্ষভাবে আগে-পরের নিয়ম রাখাও যায়, খুশিমতো ভাঙাও যায়।

ভিড় থেকে হয়তো ক্রুদ্ধ মন্তব্য আসে : আমরা ওর আগে এসেছি মশাই !

যাদুগোপাল জবাব দেয় : উনি আগে কার্ড জমা দিয়ে গিয়েছিলেন দাদা !

লাইনের অভাবে নিয়মভঙ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় রাগ চেপে ভিড়ের মানুষটিকে চুপ করে যেতে হয়। যাদুগোপাল এবং তার রসিদ লেখা কলমচিটি গ্রাহ্যও করে না। দু-একজন সাধারণ মানুষের রাগ বিরক্তি প্রতিবাদ অতি তুচ্ছ। সাধারণভাবেই সমস্ত ভিড়টা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত—আজকাল ভিড় মানেই তাই, যেখানেই দশটা লোক জমা হবে সেখানেই উষ্ণ নিশ্বাস ! বাজে কোনো লোক যদি বেশি গোলমাল করে, যদি দাবি করে যে কে কবে কার্ড জমা দিয়ে হাওয়া খেতে গেছে তা তারা জানে না, আগে-পরে যেমন যেমন মানুষ এসে দাঁড়িয়ে আছে সেই নিয়মে রেশন দিতে হবে—তাকে চিনে রাখে যাদুগোপাল। সেই বিদ্রোহী বাজে লোকটিকে !

সে বেচারার পালা এলে কার্ডে তার কত যে খুঁত বার হয়—সে আটা না ভাতখোর সে ছাপ পড়েনি, ভাঁজ করে রেখে রেখে কার্ড ছিঁড়ে সিগারেট প্যাকেটের স্বচ্ছ মোড়কের কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে নম্বর পড়তে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, এখানে সই বা টিপসই পড়েনি, ওখানে হপ্তার নম্বর ঠিকমতো কাটা হয়নি ! অথবা সোজাসুজি : রেজিস্ট্রি খাতার সঙ্গে কার্ড মিলিয়ে দেখতে হবে, দেরি হবে রেশন পেতে !

হয়রান করার আরও আইনসঙ্গত উপায় আছে। জিনিসের মোট দাম হয়েছে এক টাকা তেরো আনা এক পয়সা। সে হয়তো একটা দু-টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়।

গম্ভীর মুখে বলা হয়, চেঞ্জ নেই। খুচরো পয়সা আনো।

নোট ভাঙিয়ে সে চেঞ্জ আনতে যায়। যে নিয়মভঙ্গের জন্য সে গোলমাল করেছিল সেই নিয়ম অনুসারেই দোকান থেকে চলে যাবার জন্য তার পালা পড়ে উপস্থিত সবার শেষে।

তুমিই তো বললে বাবা দোকান ছেড়ে গেলে চলবে না, যেমন আসবে তেমনি পাবে ! তুমিই এখন উলটো গাইছ ?

বস্তিবাসীর সঙ্গে গা-ঘেঁষে চাকুরে বাবুরাও দাঁড়িয়েছে, কয়েকজন ভদ্রমহিলাকেও দেখা যায়। আগে হয়তো কারও কারও চাকর বামুনেই বাজার-হাট করত, থলি হাতে আজ নিজেকেই আসরে নামতে হয়েছে—উঁচু থেকে পতনের ধাক্কা এ সব উঁচ্-তাকানেদেরই লেগেছে বেশি। এবাই একটু গা বাঁচিয়ে চলে, একটু সম্মান-সুবিধা খোঁজে যাদুগোপালের কাছে। আবদার করে !

রাজেনবাবু বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি পেলে হত, আরেকটা জরুরি কাজ সেরে আপিস যেতে হবে।

কী করি বলুন।

আহা, সবাইকে বলে-কয়েই নিচ্ছি। বলে-কয়ে আমি আগে নিলে কেউ আপত্তি করবে না। আপিস আছে—

ভূষণ বলে, সবাই কাজে যাবে বাবু। আপিস সবারই আছে।

রুক্ষ চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, বোতামহীন ছেঁড়া শার্ট, খালি পা—ভূষণেরও নাকি আপিস আছে ! সবার মনের কথাই সে মুখ ফুটে বলেছে, সকলের নিঃশব্দ সমর্থন মুখের নির্বিকার কঠোর ভাবে ফুটে থাকে। কী বলেছে ভূষণ, কীসে এমন নিষ্ঠুরভাবে সায় দিয়েছে দশজনে ? ভূষণ বলেছে ভাঁধা কথা, সবাই যাব মানে বুঝেছে : ও অমায়িক মধুর বচনে আর চিঁড়ে ভেজে না গো ! সকলে মুখের ভাবে তিরস্কার জানিয়েছে : কতকাল চুকেবুকে মাঠে মারা গেছে, আবার এ সব ভাঁওতা কেন ? তুমি কে যে তোমার তাগিদ সবার চেয়ে এত বেশি, মিষ্টি কথায় অনুমতি চাইছ জানিয়ে দিলেই সেই খাতিরে আমরা গলে যাব !

কিন্তু নানির কথা ভিন্ন।

সে অন্যভাবে দাবি জানায় এবং সবাই হাসিমুখে তার দাবি মেনে নেয়। ভিড়ের ফাঁক খুঁজে গলিয়ে ভিতরের দিকে যেতে যেতে নানি একটানা বুকনি শুরু করে চাল আটা মেপে কাপড়ে বেঁধে বিদায় হওয়ার আগে আর থামে না। তাব অর্ধেক কথা সকলের সঙ্গে, অর্ধেক আপনমনে এলোমেলো কথা।—নাতনিরা সব ভালো আছে ? আহা হা, বড়ো কষ্ট ভালো থাকা, কোনোদিকে কিছু ঠিক নাই, সব গন্ডগোল। আল্লায় নেয় না, গিয়াও তোমাগো মধ্যে খুঁটি গাইড়া আছি, তোমাগো ভালোই আমাব ভালো, আমার আবার ভালোমন্দ কী !—

রেশন নেবে নাকি নানি ?

হ, পোড়া পেট মানে না। নিজের রেশন নিজেই নিমু, নিজেই রাধুম পোড়া পেটের সেবা করুম।

নাও, তুমি আগে নাও।

এই থুরথুরে নড়বড়ে বুড়ি নিজের চেষ্টায় বেঁচে আছে আজকের দিনে এ যেন সকলের আনন্দ, সকলের গৌবব ! শহরের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মরণের বজ্র আঁটুনির ফস্কা গিরো যেন এই বুড়ি, শুধু টিকে থেকে একাই সে যেন ফাঁস করে দিচ্ছে মরণের বিরাট ষড়যন্ত্রের আসল ফাঁকি ! ইংরেজ-লিগ-কংগ্রেস-চোরাবাজার-গুন্ডা সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে চিরজীবী মানুষের এই গত শতকের লোলা চামড়া বাঁকা পিঠ সোনালি পাটের মুকুট-পরা কনেটি দিব্যি টিকে আছে। বস্তির দিদিমা, কেরানিপাড়ার দিদিমা, যারা খেটে খায় তাদের খাটুনে ঘুঁটে-কুড়োনি দিদিমা। কে হিন্দু, কে মুসলমান !

নানির ক-ছটাক আটা চাল ওজন হতে হতে সিল্কের অত্যধিক লম্বা বেখাপ্পা পাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় বয়সি জমকালো একটা মানুষ আসে। এককালে শক্ত জোরালো মানানসই চেহারা ছিল, এখন একটু নরম হয়ে মুটিয়ে যাওয়ায় বেঁটে-খেটে দেখায়, ছটাক মাপা আটা চাল তিন টাকা সের মাছ-মাংসের

যুগে শহরের রাজপথে ছড়ি হাতে ছোটোলোক জমিদারি সাজপোশাক চেহারা ও চালচলনে গুন্ডা মনে হয়। চুলের টেরি থেকে পায়ের পাম্প-শু পর্যন্ত শান্ত সমাহিত ভাবটাই সেকেলে রাজশাহি বাদশাহি প্রশান্ত উদার অত্যাচারের উগ্র হিংসাত্মক নকল। লোকটি সত্যই রাজা এবং তার প্রতাপও প্রচণ্ড—সে শহরের এই অঞ্চলের খ্যাতনামা গুন্ডারাজ সুবোধকুমার সিংহ।

যাদুগোপাল, আজ আটা চাই যে ?

পাবেন। কার্ডগুলো পাঠিয়ে দেবেন।

সুবোধ সিংহ একা মানুষ, তার বিয়ে-করা বউও নেই, আইনসঙ্গত বাচ্চা-কাচ্চাও নেই। কিন্তু তার তেত্রিশখানা রেশন কার্ড ! সাথী-অনুগতদের সে একশোর উপর বাড়তি কার্ড বিতরণ করেছে। প্রত্যেকটি কার্ড রেজেস্ট্রি করা।

সবাই চুপ কবে থাকে, কেউ আড়চোখে তাকায়। সুবোধ একটা সিগারেট ধরায় আমেরিকান সিগারেট লাইটার থেকে। এভাবে রেশনশপে সে আসে না, আসার কোনো মানেও নেই। এ যেন কোনো উচ্চপদস্থ মিলিটারি, পুলিশ কর্মচারী বা কোনো মন্ত্রীর পায়ে হেঁটে রেশনের দোকানে খামখেয়ালি আগমন।

গজেন বলে, কেমন আছেন সুবোধবাবু ?

আছি। চলে যাচ্ছে।

ন্যাকড়ায় বাঁধতে গিয়ে নানির কিছু আটা পড়ে গিয়েছিল, তুলে লাভ নেই, সঙ্গে ধুলোবালিও উঠবে। নানি আপনমনে বলে, যাক, যাক। কাউযা খাইবো, পিপড়া খাইবো !

মুখ তুলে সুবোধকে বলে, কেমন আছ ?

সুবোধ বলে, আছি ভালো।

ভালোই আছ ? আল্লা !

সিগারেটে জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সুবোধ বলে, তোমার ছেলের বউ নাকি ভেগেছে নানি ? কার সঙ্গে ভাগল ?

কী নিষ্ঠুর, কী কদর্য রসিকতা !

বউ ? বউ বড়ো ভালো।—নানি কখনও খাঁটি বরিশালি, কখনও খাঁটি কলকাতাই, কখনও মেশাল ভাষায় কথা কয়। এখন তার সুর টান কথা সব কলকাতায়।—ওটা কী কথা বলছ ? তুমি আমার নাতি, আমার ছেলের বউ তোমার মা। তোমার মা ভাগবে কেন, কার সঙ্গে ভাগবে ?

কয়েকজন হেসে ওঠে।

সুবোধ ছড়ি ঘুরিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়। মুখ ফিবিয়ে একবার তাকিয়েও যায় না। বাজে গুন্ডা হলে হয়তো বিব্রত বোধ করত, চটে উঠত, মুখে কিছু না বললেও অন্তত ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শাসিয়ে যেত। অথবা হয়তো নিজেও হেসে উঠে হালকা করে দিত অপমানটা। কিন্তু সুবোধ রাজা, বড়ো বড়ো লোক তাকে খাতির করে, গভর্নমেন্ট তাকে ভুলেও ছোঁয় না। উপযুক্ত গুণ ছাড়া এ পদমর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। বেকুফ বনলেও আরও বেকুফ বনার লোভ সে সামলাতে পারে।

ভূষণ তারিফ করে বলে, বেশ বলেছ নানি, ঠিক বলেছ !

জোর গলায় বলে—যেতে যেতে সুবোধও যাতে শুনতে পায়।

পয়সা দিয়ে ছটাক মাপা খাদ্য নিয়ে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে একে একে বিদায় নেয় ক্ষুণ্ণ ক্ষুধার্ত মেয়ে-পুরুষ। নটা বাজে, আপিসে কাজ অপেক্ষা করে আছে, জরুরি কাজ, সম্পন্ন করতেই হবে। ভোরে যে কারখানার কাজ চালু হয়েছে ভোরেই সেখানে চলে গেছে কাজ করার মানুষ, ধর্মঘট লকআউটে বন্ধ কারখানাগুলি ছাড়া। কোনো কোনো আপিস, কোনো কোনো কারখানা দশটায়, এগারোটায় খোলে। সাবান, লজেন্স, পাউডার মাইকা, হ্যান্ডমেড পেপারের ছুটকো কারখানা,

টাইম-শিফ্‌টের নিয়মকানুন এড়াবার এই কৌশল খাটায়। কাজ আরম্ভ করতে দশটা-এগারোটা বাজায়, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত এক শিফ্‌টে কাজ চলে ! ওভারটাইমের বালাই নেই।

এগাবোটা নাগাদ দোকান ফাঁকা হযে যায যাদুগোপালের। তেল নুন ডাল মশলার খদ্দের দু-চারজন আসে যায়। টুনটুন ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা চলে, বড়ো রাস্তায় মাঝে মাঝে ট্রামের আওয়াজ শোনা যায়। ধর্মঘটের সময় ট্রামের লাইনে মর্চে ধরেছিল, ধুলোবালি আবর্জনায় প্রায় বুজে গিয়েছিল ইস্পাতের খাদ। ট্রামের চাকা যখন বন্ধ ছিল তখন বন্ধই ছিল। আবার যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন চলতেই থাকবে।

দিগন্ত কাঁপিয়ে মিলিটারি ট্রাক যায। দোকানেব সামনে দিযে ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশা গেলেও খানিকক্ষণ যেন নূপুর-ধ্বনির মতো সেই মধুর টুংটাং শব্দ কানেই পশে না।

বেশনের দোকান থেকে কেউ যায় বাজারে, কেউ যায বাড়ি। বাজারে দু-চাবজনমাত্র যায়, নানির মতো যাদের আপিস নেই বা ভূষণের মতো যাদের রেশন নেওয়া বাজার করাই কাজের অঙ্গ বা গজেনের মতো যারা বেকাব। আপিসগামী লোক সকাল সকাল বাজার না সেরে রেশন দোকানে ধন্না দেওয়ার ফাঁদে ধরা দেয় না—রেশন মেলাব পব আর কোনোদিকে দৃকপাতের অবসর থাকে না। ঘড়িব কাঁটা যেন বুকেব কাঁটা হয়ে বিঁধে বিঁধে চলে।

বাজারে দু-পযসার পুঁই কেনে নানি, ছ-পয়সার এক ছটাক কুঁচো চিংড়ি। কুঁচো চিংড়ি, একটু গন্ধ ছেড়েছে, তারও দেড় টাকা সের। বাস্, ওতেই নানিব বাজার খতম। ঘরে দুটো পেঁয়াজ আছে, শিশিতে একটু তেল আছে, ভাঁড়ে নুন আছে, একরত্তি উনানে কাঠির মতো সবু করে চেরা কাঠ জ্বেলে নানি অন্ন প্রস্তুত করবে। আজকের দিনটিতেও নানির অন্ন জুটল !

উলঙ্গ ছেলেমেযেরা বস্তিব নোংরা মাটি-আবর্জনার সঙ্গে সর্বাঙ্গের মিতালি করে খেলা করছে। জল আনাব যুদ্ধ শেষ হওয়ায় মেয়েরা এখন ঘবেব কাজে মন দিয়েছে—

আল্লা ! নানিব জল তোলা হয়নি ! ঘবে একফোঁটা জল নেই। চোখ দুটি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসে, মাথা নেড়ে নেড়ে নানি নিজের চিন্তায় সায় দেয। হুঁ, বড়ো বাস্তার টিউবওযেল থেকে গিযে জল আনতে হবে। জল তোলা বাকি পড়েছে, জল আনতে হবেই।

বেশন আনা নিয়েই মণির সঙ্গে নীলিমার কলহ হযে গেছে। গতরাত্রেই চাল-আটা সব ফুরিযেছে। বাত জেগে মণি শুয়ে ভেবেছে যে পরদিন সকালে কী উপায় হবে, বাড়ির এতগুলি মানুষ কী খাবে।

তুমি কেমন মানুষ গো নিশ্চিন্তি মনে নাক ডাকাচ্ছো ?

সুশীল চমকে জেগে বলেছে, কী হল ?

কী হল ? আমায় বলে দিতে হবে, কী হল ? অন্যের ঘাড়ে এসে চেপে দিব্যি ঝিমুচ্ছো ঘুমুচ্ছো, কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। তুমি কী গো ! আমার মরণ হয় না !

সুশীল ভয়ে ভয়ে বলে, কী করতে হবে না বললে—

বলে দিতে হবে কেন ? তোমার খেয়াল হয় না ?

অগত্যা সুশীলকে এবার চুপ করে গিয়ে আসল কথার জন্য অপেক্ষা করতে হয। রাতদুপুরে শুধু ঝগড়া করার জন্যই মণি নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙিয়ে ঝগড়া শুরু করেনি।

মণি কখনও অকারণে কলহ করে না বা মিষ্টিকথা বলে না, শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়। সে জন্য ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। বড়ো রকম অন্যায়ের জন্য মণি বকতে শুরু করেছে ভেবে সে গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিল !

এবার উঠে বসে একটা সিগারেট ধরায়।

তখন মণি সুর পালটে আসল কথা বলে।

যতীনবাবুর সঙ্গে না তোমার আলাপ আছে ?

ক্লাসফ্রেন্ড ছিল এককালে, এই আর কী !

কাল ভোরে উঠে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে চালের জোগাড় করবে। শুধু অন্যের ঘাড়ে খেয়ে নাক ডাকালেই চলবে না। আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব বলে রাখলাম !

আবছা আবছা রাত থাকতে মণি সুশীলকে ঠেলে তুলে দেয়, রাত্রে সে ভালো করে ঘুমিয়েছে কিনা সন্দেহ জাগে। জামা পরে সুশীল পাড়ায় সরকারি পার্কটার দক্ষিণে প্রায় পার্কের মতোই বাগানওলা যতীন চক্রবর্তীর বাড়ির সদর গেটে হাজির হয়। সেই কবে যতীন তার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল, সে প্রায় ঐতিহাসিক ব্যাপার ! মণির তাগাদায় সে মাঝে মাঝে এক রকম গায়ের জোরে যতীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা মাঝে মাঝে করেছে, যতীন কোনোদিন তাতে খুশি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আবার সেই যতীনের দরজাতেই তাকে মাথা খুঁড়তে হবে—মণির হুকুমে !

বাগানের গেটে তালা চাবি নেই, হুড়কোও নেই ! স্পর্শ করতেই লোহার তৈলাক্ত গেট নিঃশব্দে খুলে যায়। বাগানে অবশ্য লাউ-কুমড়া-ঝিঙা-বেগুনের চিহ্নও নেই, শুধু মরশুমি বিলাতি ফুল। ফুল নিয়ে চোর কী করবে, লোহার গেট খুলে রাখলেও তাই এ বাগানে চোর ঢোকে না। তবু, দারোয়ান অবশ্যই আছে, দুজন।

বাড়ির দরজার সামনে নুড়ি-বিছানো ছোট্টো পথ, দুপাশে দুটি লোহার বেঞ্চি। একটা বেঞ্চিতে বসে মন খারাপ করে সুশীল নানাকথা ভাবে, মাঝে মাঝে হাই তোলে। মণি যাই বলুক, যতীন তার যতই এককালের ক্লাসফ্রেন্ড হোক, চারিদিকে আলো হয়ে রোদ ওঠার আগে যতীনের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার সাহস তার নেই। যতীন বিরক্ত হবে।

বসে বসে সুশীল ভাবে, শেলির কবিতা যেভাবে পড়িয়ে আসছে এগারো বছর, তার চেয়ে একটু অন্যভাবে পড়ানো যায় না এবার ? ইংরেজ কবি ছাড়া জগতে কি আর কবি জন্মায়নি ? ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক বলে কি তাকে শুধু ইংরেজ কবিদের কাব্য আর জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করেই জীবন কাটাতে হবে ? ভোরে চালের সন্ধানে বেরিয়ে বন্ধুর বাড়ির সামনে লনে লোহার বেঞ্চে বসে এই কথা ভাবে সুশীল, কবিতা পড়াবার ব্যাপারেও এগারো বছর একটানা দাসত্ব করার কথা ! তীব্র ক্ষোভে চোখের সামনে সুন্দর ফুলগুলিও দেখতে পায় না। এ কী অসময়ে মনের অর্থহীন অবাধ্যতা ? আসলে সময় অসময় নেই, মন খারাপ হলেই ক্ষোভে দুঃখে মনের কাঁটা-বনে গড়িয়ে গড়িয়ে এইখানে এসে ঠেকে সুশীল—ইংরেজ কবিদের চিবিয়ে চিবিয়ে নিজে সে আখের ছোবড়ার মতো কাঠ-কাঠ হয়ে গেছে। ছেলেরা কত রস পায়, তার শুধু দাঁতের কনকনানি।

অনেক বেলায় যতীনের সঙ্গে তার দেখা হয়। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, চেনা মানুষ, তবু এবার যতীন প্রথমে তাকে চিনতেই পারে না, পরিচয় দেবার পর বড়োই যেন আশ্চর্য হয়ে বলে, ও !

তারপর বলে, কী খবর ?

এমনি দেখা করতে এলাম।

যতীন হাসে। এ জগতে কেউ যেন এমনি দেখা করতে আসে তার সঙ্গে, কোনো স্বার্থ ছাড়াই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না যতীনের, স্বার্থের জন্য কাজ করায় মানুষকে সে মন্দ ভাবে না, জগতের সঙ্গে তার নিজেরও স্বার্থ নিয়েই কারবার। এখন কী করছ ?—এ প্রশ্নের জবাবে সুশীল বিখ্যাত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শুনে বরং একটু শ্রদ্ধাই যেন তার জাগে, কারণ এই পরিচয়টা শোনার পরেই সে তার জন্য চা আনতে বলে।

আগে সুশীল কয়েকবার এসেছে, তার পাঁচ-সাতমিনিট সময় নষ্ট করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সত্যই সে জানত না সুশীল ইংরেজির নামকরা অধ্যাপক !

একবার কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাজকর্ম কী কর ?

নিজেকে তুচ্ছ করার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সুশীল বিনয় করে বলেছিল, কী আর করব, মাস্টারি করি।

সেই থেকে যতীনের ধারণা ছিল, সে কোনো স্কুলের মাস্টারজাতীয় তুচ্ছ একটা জীব। সেদিন বিনয়টা না করলে পবে কয়েকবার সোজাসুজি অবজ্ঞা আব অপমানের বদলে একটু খাতির আর এককাপ চা অন্তত সুশীলের ভাগ্যে জুটত !

সুশীলের প্রয়োজন শুনে যতীন একটু আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে কেউ মন-দুই চালের ব্যবস্থার জন্য দরবার করতে আসতে পারে ভেবে তাব আমোদের সীমা থাকে না, এ যেন এক ঘটি জলের জন্য সমুদ্রে গমন ! সে তবু ছোটোখাটো ব্যক্তি, কেউ যদি সত্যিই এ রকম দুমুঠো চালের অনুরোধ নিয়ে স্বয়ং ফারুখসানির কাছে হাজিব হয় ? ব্যাপারটা কল্পনা করার চেষ্টাতেই যতীনের হাসি আসে। বাশি রাশি ধানচাল নিয়ে লীলাখেলায় মশগুল হয়ে থাকায় যতীনের খেয়াল থাকে না যে দু-মন কেন, দু-সের চালের জন্য এই শহরে কত লোক হন্যে হয়ে বেড়ায়, না পেয়ে উপোস পর্যন্ত দেয !

শুধু দু-মন ?

সুশীল খুশি ও কৃতার্থ হয়ে বলে, বেশি দিতে পারবে ? তাহলে তো ভালোই হয়। তিন মন দাও ?

বেশ মজা লাগছিল কিন্তু পুরানো দিনের বন্ধুব সঙ্গে মজা উপভোগেব সময় ছিল না। দেখা করার জন্য অনেক লোক অপেক্ষা করছে, কাজ ও দায়িত্ব কোনোটারই তার অন্ত নেই। মৃদু হেসে খবরের কাগজেব কোণটুকু ছিঁড়ে যতীন জড়ানো দুটি অক্ষরে নিজের নাম লেখে। মুখে একটা ঠিকানা এবং একজনের নাম বলে দেয়।

এখানে গেলেই চাল পাবে।

কখন যাব ?

যখন খুশি। রাত বাবোটায যেতে পার।

যতীন হাসে।

কত দাম পডবে ?

যতীন হেসে বলে, দাম ? দাম না দিলে মনটা খুঁতখুঁত করবে ? বেশ, বেশনের দরে দাম দিযো।

একখানা লরি-চলাব মতো চওড়া গলি, তার মধ্যে সেকেলে ধাঁচের বহু পুরানো একখানা বড়ো বাড়ি, যেরকম বাড়িতে বিশেষভাবে আড়াল করা অন্দরমহল থাকত। এতবড়ো দোতলা বাড়ির সদর দরজাটি কিন্তু অত্যন্ত ছোটো। নীচের তলায় সামনের ঘর আর উঠানে কেরোসিন কাঠের তক্তা আর সমাপ্ত ও অর্ধ-সমাপ্ত প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পুরানো দিনের কোনো সম্ভ্রান্ত ধনীর বাড়ির নীচের তলায় প্যাকিং কেসের কারখানা হয়েছে—একদিন যেখানে ঝাড়লণ্ঠন-ফরাশের শোভায় আত্মীয়বন্ধু আশ্রিত মানুষ ও চাকর-দারোয়ানের সমাবেশে জীবনের সমারোহ চলত।

কাকে চান ?

যতীনের বলে দেওয়া নাম বলতেই পাশে অনঙ্গভূষণের পার্টিশান-করা ছোটো অফিসঘরে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরানো জং-ধরা কালচে-মারা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর খানকয়েক

তেমনি পুরানো মোটা কাঠের চেয়ার নিয়ে অফিস। মিলিটারি প্যাটার্নের খাকি ট্রাউজার ও বুশ-শার্ট পরা বছর ত্রিশ বয়সের স্মার্ট চেহারা অনঙ্গকে এই পরিবেশে বড়োই খাপছাড়া দেখায়।

সুশীলকে অনঙ্গ খাতির করে বসায়। যতীনের ইনিশিয়াল করা ডাকটিকিটের মতো কাগজের টুকরোটি দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকায়। কিন্তু ও বিষয়ে কিছু বলে না। দিন-কাল, কংগ্রেস-লিগ সংঘর্ষ, মন্ত্রী মিশন, নোয়াখালি, কলকাতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে আলাপ করে। এই সবই আজকাল এ রকম চলতি ভদ্রতা রাখার ও সাধারণ আলাপ-আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যত্র ও সর্বত্র এ সব বিষয়েও অবশ্য আলোচনা চলে তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাল-ডাল আটা-ময়দা তেল-নুন চিনি-কাপড় ও বেতন-মজুরির আলোচনাই প্রধান।

খানিক কথা চালিয়ে অনঙ্গ চুপ করে এবং অন্যমনস্ক হয়। অর্থাৎ এবার সুশীলের আসল কথা বলার পালা।

কিছু চালের জন্য এসেছিলাম।

অনঙ্গ মৃদু হেসে বলে, তা জানি। কত চাই ?

যতীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে অন্যায় ও অতিরিক্ত দাবি করেছে এইভাবে কাঁচুমাচু করে সুশীল বলে, যতীন বললে মন তিনেক পাওয়া যাবে।

অনঙ্গ থ বনে হাঁ করে চেয়ে থাকে। যতীনের চেযেও সে যেন বেশি আশ্চর্য হয়ে গেছে তিন মন চালের অনুরোধ শুনে ! পরক্ষণে তার চোখে-মুখে ঘনিয়ে আসে সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। চালের কারবারের শত্রুপক্ষের চর নয়তো লোকটা ?

একটু বসুন।

উপরে গিয়ে যতীনকে টেলিফোন করে মুখভরা কৌতুকের হাসি নিয়ে সে ফিরে আসে, বলে কীসে নেবেন চাল ?

সুশীল কিছুই আনেনি।

এ সমস্যার সমাধান অনঙ্গই করে দেয। একটা শতরঞ্চিতে চালগুলি এমন কায়দায় বেঁধে দেয় যে দেখে অবিকল বাঁধা বিছানার বান্ডিল মনে হয়। একটা রিকশাও সে-ই আনিয়ে দেয়।

বলে, গুড বাই !

থ্যাঙ্কস ! থ্যাঙ্কস !

এত কষ্টে জোগাড় করা চাল, দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য চাল, একেবারে প্রথম শ্রেণির সেরা তিন মন চাল ! স্বামী যেন অসম্ভব সম্ভব করেছে—গর্বে মণির বুক ফুলে ওঠে !

কিন্তু হায়রে এ বাড়ির মানুষের অদ্ভুত রীতিনীতি চালচলন, এ চাল পেয়েও যেন খুশি হল না বাড়ির লোক, কৃতজ্ঞ হল না মণির কাছে !

নীলিমা মুখভার করেই জিজ্ঞাসা করে, কোথা পেলেন এত চাল ?

বিব্রত সুশীল বলে, আমার একজন জানাশোনা লোক জোগাড় করে দিয়েছে।

এভাবে চাল কেনা ঠিক নয় !

মণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, কেন, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কেনা হয় না ?

নীলিমা বলে, সে আমরা কিনি খোলা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে। না খেয়ে তো মরতে পারে না মানুষ ? দশজনে কেনে, আমরাও যেটুকু দরকার কিনি। এ তো তা নয়। .

কেন নয় ? তফাতটা কী হল ? এক গাদা দাম দিয়ে কিনতে হত, এ চাল বরং কনট্রোলের চেয়ে সস্তা দরে পাওয়া গেছে।

সেটা বুঝি তফাত নয় ? দশজনের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কেনা আর যারা ব্ল্যাক মার্কেট করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চুপিচুপি সস্তা দামে জোগাড় করা এক জিনিস ?

কেন নয় ? সেও চাল, এও চাল !

তুমি বুঝবে না। তোমার সে বুদ্ধি নেই।

এ বাড়িতে এসে এমন কঠিন কথা মণি আর শোনেনি।

গোকুল ফোড়ন দিয়ে বলে, এই সোজা কথাটা বুঝলেন না ? এমনি চাল কিনলেও চোরাকারবারিকে কন্‌ডেমন্ করা যায়—বাধ্য হয়ে চোরাবাজারে চাল কিনতে হয় বলেই করা যায়। কিন্তু চোরাকারবারিকে খাতির করে চাল কিনে কোন মুখে তার নিন্দে করবেন ?

মণি কথা কয় না !

মণির আরক্ত মুখ দেখে প্রণব তাড়াতাড়ি বলে, যাক যাক। অত সূক্ষ্ম তর্কে কাজ নেই। কয়েকটা দিন তো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

মণি এবার ঝাঁঝের সঙ্গে নীলিমাকে বলে, তোমাদের সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি !

প্রণব আবার বলে, যাক যাক। যেতে দাও।

কেউ আর কিছু বলে না।

মেয়েদের নীতিগত তর্ক কলহেই পরিণত হয়। একটা প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেলে মণি খুশি হত। কিন্তু হাওয়ার সঙ্গে কলহ চলে না, প্রণবের হস্তক্ষেপের পর কেউ আর তার সঙ্গে ঝগড়া করতে রাজি নয়। এটাই অসহ্য ঠেকে মণির। নিজের ওপর তার ঘেন্না ধরে যায়। কী এমন বোঝাপড়া আছে ওদের সকলের মধ্যে সে যা বোঝে না ? কী এমন মহাপাপ সে করে এসেছে সারা জীবন আর কী এমন মহৎ জীবন এরা যাপন করেছে যে সর্বদা সে অস্পৃশ্য হয়ে আছে, কারও মনের ছোঁয়াচ পায় না ?

হিংসায় বুক জ্বলে যায় মণির। সেই জ্বালায় সে খুঁজে নেয় এ বাড়ির সবচেয়ে নিরীহ মুখচোরা চিদানন্দের সঙ্গ। চিদানন্দ নামে এ বাড়িতে যে কেউ একজন থাকে এটা যেন সত্যসত্যই একমাত্র সে আবিষ্কার করেছে তার মমতা দিয়ে মানুষ বশ করার অদ্ভুত প্রতিভার জোরে। মমতায় সব মানুষ বশ হয় না আবার মনে-প্রাণে বশ না হলে, অথবা অন্তত বশীভূত হবার যোগ্যতা না দেখালে, মমতা করাও সম্ভব হয় না মণির পক্ষে। তাকে তাই মানুষ খুঁজে পেতে বেছে নিতে হয়।

একেবারে কাদার মতো নিরীহ মেরুদণ্ডবিহীন মানুষও আবার তার ভালো লাগে না, তার মমতায় গলে যেতে চাইলেও নয়। এটাই হয়েছে বিপদ। অন্য সব বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শক্ত মানুষ হবে, নরম হবে শুধু তার মমতা মেনে নেবার বেলা, এ রকম মানুষ সংসারে খুঁজে পাওয়া ভার।

অল্পবয়সি প্রণবকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই প্রণবের দ্বিতীয় সংস্করণ আজ পর্যন্ত আর মিলল না। অগত্যা রুগ্‌ণ নির্জীব চিদানন্দকেই পছন্দ করতে হয়।

বিয়ের ছ-মাস পরে চিদানন্দের টি-বি-র লক্ষণ ধরা পড়েছিল। তাই শুধু তার ফরসা মুখখানা ফ্যাকাশেই হয়ে যায়নি, সরস্বতীর কাছে লজ্জায় দুঃখে সে কেঁদেও ফেলেছিল। গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়ায় রোগটা কেটে গেছে, কিন্তু ছায়া রয়ে গেছে জীবনে। গাঢ় ছায়া।

মাঝে মাঝে পরীক্ষা করাতে হয়।

পরীক্ষার ফলটা জেনেছেন ? মণি প্রথম প্রশ্ন করে। একটু উদ্‌বেগ, একটু ব্যাকুলতার সঙ্গে।

হাঁ। সব ঠিক আছে। তবে কি না—

চিদানন্দ নিশ্বাস ফেলে হতাশা-ভরা চোখে তাকায়। মণিকে দেখলেই তার ভয় বেড়ে যায়। মণি এত বেশি সহানুভূতি দেখায় যে মনে হয় মণি যেন কোনো গোপনসূত্রে জানে রোগটা তার সারেনি, তার বাঁচার আশা-ভরসা কম।

তার মানে ? মণি বলে। চিদানন্দের ভাবটা এমন ভীতিকর !

ডাক্তারবাবু বললেন, স্বাস্থ্য আরও ভালো হওয়া দরকার। আরও পুষ্টি চাই। পুষ্টিকর জিনিস খেতে বললেন, দুধ মাখন ঘি এই সব—

স্তন্য-বঞ্চিত শিশুর মতো চিদানন্দ মণির দিকে তাকায়। কথা সে এমনিভাবেই বলে, ভেঙে ভেঙে একটু একটু করে অল্পে অল্পে।

তা সত্যি। সকালে শুধু আধকাপ দুধ খান। ওতে কী হয় ? আপনার বেশি করে দুধ খাওয়া উচিত।

এখানে পালিয়ে আসার আগে নিজের বাড়িতে নিজের ব্যবস্থায় সে কী কী খেত তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করে চিদানন্দ বেশ উৎসাহিত হয়ে ওঠে ! সে বাড়িটা তার নিজের, অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে যা আয় হত তার সঙ্গে চাকরিব টাকায় এক রকম চলে যেত, তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছিল। এখানে আর কী করে সম্ভব হয় সেসব !

মাসে মাসে তার চাকরির টাকাটা শুধু এখানে সম্বল।

তা বললে কী চলে ? যার যেটুকু দবকার করতেই হবে। ঠাকুরপোকে বলে—

চিদানন্দ আঁতকে উঠে বলে, না না, ও সব বলবেন না ! ও কী করবে ? কেন করবে ? ওর কিছু করার নেই। ঘি-দুধ আমিই খেতে পারি, বাড়ি ভাড়ার আযটা গিয়ে মুশকিল হয়েছে। বুঝলেন না ?

এক পরিবারের মানুষের চেয়েও এ বাড়ির লোকেদের মধ্যে এমন আপনভাব, প্রেমোচ্ছ্বাস বা হিংসা-বিদ্বেষের এমন অভাব যে সব সময় মণির সত্যি খেয়াল থাকে না এখানে বাপ ভাই মা বোন ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়া একটি আদর্শ ঘরোয়া পরিবার বাস করে না। অতি বড়ো দুর্দিনে নিদারুণ বিপদ তাদের এখানে একত্র করেছে, একসঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনে সকলের এই সুস্থ বাস্তব একতা। তাব বেশি কিছু নয়। প্রণব কাউকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে এ প্রশ্নও যেমন ওঠে না, কারও বেশি রকম স্বার্থত্যাগ বা বিশেষ সুবিধা চাওয়ার প্রশ্নও তেমনি আসে না।

এ মিলিত জীবন এদের খেয়াল নয়, নাটুকেপনা নয়,—সহজ সরল হিসাব যে সকলের মিলিত এই জীবনকে যত দূর সম্ভব সুস্থ ও সুন্দর করায় সবারই লাভ। যতটুকু সামঞ্জস্য চলতে পারে, এভাবেই তা সম্ভব হয়েছে, একজনের বিশেষ সুখ-সুবিধার প্রয়োজনকে তার চেয়ে বেশি বড়ো করা দুর্বল মনের অবাস্তব আসার কল্পনা। সে ভাবপ্রবণতার লেজুড় জুড়লে এই অপরূপ একবেলাও টিকবে কি ?

মণিও জানে, তা টিকবে না। এ সত্যটার মুখোমুখি হলে মণি মোটামুটি আসল কথাটা বুঝতে পারে, কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছে এমন অদ্ভুত আর অনভ্যস্ত যে জিইয়ে রাখতে পাবে না, ভুলে যায়। সত্যই তো, এই খুন-জখম অগ্নিকাণ্ড কারফিউর জগতে এর চেয়ে স্বস্তিতে—এর চেয়ে ভালোভাবে চিদানন্দ কোথায় আর থাকতে পারত ? মরণের আতঙ্কে স্তব্ধ নিজেদের সেই এলাকায় গলির ভিতরে বাড়িতে একক অসহায় দিনযাপনের কথা কল্পনা করে মণি শিউরে ওঠে !

ভূতপূর্ব টি-বি রোগী চিদানন্দ, ভালো থাকা ভালো খাওয়ার সঙ্গে যার মরা-বাঁচার সম্পর্ক, তার মন পর্যন্ত এতখানি সবল যে বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থার কথা প্রণবকে বলার নামেই সে আঁতকে ওঠে—সেও জানে যে তার প্রয়োজন আছে বলেই কারও কাছে অবাস্তব দাবি তোলার মানেই হয় না। হোক সে বন্ধু হোক সে আত্মীয়।

সে-ই কেবল এ বাড়িতে এসেও হৃদয়ের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগ খুঁজছে। যে বাস্তবতা সত্য ও সুন্দর তাকে বাতিল করে খুঁজে বেড়াচ্ছে একপেশে স্বার্থপরতার রঙিন হীনতাকে। স্বামীপুত্রের ছোট্ট সংসারটিতে অবিরাম চেষ্টা করেছে যা হয় না তার কত ছোটো ছোটো রকমারি কল্পনাকে সত্য করতে, এখানেও টেনে চলেছে তারই জের।

সস্নেহে তাই সে এ রকম খাপছাড়া প্রশ্নও করে চিদানন্দকে, এখানে আপনার ভালো লাগছে তো ?

চিদানন্দ ইতস্তত করে বলে, ভালো লাগছে, তবে কি না, কী জানেন, এ অবস্থায় কিছু ভালো লাগে ? চারিদিকে এত হাঙ্গামা, কষ্ট করে থাকা আব কী। সবারই সমান কষ্ট।

তবে ? এ তো বড়ো মুশকিল হল মণির ! এখানে এভাবে থাকতে কষ্ট হয়, ভালো লাগে না, তবু থাকতে হচ্ছে বলে আপশোশ বাদ দিয়ে শুধু নয় একেবারে বাঁচার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতেও হয় ! এ কী খাপছাড়া কথা যে বিপদ-আপদে দুঃখে-কষ্টে মানুষ বিব্রত হবে না, ব্যাকুল হবে না, হা-হুতাশ করবে না ?

সরস্বতী বমি করছিল, শব্দ শুনে তারা বারান্দায় যায়।

খালিপেটে জল খেয়েছিলে, না ?

মণি সবজান্তার মতো বলে !

বিছানায় গিয়ে সরস্বতী ক্রমাগত বেঁকে বেঁকে গুটলি পাকিয়ে শোবার চেষ্টা করে। দেখে বিছানায় উঠে তার জামার বোতাম আর কোমরে শাড়ির বাঁধন আলগা করে দিতে দিতে মণি চিদানন্দকে বলে, আপনি একটু বাইরে যান, বমি করতে খিঁচ ধরেছে, ডলে দিতে হবে।

নীলিমা ঘরে ঢুকতেই সমস্ত অপরাধ তার ঘাড়ে চাপিয়ে ঝাঁছালো গলায় বলে, মুখে রোচে না, না খেয়ে রয়েছে, একটু নজরও রাখতে পার না ?

নীলিমা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। কিছু বলে না।

অল্পক্ষণ পরেই সরস্বতী তার হাতটা বুকে চেপে ধরে মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে।

উঠলে কেন আবার ? শুয়েই থাকো না ?

না, উঠি, কমে গেছে, খবর শুনি গে একটু।

গা গুলিয়ে বমি করে খিঁচ ধরে বিছানা নিয়েছিল পোয়াতি মেয়েমানুষ, খবর শোনার তাগিদে সেও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। ঘটনার পর ঘটনার সর্বগ্রাসী বিরাট বন্যা নেমেছে জগতে, এ দেশে, এই নগরে, জীবনের সমস্ত ভিত্তি পর্যন্ত যেন ভেঙে-চুরে ভাসিয়ে নিয়ে আবার আগাগোড়া নতুন করে গড়বে। কী হচ্ছে, কী হবে জানার জন্য দেহ-মন আকুল উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। রাত্রির আসরটির নেশা তাই প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসেছে সকলকে। সারাদিন প্রাণের ধান্ধায় বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এদিক ওদিক চরে বেড়ায়, কুরুক্ষেত্রের রঙ্গভূমিতে পরিণত হলেও মানুষের চরে বেড়ানো একেবারে রদ হয়নি। হলে অবশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব কিছুও রদ হয়ে যেত সেই সঙ্গে—যে শ্মশানে প্রেতও চরে বেড়ায় না সেখানে হাওয়ার সঙ্গে হাঙ্গামা করার সাধ কার হবে। দিনান্তে একে একে সকলে বাড়ি ফেরে, খিদের তাগিদে তাড়াতাড়ি সকলের খাওয়ার পালা শেষ হয়, ধীরে ধীরে খোলা ছাদে বা কোনো বড়ো ঘরের মেঝেতে আসর গড়ে ওঠে। পাড়ার জানাশোনা লোক দু-একজন আসে, কিছুক্ষণ বসে, খবরাখবর বলাবলি করে, আলোচনায় যোগ দেয়, তারপর যেমন বিনা সমারোহে এসে বসেছিল তেমনিভাবে উঠে চলে যায়।

প্রথমে মণির কাছে যা শুধু গল্প-গুজব হাসি-খেলায় সময় কাটাবার খাপছাড়া আড্ডা বলে মনে হয়েছিল তার আর একটা দিক ক্রমে ক্রমে এখন স্পষ্ট হয়েছে। চারিদিকে যে সব কাণ্ডকারখানা চলার ফলে ঝড়-বাদলের অন্ধকারে বন-বাদাড়ে হারিয়ে যাবার মতো দিশেহারা ভাব জাগে, চব্বিশ ঘণ্টা ভীত বিভ্রান্ত হয়ে থাকতে হয়, সকলের এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে সেটা অনেকখানি কেটে যায়।

সুস্থ বাস্তব চেতনা ফিরে পেতে সাহায্য হয়।

চার

ছোটো হোক বড়ো হোক রাত্রের আসরটি রোজই বসে।

কে কোথায় কোন সূত্রে কী দেখেছে শুনেছে জেনেছে বুঝেছে, কোন বিষয়ে কে কী ভাবছে, তাই কথা-গল্প তর্ক-বিতর্কের মধ্যে এলোমেলো ছাড়া-ছাড়াভাবে জমতে জমতে ক্রমে একটা সংগঠিত ধারণার রূপ নেয়। বিহ্বল চিন্তা এগিয়ে চলার পথ পায়, শৃঙ্খলা পায়। আসরে গিয়ে বসার জন্য মণিও ক্রমে ক্রমে উৎসুক হয়ে উঠছে।

নটার মধ্যে আজ প্রণবও বাড়ি ফিরেছে, তার শরীর ভালো নয়। আজ ঘরোয়া বৈঠকটি বেশ বড়ো হয়েছে, পাড়ার চেনা যারা মাঝে মাঝে আসে তাদেব ক-জন ছাড়াও নতুন তিনজন এসেছে— মণি বা সরস্বতীরাও যাদের আগে দেখেনি।

দুটি অল্পবয়সি তরুণ, দেখে প্রথমেই অনুমান হয় যে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। কারণ, কম খেয়ে বেশি খাটার রুক্ষ কঠোরতার সঙ্গে অদ্ভুত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা মেশানো চিবন্তন ছাপটা আছে, গান্ধীজিও যে ডিসিপ্লিনের প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে গভীর আত্মবিশ্বাস মেশার যা বাইরের রূপ। এ রকম রোগা রুক্ষ ছেলে একটু লাজুক আর চঞ্চল হয়, কখনও স্থির হয়ে বসতে পারে না, প্রায় উশখুশ করার মতোই অকারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের টুকটাক নড়াচড়া চলতেই থাকে, মুখের ভঙ্গি ক্রমাগত বদলায়, দৃষ্টি হয় নত হয়ে থাকে নয়তো উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক ওদিক সঞ্চালিত হয়। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, সংসারে অর্থ, সাজপোশাক আর ললিত-কান্তির অভাব মোটেই তাদের অপরাধ নয় বরং দামি জামাকাপড় আর প্রসাধনের পালিশে চকচকে চর্বির ভোঁতা লাবণ্য যাদের আছে তাদেরই, এ সহজ শিক্ষাটা তাদের কে দেবে ? এ ছেলে দুটির শান্ত ভাব, নির্ভীক সরল দৃষ্টি—এবং তাতে বাস্তবতার মর্মগ্রাহী গভীরতা ! অন্যজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, শ্যামবর্ণ সুশ্রী চেহারা, একমাথা ঘন কালো চুল। পাড়ার উকিল বিনোদবাবুর সে মেজোজামাই, পূর্ববঙ্গে বাড়ি, নাম মনোমোহন। আজ ভোরে সে এসে পৌঁছেছে, তার কাছে পূর্ববঙ্গের কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা গেল। শুনতে শুনতে সকলে মূক হয়ে যায়, নরক এখানেও গুলজার হযে আছে তবু সেই সুদূর নোয়াখালির ঝাঁঝটাই যেন বেশি তপ্ত লাগে।

বৈঠকে নবাগত ছেলেদের একজন আচমকা প্রশ্ন করে, ভালো দিক দ্যাখেননি কিছু ?

ভালো দিক ? মনোমোহন বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকায, এই পাশবিক কাণ্ডের ভালো দিক ?

প্রণব বলে, অমল খুন-জখমের ভালো দিকের কথা বলেনি। ও সব ঠেকাবার চেষ্টাও তো হচ্ছে।

তুমি কী করে জানলে হচ্ছে ?

এ বৈঠকে মণি এ পর্যন্ত মুখ খোলেনি। আজ হঠাৎ তাকে কথা বলতে শুনে সকলেই তার দিকে তাকায়।

প্রণব বলে, খবর পাচ্ছি।

বানানো খবর।

দাঙ্গার খবরগুলি বানানো নয়, শুধু এই খবরগুলি বানানো ? এ তোমার গায়ের জ্বালার কথা।

আমার আবার গায়ের জ্বালা কীসের !

গায়ের জ্বালা সবারই আছে। সেই সঙ্গে বিচারবুদ্ধিটা ঠিক থাকলেই মুশকিল হয় না। দাঙ্গা হলে সেটা ঠেকাবার চেষ্টা হতে বাধ্য। একটা বাদ দিয়ে আরেকটা হতে পারে না।

প্রণবের কথায় দ্বিধা নেই, অস্পষ্টতা নেই। সে যেন ঘোষণা করছে যে অসভ্যতা থাকলেও মানুষ অসভ্য নয়, সভ্যই। তবে সভ্যতা, মানবতা ইত্যাদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কথাগুলি নিয়ে অসভ্য

এবং অমানুষেরাও নানান কায়দায় এত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে সোজা স্পষ্ট মানে একটু গুলিয়ে গেছে মানুষের কাছে।

তাই, শুধু মণি নয়, আরও কেউ কেউ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মণি মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে, কেন হতে পারে না ?

সাধারণ মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চায় না বলে। ও সব তাদের স্বার্থের বিরোধী বলে।

মণি সংশয়ভরে বলে, তাই নাকি ! যুদ্ধ তাহলে শুধু অসাধারণ লোকেরা করে, সাধারণ লোক নামে না ? এ হাঙ্গামা থেকে সাধারণ লোক বাদ পড়েছে, তারা দাঙ্গা করেনি ?

প্রণব সংক্ষেপে জোর দিয়ে বলে, না, করেনি। সাধারণ মানুষ যুদ্ধেও নামে না দাঙ্গাও করে না।

আজ মণি প্রথম মুখ খুলেছে ! প্রণব বুঝি তাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে দিয়ে বোঝাতে চায় এ সব তোমার অনধিকার চর্চা ?

মুখ লাল করে মণি বলে, তামাশা করছ ?

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, না, এ কী তামাশার ব্যাপার ? একটু ঘুরিয়ে বলি তাহলেই বুঝতে পারবে। সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে নামানো হয়, তাদের দিয়ে দাঙ্গা করানো হয।

ওঃ ! তোমার সেই সূক্ষ্মবিচার !

সূক্ষ্ম মোটেই নয়, খুব মোটা বিচার। একেবারে গোড়ার বিচার।

এ বিচারটা ভুলে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। এটাই আজ সবচেয়ে বড়ো কথা। সাধারণ মানুষকে আজও কমবেশি ভোলানো যায় খ্যাপানো যায় কিন্তু সহজে সস্তায় না ভুলবার না খেপবার ঝোঁকটাই বেশিরকম জোরালো। আজ তাদের একটা যুদ্ধে নামাতে পৃথিবী জুড়ে ওলট-পালট ঘটনার মতো বিরাট ব্যাপার ঘটাতে হয়। ধর্মের নামে জাতের নামে একটা ছুতো দেখিয়ে ডাক দিলেই মানুষ আর যুদ্ধে নামে না, দাঙ্গা করে না। যুদ্ধ বাধাতে হিটলারদের কী মহামারী কাণ্ড করতে হয়েছিল মনে নেই ? দুশো বছরের গদি আপসে ছেড়ে দিতে না চেয়ে ইংরেজের সাধ্য ছিল না এ রকম দাঙ্গা বাধায়।

মনোমোহন বলে, ঠেকাবার চেষ্টা হচ্ছে বইকী ! আমাদের গ্রামেই প্রায় বেধে গিয়েছিল, বাধলে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। চেষ্টা করেই সেটা ঠেকানো গেছে। এ রকম চেষ্টা ছাড়াও কত রকম দৃষ্টান্ত দেখেছি। একটা ঘটনা শুনুন। ছোটোভাই দলে ভিড়ে গিয়ে একজনের ঘরে আগুন দিয়ে এল, তার রাগ ছিল। প্রাণের মায়া ছেড়ে বড়োভাই সেই বাড়ির সকলকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখে প্রাণ বাঁচাল। ছোটোভাই বাড়ি ফিরে ব্যাপার দেখেই একেবারে খেপে গেল—তখুনি বেরিয়ে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে। বড়োভাই দরজা আগলে বসে রইল সারারাত, খবর দিতে যেতে হলে আগে তাকে খুন করে যেতে হবে।

মণি আজ প্রথম মুখ খুলেছে। সব বিষয়েই তার কথা বলা চাই। সে বলে, দেখুন, ও রকম দু-চারটে ভালো লোক সব জাতেই থাকে। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

প্রণব মনোমোহনকে বলে, বড়োভাইটা নিশ্চয় পাগল ছিল ? নয়তো কোনো পার্টির মেম্বার ছিল ? নয়তো সাহিত্যিক ছিল ? তাও যদি না হয়, তবে নিশ্চয় ভগবান কিংবা আল্লার খামখেয়ালে সৃষ্টিছাড়া অসাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেছিল !

মণির মুখ আবার লাল হয়ে যায়।

মনোমোহন অস্বস্তির হাসি হেসে একটা বিড়ি ধরায়।

প্রণব বলে, না না, কথাটা তুচ্ছ নয়। এ রকম ছাড়া ছাড়া দু-পাঁচটা ঘটনার কথা আমরা শুনি। নিজেরা দু-একটা দেখেও থাকি। অনেকেই মনে করে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা—একসেপ্‌শন ! এ সব

ঘটনা থেকে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু কেন তা করা যাবে না ? আগে থেকে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে ঘটনাটা তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে অবশ্যই মনে হবে, ঘটনাটার কোনো মানে নেই, হঠাৎ ঘটে গিয়েছে। কিন্তু আগে ঘটনাটার মানে বুঝে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি সিদ্ধান্ত করা যায় ? তখন দেখা যাবে সব জাতের মস্ত মস্ত মহাপুরুষ ক-জন যেমন হঠাৎ জন্মাননি, এ রকম ঘটনা কটাও হঠাৎ ঘটেনি। দশজনের মধ্যে আগে অল্পবিস্তর মহান ভাব, মহত্ত্ব জাগে—তবেই সেই ভাবের একজন মহাপুরুষের জন্ম সম্ভব হয়। দশজনে কাজে পারে না কিন্তু মনে মনে এ রকম ঘটনা যখন কামনা করে, তখনই একজনের পক্ষে সেটা ঘটানো সম্ভব হয়।

সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, মণি পর্যন্ত। প্রণবের গলা চড়েনি, চোখে-মুখে ভাব-তরঙ্গের লীলাখেলার ছাপ পড়েনি, বক্তৃতা দেবার মতো করে সে কথাগুলি বলেনি। তন্ময় হয়ে গেলেও তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সকলের মুখে বৈজ্ঞানিকের মাপকাঠির মতো সঞ্চালিত হয়েছে—কে কতটুকু বুঝছে, কার শুধু ভাবাবেগ ও বুদ্ধির সমন্বয় ঘটেছে সাময়িকভাবে।

সুশীল যেন কোথায় গিয়েছিল। এতক্ষণে ফিরে এসে আজ বেশি লোকের বৈঠক দেখে এবং মণিকে সকলের সামনে বসে থাকতে দেখে সে একমুহূর্ত ইতস্তত করে। তারপর যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে নিঃশব্দে বৈঠকে গিয়ে সবার পিছনে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরায়।

প্রণব হঠাৎ সুর পালটে সোজা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে সুশীলের সিগারেট ধরাবার প্রক্রিয়ার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, যেমন ধরা যাক ওই দেশলাই কাঠিটা জ্বালানো। ওটা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? তুচ্ছ একটা দেশলাই কাঠির সঙ্গে মানুষের সভ্যতা, মানুষের ইতিহাস জড়িত রয়েছে।

সবে সিগারেট ধরাচ্ছিল, ভড়কে যাওয়ায় সুশীলের হাত থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা তার কোলে জামাকাপড়ের উপরে পড়ে যায়। থাপড়া দিয়ে সহজেই সেটা নিভিয়ে ফেলা যায় কিন্তু ঠেকানো যায় না পাঞ্জাবির গায়ে ছোটো একটি পয়সার মতো ফুটো হওয়া।

সামান্য ব্যাপার। কিন্তু একমুহূর্তে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় আজকের বৈঠকের গভীর গাম্ভীর্য। যে ভাবটা সঞ্চারিত হয়েছিল সেটা উপে যায়। মনে হয়, প্রণব যেন সাধারণ একজন অধ্যাপকের মতোই কয়েকজন আনাড়ি ছাত্রছাত্রীর ইতিহাস কাব্য বিজ্ঞান ধর্ম অর্থনীতি যুদ্ধ শান্তি সব বিষয়ের ছাঁকা মর্মটুকু বুঝিয়ে দিতে চেয়ে নতুন কথা বলার প্রতিভায় সকলের মন হরণ করেছিল কিন্তু একজন দুরন্ত ছাত্র যেমন একটা প্রশ্নে বিদ্যায়তনের বিদ্বান অধ্যাপকের জমানো ক্লাসটা গলিয়ে দেয়, সুশীল তেমনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে প্রণবের ক্লাসটি ভেস্তে দিয়েছে।

অনেক রাত হয়েছে।—মনোমোহন বলে।

আপনি আজ এখানে খাবেন।—মণি বলে।

অমল ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি যাচ্ছি। বাস পাব না।

মণি বলে, তুমিও আজ এখানে খাবে। এখানেই শোবে।

নীলিমা বলে, কী হল তোমার ?

মণি বলে, কিছু হয়নি। এদের আজ এতরাত্রে যেতে দেওয়া যায় না। আমি নয় কিছু খাব না। আমি নয় আজ রাতটা কয়লাগাদায় চট মুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দেব।

মণি উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথার আঁচল খুলে কোমরে জড়িয়েছে। তার সঙ্গে ঝগড়া না করে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করা সম্ভব নয়।

প্রণব ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, এ কী, সাড়ে নটা বাজে। ট্রাম-বাস সব তো বন্ধ হয়ে গেছে।

সুতরাং মণির কথাই টিকে যায়।

শুধু আজ রাতটুকুর জন্য। মণিও তা বোঝে। সে তাই ভাবে, এই লোকাকীর্ণ বাড়িতে কাল কোথায় সে একটু কাঁদবে—সকলের চোখ এড়িয়ে কান এড়িয়ে নিজের মনে ? তবে সেটা কালকের

কথা। আজ সে জয়ী হয়েছে। আজ এ বৈঠকে এতক্ষণ ধরে সোজাসুজি হোক ঘুরিয়ে হোক প্রণব কথা বলেছে তর্ক করেছে এক রকম তারই সঙ্গে। মণি প্রস্তাব করে, তবে আরও কিছুক্ষণ বসা যাক। না, খাওয়াদাওয়া আগে হবে ?

হবে ?

খাওয়া তো আছেই।

সেই ছেলেটি,—নীলিমার ভাই গোকুল !

মণি বলে, তুমি তো কিছুই বলছ না গোকুল !

শুনছি। বুঝতে চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষ মানে তো মজুরচাষি ?

গোকুলের কথা শুনে সকলেই প্রায় হেসে ওঠে, প্রণব পর্যন্ত। মণি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। এত সহজে আবার ধাতস্থ হয়ে গেল আসরটা ! প্রণবের তো অন্তত খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকা উচিত ছিল।

প্রণব বলে, মজুরচাষি তো বটেই। তার সঙ্গে গরিব মধ্যবিত্ত সবাই।

নীলিমা ভাইকে বলে, এটাও জানিস না তুই এতদিনে ? শুধু কবিতা লিখলে হয় না !

গোকুল বলে, তোমরা যে সব গোল পাকিয়ে দাও ! প্রণবদা বললেন, একটা মানুষকে ধরে সাধারণ মানুষের ঝোঁকটা কোনদিকে ধরা যায়। মজুরচাষি মধ্যবিত্ত সবাই তাহলে এক রকমভাবে নিচ্ছে সবকিছু, সবার রিয়্যাকশন এক রকম ?

সবাই প্রণবের দিকে তাকায়। নাঃ, গোকুল ছেলেমানুষের মতো কথা বলেনি !

মনে হয় গোকুলের প্রশ্ন শুনে প্রণব খুশি হয়েছে। সে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। এতক্ষণ মিছে বকেছি, আমার কথা কেউ ধরতে পারোনি। একটা বিষয়ে আলোচনা শুরু করে আমরা খানিক পরে বিষয়টা ভুলে যাই, সেটাই হয়েছে মুশকিল ! কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি খেয়াল থাকে না।

মণি ধৈর্য হারিয়ে বলে, তুমি বড়ো বক্তৃতা করো ঠাকুরপো। সোজাসুজি বলো না !

প্রণব একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিরীহ এবং প্রতিদিনের নীরব শ্রোতা ভূপেন বলে, না না, একটু গুছিয়ে না বললে এ সব কথা বোঝানো যায় না, বোঝাও যায় না।

প্রণব বলে, আমি যেভাবে বলতে জানি সেভাবেই তো বলব, নইলে বানিয়ে বলতে হয়। যাকগে, আমরা মানুষের দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের কথা বলছিলাম, এসে ঠেকলাম শ্রেণি বিচারে। গোকুল তাই বলছে, আমি শ্রেণিবিভাগটা উড়িয়ে দিয়েছি, যেটা আসল বিচার। সত্যই তো, শ্রেণিটাই মানুষের আসল পরিচয়। যত কিছু লড়াই সব আসলে শ্রেণির লড়াই। প্রণবদা শ্রেণি-ট্রেণি তুলে দিয়ে মানুষকে জনসাধারণ নাম দিয়ে একাকার করে দিয়েছেন, গোকুল এটা বরদাস্ত করে কী করে !

গোকুল একটু হাসে।

আমি কিন্তু যা বলেছি শ্রেণিবিচারের ভিত্তিতেই বলেছি গোকুল। হিন্দু বা মুসলমান বলে কোনো শ্রেণি নেই কিনা, তাই মিছামিছি শ্রেণির কথা তুলে কথা বাড়াইনি। মজুরশ্রেণি সবচেয়ে বেশি দাঙ্গাবিরোধী। কিন্তু আমরা কি সেকথা বলছিলাম, কোন শ্রেণির মধ্যে দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব বেশি বা কম ? যতগুলি শ্রেণি মিলিয়েই জনসাধারণ হোক, আমরা সেই জনসাধারণের মোট মনোভাবটা বিচার করছি। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন নিয়ে মজুর আর চাষির দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকতে পারে, মধ্যবিত্ত আরও খানিকটা ভিন্নভাবে দেখতে পারে ব্যাপারটা, কিন্তু মোটামুটি বড়ো একটা মিল আছে সবার দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই মোট মনোভাবটাই আমাদের বোঝা দরকার।

ভূপেন বলে, আমারও তাই মনে হয়। তবে ভাবি কী, ওভাবে ধরলে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে যায় না ? জনসাধারণ আছে—হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই। অথচ দাঙ্গাহাঙ্গামাটাও বাস্তব, উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রণব বলে, না, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি আঁকড়ে থাকলেই বরং হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু থাকে না। শ্রেণি মেলানো জনসাধারণকে ধরে বিচার করলে সমস্যাটার বাস্তব চেহারা ধরা পড়ে। নীচের তলার মানুষেরা একাকার, মিলটাই তাদের সবচেয়ে বড়ো স্বার্থ—তবু দাঙ্গা হচ্ছে। তাহলেই প্রশ্ন আসে, কেন হচ্ছে ? নীচের তলার সাধারণ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যাতে সর্বনাশ, সেটা কেন ঘটছে ? জবাব খুঁজলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

মণি বলে, নীচের তলায় বুঝি হিন্দু-মুসলমান একাকার ?

বাঁচার স্বার্থে একাকার বইকী। নমাজ পড়ে পুজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচে না, বাঁচে বলেই নমাজ পড়ে, পুজো দেয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো। কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মারছে, পেটের ধান্ধায় কাবু, তার ওপর হাজারটা কুসংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কি কঠিন ? তবু, একটু চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে, দ্যাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনও যে এই শহরে ট্রামে চেপে বেড়াও, হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে ওই ট্রাম চালাচ্ছে। এদিকে নোয়াখালি, ওদিকে বিহার, কে বলতে পারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কী হবে। আজ এ কথা ভুললে রক্ষা আছে এটা ওপর থেকে চাপানো দাঙ্গা, ওপরওলাদের স্বার্থে ! দুশো বছর যারা শোষণ করছে প্রথম দায়িত্ব তাদের ! উপরতলার তুলনা কব, কারা বেশি অমানুষ, কাদের দায়িত্ব বেশি স্পষ্ট বুঝে নাও, প্রাণ খুলে শাপ দাও, বুকে ছ্যাঁকা লাগলে মানুষ তা দেবেই। আশা-ভরসা রাখো নীচের তলায়।

কী আশা ? কী ভরসা ?

মধ্যযুগে পারা যেত, এ যুগে শুধু ধর্মের জন্য গরিবকে দিয়ে আর হত্যা করানো যায় না। বেহেস্ত বা স্বর্গের নেশা থাকলেও সেখানে সবটা পুরস্কার পাবার আশায় থাকতে মানুষ আর রাজি নয়, কিছু নগদ বিদায়ও চায়। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ভাতকাপড়ের সুখ পেতে হলে এটা করা চাই-ই, এ বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সাধারণ লোকের একটা অংশকে দাঙ্গায় মাতানো গেছে। এখন বাস্তব চেতনাটাই আশা ভরসা এবং ভবিষ্যৎ। হিন্দু মুসলমান যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে যে ওরা আমার ধর্মের পথের কাঁটা, তাদেরও সত্যি সত্যি এটা আসল চিন্তা নয়। এ আদর্শবাদে মত্ত হওয়ায় আসল কারণও বাঁচা-মরার সমস্যা। যে মুহূর্তে ভুল ভাঙবে, টের পাবে যে বাঁচার পথেব কাঁটার চাষটা শুধু ওপর তলায় হয়, সেই মুহূর্তে শত্রু-মিত্র চিনতে পারবে, আর—

বক্তৃতায় ভুল ভাঙবে ? কবে সাধারণ লোকের ভুল ভাঙবে সেই আশায় বসে থাকব ? তা হলেই হয়েছে !

তবে কোন আশায় বসে থাকবে ? একটা আশা তো চাই।

অতি মৃদুস্বরে প্রণব প্রশ্নটা উচ্চারণ করে। জবাবের জন্য তার নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করাটা অর্থপূর্ণ ব্যাকুলতার মতোই ঠেকে।

শেষে তেমনি মৃদুস্বরে সে নিজেই বলে, বসে থাকার জন্য আশা নয়। কিছু করতে হবে বলেই আশা। এখুনি না হোক, যতকাল সময় লাগুক, আশা নিয়েই মানুষ কাজ করে। নইলে বাঁচার মানে হয় না। তাছাড়া, এ তো খুব সুদূর দিনের আশা নয় আজ ! মানুষের চেতনা আজ কোথায় এসে গিয়েছে—এ আশা বাস্তব হতে বেশিদিন লাগবে না।

রসময় নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথার শেষে প্রণব বলে, বসুন।

গিরীন টেলিফোনে একটা খবর জানিয়েছে, রসময় এসেছে খবরটা জানাতে। আজ সন্ধ্যার পরেই কাগজের আপিসে একটা ছোটোখাটো আক্রমণের চেষ্টা হয়, ক্ষতি বিশেষ কিছু হয়নি, একজন

দরোয়ানের শুধু সামান্য চোট লেগেছে। গুজব শুনে বা অন্যভাবে খবর পেয়ে বাড়ির লোক ব্যস্ত হতে পারে ভেবে গিরীন জানিয়েছে যে, ভাবনার কোনো কারণ নেই, আপিসটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাগজে কিছু কিছু দাঙ্গা-বিরোধী প্রচার হয় বলে এই আক্রমণের চেষ্টা, তবে কিছু করতে পারবে না জেনেই হানা দিয়েছিল, আসল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো।

আরেকটা খবর গিরীন জানিয়েছে। কোনো সূত্রে সে জানতে পেরেছে তাদের এদিকের এলাকায় হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছে, কিন্তু ঠিক কোন পাড়ায় হবে, প্রণবদের পাড়ায় কিংবা আশে-পাশে সেটা ঠিক জানতে পারা যায়নি।

এ পাড়ায় কি হাঙ্গামা হতে পারে প্রণববাবু ? রসময় চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।

কী জানি। সহজে বাধবে না, তার বেশি বলা কঠিন। যে দিনকাল, গুজব ছড়িয়েই মানুষের মাথা আরও বেশি বিগড়ে দিচ্ছে।

রসময় অল্পক্ষণ বসেই চলে যায়, মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ এবং ঘুম-কাতুরে। এই বাড়ি আর এ বাড়ির মানুষদের সে সাধারণত এড়িয়েই চলে। এ অঞ্চলে হাঙ্গামার সম্ভাবনার কথাটা গিরীন উল্লেখ না করলে নিজে আসত কিনা সন্দেহ।

রসময় চলে যাবার খানিক পরে কাল্লু মিস্ত্রি যেন তার প্রশ্নেরই জবাব নিয়ে আসে।

কী খবর কাল্লু ?

• জবর খবর। ইয়াসিন এসেছিল।

এ পাড়ায় এসেছিল ? ইয়াসিন ?

খবরটা সত্যই গুরুতর। ইয়াসিন অন্য এক এলাকার শক্তিশালী গুন্ডা-রাজ বা গুন্ডা-নবাব ! নিজের দলের সীমানা ছেড়ে এ সব লোক সহজে অন্য এলাকায় যায় না, কারণ ওই একটা এলাকার মধ্যেই ক্ষমতাটা এদের সীমাবদ্ধ থাকে।

কাল্লু বলে, দুপুরবেলা নাজের আলির বাড়ি এসেছিল, সন্ধ্যার সময় সিংহীকে তুলে নিয়ে তিনজন মোটরে বেরিয়ে গেল। আমাদের আজিজ হল আলি সায়েবের ড্রাইভার, নতুন ঢুকেছে। আজিজ বলল, চৌরঙ্গির বড়ো হোটেলে খানাপিনা করেছে। আরেকজন কে এসেছিল, আজিজ চেনে না, চারজনে সলা হয়েছে খুব।

সিংহী সুবোধ সিংহের চলিত নাম।

প্রণব বলে, ইয়াসিন প্লাস সিংহী। ব্যাপার তো সুবিধে ঠেকছে না। একটু হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

অমলের সঙ্গী সুধীর আগাগোড়া চুপ করে শুনছিল। কাল্লু চলে গেলে সুধীর বলে, ইয়াসিনের একটা গুণ আছে, কথা দিয়ে কথা রাখে। মধু দত্ত লেনের কয়েকজনকে বলেছিল, আপনারা থাকুন, কোনো ভয় নেই। অনেক চেষ্টা করেও কেউ কিছু করতে পারেনি। তারপর হাঙ্গামা হবার আগে নিজেই আমায় জানিয়েছিল, এবার পালান আপনারা, অন্যদিক থেকে চাপ আসছে, আমি সামলাতে পারব না। ঠিক দুদিন পরে আর্মড গার্ডদের ব্যাপারটা ঘটল।

ওটা কী জান, প্রণব মৃদু হেসে বলে, ওদের বিলাস ! গুন্ডারাও সামাজিক জীব, সমাজের বিকার ওদের চালায়। বিনা খরচায় খানিকটা বাহাদুরি হল, ক্ষতি কী ? লাভ থাকলে যাদের ভরসা দিয়েছিল নিজেই তাদের গলা টিপে মারত !

সুধীর বলে, সে তো ঠিক কথাই। স্বার্থ ছাড়া ওরা কী চলে !

মণির অসহ্য ঠেকছিল, দম আটকে আসছিল।

এবার একটু অন্য কথা বলো। দোহাই তোমাদের, মারামারি কাটাকাটি ডাকাত গুন্ডা ছেড়ে অন্য কথা বলো। আর কি কোনো কথা নেই ?

মণির আর্তনাদ সকলকে চমকে দেয় কিন্তু বিভ্রান্ত করে না। গানের সুর যেমন খেলে বেড়িয়ে চড়তে চড়তে চরমে ওঠে, আবাব ফিরে আসে শুরুতে, মণি যেন উচ্চগ্রামে বাঁধা আলোচনা এবং মনগুলিকে আঘাত দিয়ে ফিবিয়ে এনেছে গোড়ায়।

সরস্বতী বলে, সত্যি, আমরা খালি নেতা নিয়ে, মন্ত্রীমিশন নিয়ে, দাঙ্গা নিয়ে, কংগ্রেস-লিগ-কম্যুনিস্ট নিয়ে মেতে আছি। চব্বিশ ঘণ্টা সামলাও সামলাও ভাব। কেন, আমাদের সাধ-আহ্লাদ সুখ-দুঃখ নেই ? নেতাবা চুলোয যাক, রাজনীতি মরুক, টুটু, তুই একটা গান গেয়ে শোনা দিকি লক্ষ্মীটি !

নীলিমা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সার্থক জনম আমার' গানটা গা। সত্যি আমরা সবাই যেন মহাপাপ কবেছি, দিনরাত খালি জপ করছি দেশ আর সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতা, বিপ্লব আর সমাজতন্ত্র। বস্তির গবিব মানুষগুলি পর্যন্ত হইচই ফুর্তি করছে, আমাদের যত দায় !

ঢোলক ঘুঙুর আর মিলিত কণ্ঠের মোটা আওয়াজে সস্তা সংগীতের রেশ সত্যই ভেসে আসছিল। প্রণব মণির কাছে প্রায় কৃতজ্ঞতা বোধ করে। বিপ্লব যে আতিশয্য নয, আত্মহত্যা নয়, মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ম বিধানেই বিপ্লব হয়, সেও প্রায় ভুলতে বসেছিল এটা।

টুটু ভুপেনের মেয়ে, বছর পনেরো বয়স। যেমন রোগা তেমনই কালো, ভয়-ভাবনা-ভীবুতা মাখানো মুখ। গান গাইবার অনুবোধেব জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে এব দিকে ওর দিকে তাকায়, বার কয়েক ঢোঁক গেলে। তারপর মুখ উঁচু করে চাবতলা বাড়ির ছাদ-ঘেঁষা মাঝাবি চাঁদটাব দিকে ভ্রুকুটি করে তাকায়। ধীরে ধীরে সে গাইতে আবম্ভ করে, গলার গান যেন তাব নববধূব মতো বিয়ের মন্ত্রের স্বামী সম্ভাষণে চলেছে, প্রথমে এই রকম ধরাবাঁধা নিয়মতান্ত্রিক মনে হয়। ক্রমে মেয়েটা নিজেই মশগুল হতে থাকে নিজের গানে, ক্রমে তার কণ্ঠ ও সুর জগতেব সেবা অভিসারিকাব মতো ঘর বর হিংসা দ্বেষ হানাহানির সীমানা ছাড়িয়ে বিরাট প্রাণের সুববন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে।

গান শেষ করে টুটু নীরবে উঠে গিয়ে আলসে ঘেঁষে দাঁড়ায়। এক্তগুলি মনকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে তার খেয়ালও থাকে না।

একটি মেয়ের একটি গান বিব্রত অশান্ত পীড়িত মনগুলিকে কীভাবে বদলে দিতে পারে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে আবার যখন ধীরে ধীরে কথাবার্তা আরম্ভ হয়। ছাড়া-ছাড়াভাবে বিচ্ছিন্ন পীড়নের মতো প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি একে একে না এসে বৈঠকে এবার সমগ্র দেশ, বৃহৎ পৃথিবী, সমস্ত মানুষ, অতীত ইতিহাস ও আশাতীত ভবিষ্যতের আনাগোনা চলে নানা কথায়, মানুষের আনন্দময় মুক্ত স্বাধীন জীবনের নূতন ভূমিকা সৃষ্টি হয়। জগতের মানুষ আজ কোন দিকে চলেছে, জীবনের অভিযান কোন সার্থকতার উদ্দেশ্যে, ভারতের কোন মুক্তি জগৎকে মুক্তিব পথে এগিযে নেবে, সোভিয়েট রাশিয়ায় যে নূতন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হয়েছে তার কর্মময় বাস্তব চেতন-মুক্তির মর্ম কী, কীসে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ? রাত্রি গভীর হয়ে আসে, লক্ষ লক্ষ স্পন্দিত হৃদযের বিচরণ-ক্ষেত্র মহানগরী আকাশ পর্যন্ত গুঞ্জন মৃদুগুঞ্জনে জীবন্ত স্তব্ধতা বিস্তার করে যেন কান পেতে তাদের কথা শোনে।

পাঁচ

ভোরে দেখা গেল নানি পথের ধারে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। বোসেদের দোতলা বাড়ির নীচের তলায় দালানের গঠনের সঙ্গে একত্র গড়া মার্বেল পাথরের মন্দিরটির ঠিক সামনে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে নানির সর্বাঙ্গ, তাকে ঘিরে রাস্তায় ছড়িয়ে আছে চাপ চাপ অজস্র রক্ত। নানির ওই ক্ষীণ

দেহে এত রক্ত কোথায় ছিল। অথবা এ রক্ত শুধু নানির রক্ত নয়। এ মরণ শুধু নানির মরণ নয় ? দালানসাৎ মন্দিরটির লোহার কোলাপ্‌সিবল দরজার খাঁজে লটকানো গোবুর মাথাটি দেখলে তাই মনে হয়।

কিন্তু কেন এ মর্মান্তিক হত্যা ? এ জগতে কার কাছে নানি কী অপরাধ করেছে ? সে তো প্রিয় ছিল সকলের, বয়সের ভারে বাঁকা হয়ে সে তো ঝুঁকে পড়েছিল কবরের দিকে, আজ বাদে কাল গোবর-কুড়ানো জীবন থেকে আপনা থেকেই মুক্তি পেত ? তার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়েই বা দেওয়া কেন মন্দিরের এই বীভৎস অপমান ? এ এলাকায় হাঙ্গামা ঘটেনি, কিন্তু সারা শহরের মতো এখানেও স্নায়ুগুলি উত্তেজনায় প্রতিক্রিয়ায় টান-টান হয়ে আছে—এ যদি সেই স্নায়ুমণ্ডলীর ধৈর্য ভেঙে দেবার উসকানি হয়—একসাথে বিপরীত উসকানি কেন ?

নানিকে কি আগে হত্যা করা হয়েছিল ? মন্দিরের গায়ে লটকানো গোবুর মাথাটি তার জবাব ? অথবা ওই গোবুর মাথাটির জবাব নানির এই মরণ ?

যেমন বীভৎস তেমনি রহস্যময় ঘটনা, অনেক ধরনের অনেক প্রশ্নই মানুষের মনে জাগে। কিন্তু প্রশ্ন করার, রহস্য বোঝার, অবসর মেলে কই ? এ কাণ্ড যাদের পরিকল্পনা তারা চুপ করে ছিল না। ভোরের আলো ভালো করে ফুটবার আগে তারাই আবিষ্কার করে নানির দেহ আর গোবুর মাথাটি তারাই শোরগোল হইচই তুলে দেয় চারিদিকে। তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে যায় বিচার-বুদ্ধি বিবেচনা, কীসে কী ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে আগে তা ভেবে নিয়ে তারপর উপযুক্ত প্রতিকার বা প্রতিহিংসার চিন্তা আনা। মানুষের মনকে যখন বারুদে পরিণত করে রাখা হয়েছে তখন বড়ো জোর আগুনের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলার বিবেচনাটুকু তার থাকতে পারে, স্ফুলিঙ্গ এসে ছুঁয়ে ফেললে বারুদের জ্বলে ওঠা আর ঠেকানো যায় না।

নানিকে হত্যা করার শোরগোলে মন্দির অপবিত্র করার দিকটা চাপা থাকে, ধর্মস্থানের কুৎসিত অপমানের হইচইয়ে নানির মরণ মর্যাদা পায় না। কোন অন্যায়টা বড়ো তা নিয়ে অবশ্য বচসা শুরু হবার সুযোগ ঘটে না, ভিড় জমে উঠতে না উঠতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়,—পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর ! মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভালো করেই জানে। বেঁচে থাকতে মাকে খেতে না দিক, তার অপমৃত্যুর সংবাদে নাজিম বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটে এসেছে, সাথে সাথে কিংবা আগে-পরে এসেছে বস্তি আর বস্তির ওপারের মুসলিমপ্রধান এলাকার অনেকে। বুড়ি মাকে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে নাজিম সবে হাঁটু পেতে বসে মায়ের মুখখানা বুঝি উঁচু করতে গিয়েছিল, সোডার বোতলের ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়ে তার জীবন্ত তাজা রক্ত ঝরে নানির চাপ-বাঁধা রক্তে মিশতে থাকে,—শুধু নানির রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গোবুর রক্তও মেশানো হয়েছিল দৃশ্যটায় বীভৎসতা বাড়াবার জন্য। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলির অঙ্গ—সোডার বোতল নিয়ে লোক প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবে নাজিমের মাথাটাই যে ফাটবে সেটা কেউ ভেবে রাখেনি।

কয়েক মিনিটের জন্য তারপর এলোমেলো মারপিট খুন-জখমের চেষ্টা চলতে থাকে, কাপড়ের ভাঁজের আড়াল থেকে ঝকঝকে ছোরা বেরিয়ে এসে রতন সান্যালের পাঁজরে ঢুকে যায়, অ্যাসিডের বাল্‌ব্ ফেটে হিন্দু-মুসলমান দু-জাতেরই কয়েকজনের কালো চামড়ার কিছু কিছু ঝলসে জ্বলে-পুড়ে ইংরেজি সাদা চামড়া হয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি জানায়। আচমকা কোথা থেকে অনেকগুলি লাঠি এসে হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো করে দিতে থাকে মানুষের।

কিছুক্ষণ পরে নাজিমকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিয়ে বস্তির দিকের লোকেরা পিছু হটে পালিয়ে যায়, সংখ্যায় তারা কম ছিল। পুলিশ আসে না কেন, সৈন্য ? রসময় টেলিফোনের যন্ত্রটায় ঝাঁকি মারে, সাড়া পেয়ে ব্যাকুলভাবে আহ্বান জানায়, কিন্তু পুলিশও আসে না, সৈন্যও আসে না।

জবরদস্ত ব্রিটিশ-রাজের সৈন্য-পুলিশের কী হয়েছে ? ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে বন্দেমাতরম্ বললে যারা শুনতে পেয়ে তাকে শায়েস্তা করে !

বহু নিরীহ লোক যখন হতাহত হয়েছে, লুঠপাটের চরম পালা চলছে, সদলবলে এক দল উন্মাদ যখন গিয়ে বস্তিতে সাত-আটটা ঘরে আগুন দিয়েছে, চোরাবাজারে যে পেট্রোলের টানাটানি সেই পেট্রোল রাশি রাশি ঢেলে আগুন দিয়েছে, তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে ট্রাকে চেপে মিলিটারি এল। বস্তি তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

জ্বালানির অভাবে উনান ধরে না, কাঁকর-মেশানো চালটুকু সিদ্ধ করতে হয়রান হয়ে যায় মানুষ, নানির রাস্তায় কুড়োনো গোবরের ঘুঁটে চড়া দামে বিকোয়, মানুষের এখানে মাথা-গোঁজার ঘর-জ্বালানো আগুন আকাশ লাল করে জ্বলছে। এদিকে পূর্বাকাশে যে সূর্য উঠেছে সেই সূর্য পর্যন্ত যেন ম্লান হয়ে গেছে আগুনের আঁচে আর রঙিন আলোয়।

গিরীন সচকিতভাবে গলিতে ঢুকছিল, মাথাটা তার ঘুরে গিয়েছিল অবস্থা দেখে। কাল বিকালে যখন আপিসে গিয়েছিল হত্যা আর অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ সম্পাদনা করে পরিবেশন করার কর্তব্য পালন করতে, আপিসে যখন হানা দিয়েছিল একদল উন্মাদ তখনও সে কি কল্পনা করতে পেরেছিল সকালে বাড়ি ফিরে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। রাত জেগে সাজিয়ে গুছিয়ে একদল দানব আর মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতম খবরগুলি মানুষের এবং মালিকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশনের কর্তব্য পালন করছিল। কাজের টেবিলে পা গুটিয়ে ঘণ্টা তিনেক সে ঘুমিয়েছিল, নানা দুঃস্বপ্ন দেখে তার মধ্যে এভাবে বাড়ি ফেরার ইঙ্গিতও ছিল না। জগতে ধ্বংসের ও সৃষ্টির দ্বন্দ্ব চলুক, তার নিজের পাড়া, তার বাড়ি, তার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বউ-ছেলে-মেয়ে নিরাপদে থাকবে, এটা যেন ধরেই নিয়েছিল গিরীন।

হেই শালা, কাঁহা যাতা ! পাকড়ো !

লালমুখো বীরপুরুষদের রুচি-রীতি বিচার-বিবেচনা গিরীনের জানা ছিল, সে ভয়ানক ভয়ে কাছা বেসামাল হবার ভাব দেখিয়ে রসময়ের বাড়ির পাশের একহাত সরু অন্ধকালিতে ঢুকে যায় এবং মিনিট খানেক পরে গলি থেকে বেরিয়ে লালমুখোদের প্রায় পাশ কাটিয়েই তিনটে বাড়ি পেরিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

কোন পথ দিয়ে এলে, নীলিমা জিজ্ঞাসা করে।

রোজ যে পথে আসি।

নীলিমা গালে হাত দেয়।

কেন, ওদিকের গলিটা দিয়ে ঘুরে এলে হত না ? খানিকটা নয় দেরিই করতে ! ওনারা এসে বীরত্ব দেখাচ্ছেন, যাকে পাচ্ছেন ধরছেন পিটছেন চালান দিচ্ছেন, ওর ভেতর দিয়ে আসবার কী দরকার ছিল ?

গিরীন হেসে বলে, আমায় ঠিক তাড়া করেছিল। আমরা ও সব ট্যাকটিক্স জানি। খবরের কাগজের ঘুঘু আমরা। যাকগে, এদিকে কখন লাগল, কী করে লাগল ? কী নিয়ে ঘটনা শুরু হল ?

ওরে উমেশ, নীলিমা ডাকে, হেড কম্পোজিটরকে ডাক, মস্ত নিউজ, ডবল হেডলাইন হবে, সাব-এডিটরবাবুর নিজের নিউজ !

নীলিমার কাছে মোটামুটি বিবরণ শুনে গিরীন চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ছাদে যায়। ইতিমধ্যে ছাতে অনেকে এসেছে গিয়েছে, চোখ মেলে চারিদিক চেয়ে দেখেছে, মণি সেই যে ছাদের কোণে আলসে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে নড়েনি। বেলা বেড়ে বেড়ে রোদ কড়া হয়েছে, ঘামে গরমে সে সিদ্ধ হচ্ছে, তবু ঠায় দাঁড়িয়ে সে চোখ পেতে রেখেছে পথে, তাকিয়ে থেকেছে আগুন-ধরা বস্তির দিকে।

গিরীন কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভিতরের প্রচণ্ড আলোড়ন তার মুখখানা যেন বদলে দিয়েছে একেবারে।

দেখুন কাণ্ড, তপ্ত খোলায় ছিলাম আগুনে এসে পড়লাম। কোথাও কি মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না ? কী আরম্ভ হয়েছে এ সব ? দেশসুদ্ধ লোক কি পাগল হয়ে গেল ?

উপায় কী বলুন ? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।

অল্প কয়েকদিনেই মণি এ সব কথার মর্ম খানিক বুঝতে শিখেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে, কী ভয়ানক !

ভয়ানক তো বটেই। যারা রাজত্ব করে, রাজত্ব যেতে বসলে তারা ভয়ানক কাণ্ডই জুড়ে দেয়। রাজত্বের লোভ চরমে উঠে গেছে, শেষ অবস্থার বিকার কিনা !

আচ্ছা, হিন্দু মুসলমান একটা আপস করে ফেলে না কেন ? দেশের লোকের দল তো দুটোই, এটুকু কি বোঝে না নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা হলেই সব হাঙ্গামা চুকে যায় ? দেশটা বাঁচে ?

গিরীন মনে মনেও হাসে না। এই সরল ব্যাকুল প্রশ্নের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এ শুধু মণির একার প্রশ্ন নয়। কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ বন্ধু রাজনীতির জট খুলতে খুলতে হয়রান হয়ে আন্তরিক আপশোশে এই সহজ কথাটায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ! আপস মীমাংসার কত ভিত্তিই তো রয়েছে, সাধারণ মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে পর্যন্ত সে ভিত্তি খুঁজে পায়। অথচ মীমাংসা কিছুতেই হয় না।

সাধারণ লোকের কাছে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সত্যই বেখাপ্পা, উদ্ভট, অর্থহীন। জগতের সেরা পাকা খেলোয়াড় কোন চোখ রাখে জনসাধারণের দিকে, কোন চোখ রাখে কংগ্রেস আর লিগের দিকে, কার দিকে কোন হাত বাড়ায়, কী খেলা খেলে, কী চাল চালে—এ জটিল ব্যাপার বোঝা সহজ নয়। সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে কংগ্রেস আমার বা লিগ আমার,—এ জগতে কে একান্তভাবে কার, জানা যেন এতই সহজ !

কেন মীমাংসা হয় না, দেশটা বাঁচে না ? মণির মুখে অসহায় মানুষের হাজার হাজার বার আওড়ানো এ প্রশ্ন তাকে পর্যন্ত যেন আজ বিচলিত করে। আশ্চর্য হয়ে গিরীন আজ প্রথম টের পায় এটা আসলে প্রশ্ন নয়, এ শুধু হৃদয়াবেগ !

চাওয়ার জোরে ভাবের মন্ত্রে রাম-রহিমের মিলন ঘটাবার অফুরন্ত ব্যাকুলতা।

আপস যদি হবে, ব্রিটিশ আছে কেন ?

ওটাই তো আমি বুঝতে পারি না গিরীনবাবু। সংসারে দুজনের যদি একটি বড়ো শত্রু থাকে ওই শত্রুর জন্যই তাদের মিল হয়, এমনি যতই ঝগড়া-ঝাঁটি থাক। এ দেখছি ঠিক উলটো ব্যাপার, আসল শত্রু কোথায়—নিজেদের মধ্যে শত্রুতা !

কীসের শত্রু ? ব্রিটিশের শত্রু তো নয় !

নয় ? ব্রিটিশ-রাজের শত্রু নয় কংগ্রেস লিগ ?

না। বিপক্ষ। শত্রু যদি হত, আপনার সংসারের ওই নিয়মটাও খাটত, একজোট হয়ে যেত। ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে, কখনও শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরেজের ভরসা। চারিদিকে লাখ লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌসেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন—

সন্ধ্যার বৈঠকে এ সব কথা মণি শুনেছে, অতদূর সে এগোতে চায় না, তার ঘরোয়া হিসাব গুলিয়ে যায়।

এ মারামারি এখন থামাবে কে ?

দেশের লোক উদ্যোগী হয়ে থামালেই ভালো হত, তা সেটা বোধ হয় হবে না। লক্ষ্মণ সেরকম নয়, আগুন আরও ছড়াচ্ছে। কর্তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা না হলে কিছু হবে মনে হয় না। কে জানে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে অবস্থা ! তবে গরিব বেচারি আপনার আমার দফা নিকেশ হবে সেটা বলে দিতে পারি। স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছুকালের জন্য ঘুচে গেল, যে পথে এত দূর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড়ো জ্বালা ! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক-শো বছর ধরে এ দেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম—তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড়ো খারাপ। শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

গিরীনের রাত-জাগা চোখে নিজের বিহ্বল চোখ রেখে মণি কৃতজ্ঞভাবে বলে, আপনি এমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।

ওদিকে বস্তির জ্বালানির অভাবে কমে-আসা ঝিম-ধরা আগুন, নীচে রাস্তায় সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি ও টহল, মাথার উপরে মেঘহীন আকাশে দীপ্ত সূর্যের খটখটে রোদ, দম-আটকানো গুমোট আর গা-পচানো ঘাম, এর মধ্যে মণির ন্যাকামিতে গিরীন সত্যই চটে যায়। অকারণে মণিকে প্রায় চমকে দিয়ে সে ব্যঙ্গ করে বলে, আমিও আপনার মতোই বোকা-হাঁদা কিনা, পরস্পরের কথা আমরা তাই সহজে বুঝি।

মণিকে সবাই আঘাত করে, সবাই তার ঘরোয়া মেয়েলি মেয়েলি হাবভাব চালচলন আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা তেজ-নম্রতাকে অবজ্ঞা করে, সবাই তার অসীম ঔৎসুক্য অনন্ত জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতাকে ন্যাকামি মনে করে চটে যায়। একমাত্র মণি ছাড়া এ বাড়ির সবাই যেন দেশের ধন-সম্পদ দুঃখ-দারিদ্র্য আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা ধর্ম-মোক্ষ-কাম ইত্যাদির বিলি-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ব্যক্তি, ছেলে-পিলে কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত। এ দেশে ঘরে ঘরে মণি আছে, দু-একটা নয়, লাখ লাখ আছে, এই ক্ষোভে যেন প্রণব থেকে নীলিমার ভাই গোকুল পর্যন্ত, নীলিমা থেকে বাড়ির ঝি দুর্গা পর্যন্ত মনে মনে সর্বদা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে আছে ! রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেহেতু একটা বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেই হেতু এ দেশে মণির মতো মা-বউ-মেয়েমানুষের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ও অন্যায় হয়ে গেছে !

বিদেশি কর্তারা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেনি, শতাব্দীর অনুকারে দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয়রূপী চোখ ঝলসানো আকাশ-প্রদীপ জেলে রেখে ভাঁওতা দিয়ে এসেছে, জীবনের মান নামিয়ে এনেছে একটানা শোষণে, মিলিটারি বুটের লাথি আর জগতের সেরা ব্যবসায়ী মাথার কৌশলে জীবনের রূপান্তর ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে বিংশ শতাব্দীর এই মাঝামাঝি পর্যন্ত—তবু স্নেহাতুর স্নায়বিক কোমলতার পাঁকে আটকে থাকার অপরাধ যেন শুধু মেয়েদের !

মণি থেকে শুরু করে সরল বোকা গ্রাম্য মেয়েদেরও।

তারা অল্পে ব্যাকুল হয়, ন্যাকামি করে, জীবনসংগ্রামের চেয়ে বড়ো করে তুলতে চায় হৃদয়াবেগকে। মণি কী টের পায় না বাস্তবতার নামে যে রুক্ষতা, কঠোরতা হৃদয়হীনতার কলরব উঠেছে চারিদিকে সেটা শুধু গায়ের জ্বালা, ঝাল ঝাড়া—ব্যাহত, আহত মানুষের ! মেয়েরা আজ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ন্যাকামি আর ভাবপ্রবণতার !

এ বাড়িতে সে একা ওই প্রতীকের প্রতিনিধি। নীলিমা তার সগোত্র—মণি জানে। জাতবোনকে না চেনার মতো বোকা সে নয়। নীলিমা শুধু সংযম শিখেছে—ঝোঁক সামলে মানিয়ে চলে। সে যা বলে ফেলে, করে বসে—নীলিমা শুধু সেটা মুখ ফুটে বলে না, কাজে করে না।

ঘরে গিয়ে মণি বিছানায় আশ্রয় নেয়। ভাবে, বিদ্বান বিদুষী ও বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীরা ত্যাগে আদর্শে কর্মে সারাদেশের ভাগ্য নিয়ে যে গৌরবময় জীবন যাপনের অধিকার পেয়েছে, সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ! সংসারে টুকিটাকি কাজ করে স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়েছে, বিয়ের পর স্বামী চাওয়ামাত্র আলিঙ্গান দিয়েছে, রেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে প্রসব করেছে, আবার রেঁধেছে বেড়েছে ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে---তার উচিত হয়নি এ বাড়িতে আসা ! এ বাড়িতে সাময়িকভাবে আশ্রয় লাভের যোগ্যতাও তার নেই, বড়ো বড়ো ব্যাপার কিছুই সে বোঝে না। তার উচিত ছিল, দেশের কোটি কোটি মেয়েছেলে যে রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে শোয়ার ঘরে মুখ গুঁজে আছে তাদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় খোঁজা।

হ্যাঁ, অন্ধকারের জীব সে, অন্ধকারে থাকাই তার উচিত ছিল। বড়ো সে ভুল করেছে এই সচেতন আলোর জগতে এসে—এ আলোতে শুধু তার চোখ ঝলসে যায়, সে অন্ধকার দ্যাখে। এ বাড়িতে সে শুধু পিছনে পড়ে থাকা অবজ্ঞেয় জীব !

নিজেকে এত ছোটো মনে হয় মণির ! গান্ধী জহরলাল সুভাষচন্দ্রের তুলনায় নিজেকে সুশীল যত হেয় যত ছোটো মনে করে তার চেয়েও অনেক বেশি তুচ্ছ, বেশি ছোটো। মহাপুরুষের মহান এই দেশ, তাদের মতো তুচ্ছ অবজ্ঞেয় অগণিত নরনারী কেন এই দেশে বেঁচে আছে ?

ঘণ্টা দুই পরে প্রণব তার ঘরে আসে। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্য মানুষও ঘরে এসেছিল হঠাৎ তার কী হয়েছে খবর জানতে, তাদের মণি গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে একটা আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে বাড়িতে। শুধু বিছানায় শুয়ে পড়ে আর যে ঘরে আসে তাকেই গাল দিয়ে তাড়িয়ে বাড়িতে এ রকম একটা আবর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছে জানলে, বিশেষত পাড়ায় যখন বস্তি পুড়ছে আর ঘরের সামনে মিলিটারি টহল দিচ্ছে, মণি টের পেত এ বাড়িতে অতটা সে তুচ্ছ নয়—অবজ্ঞেয় নয়।

প্রণব বলে, হল কী মণিবউদি ?

মণি বলে, বেরোও আমার ঘর থেকে, দূর হয়ে যাও। ইয়ার্কি করতে এসেছ, না ?

তাড়িয়ে দিলেই অন্যদের মতো প্রণব চলে যাবে না এটা মণিও অবশ্য জানত। বালিশ সরিয়ে নিজে সরে বসে সে প্রণবের বসবার জায়গা করে দেয় ! প্রণব এগিয়ে এসে বিছানার পাশে বসে। বসে গায়ের ঘামে ভেজা ময়লা পাঞ্জাবি আর তার তলার ছেঁড়া গেঞ্জিটা খোলে, দুহাতের তালুতে সমস্ত মুখটা একবার ঘষে মেজে নেয়। তারপব মণির গায়ে হাত দিযে বলে, কই, জ্বর তো হয়নি ? গা তো বেশ ঠান্ডা !

জ্বর হয়েছে কে বলল ?

কেউ বলেনি। শুনলাম তোমার কী যেন হয়েছে, ভয়ানক ছটফট করছ, সবাইকে ধমকাচ্ছ—

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, গিরীন ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। বিষম ভড়কে গেছে বেচারা, দেখলে তোমাব মায়া হবে। খালি বলছে, চটে যাবার মতো কিছু তো বলিনি, উনি কেন এমন চটে গেলেন !

তাই নাকি !

আমিও বুঝতে পারছি না তুমি চটলে কেন।

সে তোমরা বুঝবে না।

তোমার মতো বোকা নই বলে ?

ফোঁস করে উঠতে গিয়ে মণি থেমে যায়। তার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফোটে। প্রণব ছাড়া সোজাসুজি তাকে এ কথা বলার সাহস সত্যই অন্য কারও হত না। ভাবত, খোঁচা দেওয়া হবে !

মণি বলে, দ্যাখো ঠাকুরপো, সবসময় আমায় ছেলেমানুষ বানিয়ো না। গিরীনবাবুর মনমেজাজ বিগড়ে ছিল, এটা আমিও বুঝি। নইলে হঠাৎ আমায় বোকা-হাঁদা বলে বসতেন না। তোমরা ভাবছ আমি শুধু ওই জন্য রাগ করেছি, একটা মানুষের কাছে একটু অপমান পেয়েই খেপে গেছি ! আমি খেপেছি সত্যি, অন্য কারণে খেপেছি, গিরীনবাবুর কথায় নয়। আমার ভেতরটা কীরকম পুড়ে যাচ্ছে জানলে তুমিও বুঝতে অত সামান্য কারণে এ রকম হয় না।

আর একটু বলো। তাহলেই বুঝে নেব।

গিরীনবাবুর দোষ কী ? তোমাদের সবার যা মনোভাব, গিরীনবাবু হঠাৎ সেটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। আমি সব দিক দিয়ে কত বাজে তুচ্ছ মানুষ সেটা আমি জানি না ভেবেছ ? এখানে আসবার আগে জানতাম না সত্যি—তোমরা চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছ।

প্রায় বুঝে ফেলেছি মণিবউদি। তবু, আরেকটু বলবে ?

মণি একটু হাসে।—তুমি সত্যি ভারী চালাক ঠাকুরপো ! এমনভাবে মানুষের মনমেজাজ বুঝে কথা কইতে পার। আরেকটু কী বলব ? সবই তো বললাম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, আমার কী দোষ বলতে পার ? আমার বড়ো আদর্শ নেই, দেশের জন্য কখনও কিছু করিনি, ঘরে বসে স্বাধীনতা চেয়েছি, লড়ায়ে সায় দিয়েছি,—বড়ো জোর গায়ের একটা গয়না ফান্ডে দান করেছি। আমার মনটা নরম, বুকটা ন্যাকামিতে ঠাসা—কিন্তু এ সবের জন্য কি আমি দায়ি ?

দায়ি বইকী। তবে তুমি একা নও, অন্য সকলেও দায়ি। দায়িত্বের হিসাবটা পরে আসবে, তুমি যে সবদিক দিয়ে এত খারাপ, এত তুচ্ছ এটা বুঝি তুমিই হিসাব কষে কষে বার করেছ ?

তোমাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েই বুঝতে পারছি।

সে তুমি যত ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা বোঝ। আমাদের চেয়ে নিজেকে যত খুশি হীন মনে কর। কিন্তু আমরাও যে তোমায় ওই রকম মনে করি এটা ধরে নেওয়া তো তোমার উচিত নয়। এটা তোমার মনগড়া মিথ্যে ধারণা হতে পারে।

তোমাদের ব্যবহারেই সেটা বোঝা যায়।

এবার আমি রাগ করব ! তুমি মিছে অপবাদ দিচ্ছ আমাদের। কে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ? কবে করেছে ? একটা উদাহরণ দাও।

মণি বিব্রত বোধ করে বলে, সে রকম খারাপ ব্যবহার নয়। আমি তা বলিনি। আমায় তোমরা সয়ে চলছ, আমার মান বাঁচিয়ে চলছ, কিন্তু আমায় মানিয়ে নিচ্ছ না, পর করে রেখেছ—

প্রণব মৃদু হেসে বলে, তার মানে আমাদের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না তোমার, এই তো ? তুমি এক রকম, আমরা খানিকটা অন্য রকম, এই তো ? কিন্তু তার মানে দাঁড়াবে কেন যে তোমায় আমরা হীন মনে করি ? তাহলে আমরাও তো ভাবতে পারি, তোমার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। তুমি আমাদের হীন মনে কর !

মণি কথাটা তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করে।

প্রণব আবার বলে, অনেক বিষয়ে মিল খাচ্ছে না, এটা স্বাভাবিক। এ রকম তো হবেই। তুমি এতকাল শুধু ঘরসংসার নিয়ে ছিলে, আমরা বাইরে কাজ করে আসছি, বাইরের সমস্যা নিয়ে ভেবে আসছি। তুমি আমাদের মতো হবে কী করে ? সোজা স্পষ্ট করে বলি, তুমি পিছিয়ে আছ, আমরা খানিকটা এগিয়েছি। এ তো সত্যি কথা।

মণি বলে, আমি কী তা অস্বীকার করেছি ? আমি বলছি, পিছিয়ে থাকাটা কি আমার দোষ ?

প্রণব খুশি হয়ে জোর দিয়ে বলে, আমিও তো তাই বলছি ! দোষটা কি তোমার ? তোমায় তো আমরা দোষী করিনি ! তা যদি করতাম তাহলে নিশ্চয় বলতে পারতে তোমায় অবজ্ঞা করা হয়েছে। তোমায় কেউ দোষ দেয় না, ছোটো ভাবে না, তুমি যেমন তোমাকে তেমনি মনে করে। তোমার ভালোটুকু ভালো, মন্দটুকু মন্দ।

ওটাই তো উদাসীনতা, ওকেই তাচ্ছিল্য করা বলে। যেমনি হই, মানুষ তো আমি, আপন করার চেষ্টা তো করতে হয়। তুমি পিছিয়ে থাক, মর বাঁচ আমাদের বয়ে গেল—এটা অবজ্ঞা নয় ?

প্রণব হেসে বলে, পিছিয়ে আছ কি না, তাই এ রকম মনে হচ্ছে। এও তোমার পিছিয়ে থাকার একটা লক্ষণ ! তোমার জগতে যেমন ছিল, তুমি সবার কাছে সেই রকম ব্যবহার চাও, সেই রকম সম্পর্ক চাও। তাহলে তো মিল খেয়েই যেতে ! ঘরের কোণে থেকে তোমার কতগুলি দুর্বলতা আর সংকীর্ণতা জন্মেছে, মানো তো ?

নিশ্চয় মানি ! কিন্তু—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু সে জন্য তুমি দোষী নও। তুমি চাও তোমার যে দুর্বলতা আছে সেটা নেই ধরে নিয়ে সবাই দেখাক যে তোমাকে কেউ দোষী মনে করে না। এই মিথ্যা অভিমানটাই তোমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা মণিবউদি, বুঝলে ? এই সংকীর্ণতা তোমার সঙ্গে সকলকে মিশ খেতে দিচ্ছে না। নীলিমা দশজনকে নিয়ে সমিতি গড়তে পারে, কাজ করাতে পারে, সভায় দাঁড়িয়ে আজকের সমস্যা কী আর সমাধান কী বুঝিয়ে দিতে পারে—তুমি পার না। তুমি যে পার না অন্যে এটা ধরলেই তোমায় দোষী করা হয়, হেয় ভাবা হয় !

মণি মাথা নেড়ে বলে, তুমি ভুল করছ। তুমি খালি তোমার দিক থেকে দেখছ ব্যাপারটা। আমি কী আর কী নই সে তো মোটামুটি টের পেয়েই গেছি। আমায় তোমরা যা খুশি ভাব না, শুধু আমায় একটু নিজের করে নিলেই কোনো নালিশ থাকত না। তোমরা ধরে নিয়েছ আমি দুদিনের অতিথি, দুদিন পরে যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলব। দেশের কাজে স্বাধীনতার লড়ায়ে আমার কাছে কিছুই আশা করার নেই। তাই দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছ তোমরা আমাকে।

প্রণব বলে, এখন বুঝতে পারছি, আসলে তোমার হয়েছে জ্বালা। তুমি ভাবছ, কী সর্বনাশ, এখানে পালিয়ে এলাম, এখানেও দাঙ্গা ? ভাবতে গিয়ে তোমার সারা জীবনের ক্ষোভটা নাড়া খাচ্ছে, এই বিশ্রী বাস্তব থেকে কি কিছুতে মুক্তি নেই ? কী তুচ্ছ মানুষ, কত অসহায়। জীবনটা কী বিশ্রী ! রাগে অভিমানে তোমার মেজাজটা গিয়েছে বিগড়ে।

যদি গিয়েই থাকে ? আমার রাগ অভিমান হওয়া কি অকারণ ? আমার মেজাজ বিগড়োতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে ?

প্রণব আশ্চর্য হয়ে জবাব দেয়, আছে বইকী। তুমি অকারণে অন্যের উপর রাগ অভিমান করবে কীসের অধিকারে ? মেজাজ খারাপ করে কেন তুমি অন্যকে দোষী বানাবে ?

আমি যদি নিজের মনে—

নিজের মনে ? অভিমান হল তোমার দশজনের ওপর, সেটা নিজের মনে হয় কী করে ? তুমি কি বনে একা আছ—গাছপালার ওপর রাগ করছ ? দশজন তোমার মনের মতো নয় বলেই তো তোমার জ্বালা !

মণি চুপ করে থাকে।

প্রণব গলা পালটে বলে, তুমি কি সুধীনের জন্য ভাবনায় পড়েছ ? ছেলেটা বিগড়ে যাবে, বিপদ-আপদ ঘটবে বলে—?

কী আশ্চর্য ঠাকুরপো, মণি যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ে, এখানে এসে থেকে ছেলেমেয়ের কথা আমার খেয়ালও থাকে না ! সুধীনটা সত্যি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় বলো তো ? কী করে ? ছেলে যদি আমার গোল্লায় যায়, আমি তোমায় দুষবো কিন্তু ! আশাটারও কী হয়েছে দ্যাখো, দু-দণ্ড কাছে থাকে তো আর সারাদিন পাত্তাই নেই। ছেলেমেয়েরা আমায় ত্যাগ করছে না কি ?

তুমিই হয়তো ওদের ত্যাগ করছ। প্রণব হেসে বলে।

সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় দুঃস্বপ্নের মতো, দেহমন যেন ভোঁতা হয়ে আসে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অবসাদে। সন্ধ্যার পর মণির দেহমন এক আশ্চর্য বিশ্রামের সুযোগ পায়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সরস্বতী হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। মণি কলতলায় ছিল, সেইখানে গিয়ে সরস্বতী বমি আরম্ভ করে। চোখের পলকে মণি ভুলে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমনভাবে সে সরস্বতীকে সামলে উঠতে সাহায্য করে, শরীরের এই অবস্থায় বাড়াবাড়ি করার জন্য বকে, বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় যে মনে হয় একটি অসুস্থ মেয়েকে সেবা করার সুযোগের জন্য তার দেহমন যেন অধীর হয়ে ছিল। সুযোগ পেয়ে বর্তে গেছে। পাখার বাতাস করতে করতে মায়ের মতো সে সরস্বতীকে বোঝায় মেয়েছেলের কতটুকু হিসেব না থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।

সময়মতো খাবে না, আগুনের আঁচে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডি রাঁধবে, একটা তোমার বিপদ হতে কতক্ষণ ?

চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই সরস্বতী বলে, কিছু হবে না। আমাদের কিছু হয় না।

ছয়

এমনি সময় সকালে একদিন যতীন আচমকা সুশীলকে ডেকে পাঠাল। তাব আহ্বান নিয়ে একেবারে তার গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়।

মণি বলে, হঠাৎ ডেকে পাঠাল কেন ?

সুশীল বলল, কে জানে। চালের কথা বলব না কি ?

মণি বলল, না এরা চায় না। আমাদের বাহাদুরি করে দরকার ?

অনেক কৌতূহল ও প্রত্যাশা নিয়ে সুশীল লাখপতি বন্ধুর কাছে যায়, অভ্যর্থনা পায় কল্পনাতীত। তাকে বসতে বলে ক্রুদ্ধ গম্ভীর মুখে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে যতীন ঝাঁঝালো গলায় বলে, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক ! এত বড়ো বজ্জাত তুমি ! আমি তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি আমার বিশ হাজার টাকার চাল ধরিয়ে দিলে ?

সুশীলের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। খাঁটি বিবেক হয়তো মানুষকে নির্ভয় করে, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ করেনি বলেই বিবেক কারও খাঁটি হয় না। ধনীর পা ধরে উঠবার চেষ্টায় যে এতকাল কাটাল, ধনী বন্ধুর মিথ্যা সন্দেহে অবিচলিত থাকার সাহস সে কোথায় পাবে ?

সুশীল সভয়ে বলে, আমি তো কিছুই জানিনে ভাই !

দ্যাখো, আমরাও ভাত খাই। শুধু ভাত খাই না, চোরা-বাজারে চাল বেচে ভাত খাই !

সুশীল আরও ব্যাকুল হয়ে কাতরভাবে বলে—কী বলছ তুমি ? আমাকে বিশ্বাস কর না ?

যতীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।—সারাবছর তোমার টিকিটি দেখতে পাইনি, হঠাৎ তুমি উদয় হলে দু-মন চালের জন্য। আমার কাছে কেউ দু-মন চালের জন্য আসে ? তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, ছুতো করে গুদোম দেখে রাশিয়ার এজেন্টগুলোকে লেলিয়ে দেবার মতলবে তুমি এসেছ। লেখাপড়া শিখেছ, কলেজে পড়াও, এমন বিশ্বাসঘাতক বজ্জাত স্পাই তুমি হতে পার কে তা ভেবেছিল। আমি বরং মনে মনে হেসে ভেবেছিলাম, তেমনি হাবাগোবা ভালো মানুষটিই রয়ে গেছ তুমি !

এ রকম চাঁছাপোঁছা গালাগালি সুশীলের সহ্য হয় না, ক্ষোভে অপমানে তার মুখ বাদামি হয়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে একটু মার্জিতভাবে গম্ভীর অবজ্ঞার সঙ্গে এই একই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা প্রকাশ

করে যতীন তাকে কেবল মর্মাহত নয় একেবারে মরমে মেরে ফেলতে পারত। চোরাকারবারিদের বাড়াবাড়িতে খেপে গিয়ে পাড়ার লোক যা করেছে তার সঙ্গে সুশীলের সত্যই যে কোনো সংশ্রব ছিল না, তার চোরা-চালের গুদাম ধরিয়ে দিতে গুদামের একটা নেংটি ইঁদুরের ভূমিকাটুকুও যে সত্যই সে নেয়নি, কিছুই তাতে আসত যেত না। এত দিন কিছুই হয়নি, আচমকা সে সামান্য চালের খোঁজে উদয় হবার পরেই তার বিশ হাজার টাকার চাল ধরা পড়ে গেছে বলে যতীন তাকে সন্দেহ করে, এতেই তার আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা শুরু হয়ে যেত। তারও তো সেই যুক্তিসর্বস্ব মন যাতে প্রকৃত সত্যমিথ্যার চেয়ে যুক্তিটাই বড়ো। নীতিগত বিচারে তার দোষ না থাক, ওই নীতিটাই যে এখন যতীনের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে !

তার মুখ দেখে যতীন সুখ পায়। সে আবার বলে, ছি ! ছি ! কত বড়ো নীচ কত বড়ো ছ্যাঁচোড় হলে বন্ধুর সঙ্গে এমন করতে পারে !

এবার আর সইতে না পেরে সুশীল চশমা খুলে হাতে নিয়ে মাথায় একটা ঝাঁকি দেয়—ক্লাসে ছেলেদের বে-আইনি বেয়াদপিতে মেরুদণ্ড জ্বলে গেলে এমনিভাবে আগে চোখের চাশমাটি সামলে ক্রোধ প্রকাশ করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তুমি চাষা বনে গেছ যতীন ! তুমি ছোটোলোক হয়ে গেছ !

সুশীলের ভাবান্তর দেখে যতীন সত্যই একটু ভড়কে গিয়েছিল ! টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে যদি ছুঁড়েই মারে ? সে একটু নরম সুরে বলে, তুমি কী বলতে চাও ?

নিশ্চয় বলতে চাই, একশোবার বলতে চাই আমার কোনো দোষ নেই, আমি কিছুই করিনি। একবার শুনতে হয় তো আমার কথাটা ? এমন কি হতে পারে না যে অ্যাকসিডেন্টালি আমি ঠিক এই সময়ে চালের জন্য এসেছি, তোমার গুদোমের খবর আগেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল ? কিছুই না জেনেশুনে এমন অভদ্রের মতো তুমি আমায় গালাগালি দেবে !

এ প্রায় মেয়েলি অভিমান। যতীন মজা পায়। আরও একটু নরম সুরে বলে, তা হতে পারে, তুমি ইচ্ছে করে হয়তো করনি। কোথায় চাল পেয়েছ বলে বেড়িয়েছিলে তো ?

না। কাউকে বলিনি।

না, মিছে কথা, মণিকে সে সবকথাই বলেছে, চালের গুদাম যে গলিতে তার নামটা পর্যন্ত ! কিন্তু মণি তো 'কেউ' নয়, সে ধর্মপত্নী। মুখে যাই বলুক, মনে সুশীলের খটকা লেগেছে। বেশ একটা তোলপাড় উঠেছে। মণিই কি তবে বলে বেড়িয়েছে খবরটা ? অথবা হয়তো মণির কোনো দোষ নেই, নিজে থেকে সে কিছুই ফাঁস করেনি, প্রণবেরা কৌশলে তার কাছে সব জেনে নিয়েছে যে এ বাজারে এত চাল সুশীল কোথায় বাগাল ? ওদের অসাধ্য কিছু নেই। পরের আধঘণ্টা সময় এই সিদ্ধান্তটাই তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রায় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়।

এদিকে যতীন কিন্তু কেমন নরম হয়ে গেছে। যেমন হঠাৎ বন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ যেন সে বিশ্বাস করে বসেছে তার কোনো দোষ নেই। তাই বলে ক্ষমা কি চায় যতীন, দুঃখ প্রকাশ করে ? ও সব তার জবরদস্ত লোকের জন্য, বড়ো নেতা লাট-বেলাটের জন্য তোলা থাকে। তাদের গাল দেওয়া তো দূরে থাক, কড়া কথা বলার স্বপ্নও অবশ্য দ্যাখে না যতীন। সুশীলের মতো যে সব মানুষকে সে খুশি হলে জুতো মারে, ভুল করে জুতো মারার জন্য তাদের কাছে অনুতপ্ত হওয়া তার ধাতে নেই।

সে করে কী, চা আর খাবার আনতে হুকুম দেয়। তাতেই গলে জল হয়ে যায় সুশীল। খাবার খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একাগ্র গভীর চিন্তায় মুখ-চোখ কুঁচকে বলে, দ্যাখো যতীন, একটা কথা ভাবছি। যে রিকশায় চাল নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রিক্‌শাওয়ালাটা হয়তো বজ্জাতি করেছে।

যতীন মুচকে হাসে।

সস্তা সিরিজের ডিটেক্‌টিভ বই পড়ো বুঝি খুব ?

মোটেই না।

সুশীল আহত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তবে ধন ও শক্তির মালিকদের আঘাতে আহত হওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। অল্পেই সামলে নিয়ে বলে, খুব বেশি রকম ক্ষতি হয়েছে ভাই ?

যতীন নাক সিঁটকে বলে, বিশ-বাইশ হাজারের মাল গেছে, বয়ে গেছে। গুদোমটা গিয়ে অসুবিধা হল। কী আর হবে, ঠিক করে নেব সব।

তোমার তো কোনো ভয় নেই ? তোমাকে তো ধরবে না ? এই কথাটা ভেবেই আমার এমন খারাপ লাগছে। তোমায় যদি অ্যারেস্ট করে, জেলে দেয়—

কে অ্যারেস্ট করবে ? কে জেলে দেবে ?

তাই বলছিলাম। সুশীল হঠাৎ বোকার মতো হাসে !

যতীন বলে অন্য কথা।

প্রণব আজকাল কী করছে ? সিনেমায় গিয়েছে শুনলাম ? ডিরেক্ট করে না অ্যাকটিং করে ?

কিছুই করে না। আড্ডা মেরে বেড়ায়।

বাড়িতেই তো ওর বিরাট আড্ডা। কংগ্রেস-লিগকে দিয়ে কিছু হবে না, ইংরেজকে মেরে তাড়াও, চোরাবাজারিদের ফাঁসি দাও—

মাঝে মাঝে ও সব কথা বলে, বেশির ভাগ কথা হয় দেশের কুলিমজুর চাষাভুসা নিয়ে। কী যে ওরা বলাবলি করে আমি ভালো বুঝিনে।

দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না।

ওটা রোজ বলে।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাসা-ভাসা আলাপ চলে। সুশীল মনে একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে। যতীনের অবিশ্বাস যে দূর হয়েছে, এতেও কেমন যেন সুখ পায় না। বিদায় দেবার সময় যতীন বলেছে, কাল-পরশু আরেকবার এসো।

মণিকে সব কথা খুলে বলতে সাহস হয় না, অনেক কথাই গোপন করে যায়। মোটামুটি বিবরণ শুনে সুশীলের প্রশ্নের জবাবে মণি বলে, আমি ? কেন বলতে যাব ? ও সব কথাই তোলেনি কেউ ! তবে—

চিন্তায় মুখ কালো হয়ে আসে মণির—দাঁড়াও, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করছি।

না না, সর্বনাশ !

তুমি থামো। আর যাই হোক, ঠাকুরপো মিছে কথা কইবে না।

প্রণবকে সে বলে, ঠাকুরপো, ওই যে চাল আনিয়েছিলাম, কে দিল, কোন ঠিকানা থেকে এল, এ সব জানতে চাওনি। কিন্তু রিক্‌শাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে বা অন্য রকম খোঁজ নিয়ে তোমরা কি চালের গুদাম ধরিয়ে দিয়েছ ?

কানাই দত্ত লেনেব ব্যাপারটার কথা বলছ ? আমরা কিছুই করিনি। আমি কাগজে পড়ে প্রথমে জেনেছি। কিন্তু কেন বলো তো ? তোমাদের শেয়ার ছিল নাকি ?

বাজে বোকো না। উনি যেদিন চাল আনলেন, পরদিন গুদামটা ধরা পড়ল। ওঁর বন্ধু ওঁকে সন্দেহ করছে।

সন্দেহ করাই ওদের বাতিক। জগৎসুদ্ধ লোককে শত্রু ভাবতে হয়, তাই বন্ধুকেও সন্দেহ না করে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোকের ক্ষতিটা হল কোথায় ?

ক্ষতি হয়নি ?

কীসের ক্ষতি ? একটা দলিল বাগিয়ে নিয়েছে, সব ঝঞ্ঝাট ফুরিয়ে গেছে। কিছু বেআইনি কাজ হয়নি, অনেকদিন থেকে ওখানে প্রকাশ্যভাবে আইনসঙ্গতভাবে ওর চালের গুদাম। চালের মস্ত এজেন্ট তো। ঘুষ-টুষ দিতে অবশ্য কিছু খসে থাকতে পারে, সে সব ওদের গায়ে লাগে না।

সুশীল শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে, ব্যাপার মিটে গেছে ?

গেছে বইকী। চোরা গুদাম কাগজপত্রে খাঁটি করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

তার মৃদু কথা এমন ঝাঁঝালো শোনায় যে সুশীল অপরাধীর মতো উশখুশ করে। মণি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, এবার বুঝতে পারছি ঠাকুরপো, পেটের জন্য সবার সঙ্গে ব্ল্যাক মার্কেটে চাল কেনার সঙ্গে সেই ক-মন চাল আনার তফাত কী ছিল।

প্রণব সায় দিয়ে বলে, বুঝতে চাইলে আজকাল অনেক কিছুই বোঝা যায়। আগে তবু অনেক পাপ অনেক অন্যায়ের একটা নীতিধর্মের লোকদেখানো কোটিং থাকত, আজকাল স্পষ্ট উলঙ্গভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এ হল ফ্যাসিস্ট ধর্মের প্রভাব। অনেক কিছুই এখন শুধু ফাঁকি দিয়ে ধোঁকা দিয়ে করতে হয় না, গায়ের জোরে দাবড়ানি দিয়ে করে নেওয়া যায়।

এ সব কথা সুশীলের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। মণি কিছু কিছু বুঝতে পারে তার আজকালের চিন্তা আর অনুভূতির গভীরতা দিয়ে।

অন্যায়ের নগ্ন রূপ ? জীবনের আড়াল করা আর উলঙ্গ ব্যাভিচার ? তা ঠিক। এমনভাবে মুখোশ খুলে লোভ হিংসা অনাচার অবিচার বীভৎসরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে, এমন বর্বর চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভক্তিভাজন মানুষেরও যে নিজের সমস্ত বিশ্বাস আর ধারণা সম্পর্কে নিজেরই মনে খট্‌কা লেগে যায় ! কীসে কী হয়, কেন কী হয়, ভালো করে না বুঝেও এই কথাটা বড়ো হয়ে উঠেছে, এত যে বড়ো বড়ো বিশ্বাস আর বদ্ধমূল ধারণা চোখের সামনে ভেঙে পড়তে দেখা গেল, অন্য সব ধারণা বিশ্বাসগুলিও যে সেই পর্যায়ের নয়, কে বলতে পারে ?

আশা আর ভরসা, এই তো সম্বল ছিল। অপ্রাপ্যের আবর্জনায় ভরে উঠে নোংরা হয়ে উঠেছে জীবন, লক্ষবার আত্মহত্যা ঘটেছে আশার, তবু শেষ পর্যন্ত এইটুকু ভরসা ছিল যে, যেটুকু আছে যেটুকু পাওয়া যাবে ততটুকু আজও রইল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই অবলম্বনও শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই অনিশ্চিত, অন্ধকার। প্রচণ্ড দুঃখ দুর্ভোগ ক্রমাগত নাড়া দিয়ে দিয়েই যেন শুধু আজ সচেতন করে রাখতে পারে, তুমি মানুষ, তুমি জীবন্ত মানুষ—তোমার প্রাণ-ধারণটাই তোমার বিচিত্র জীবন ! দুর্ভোগের মধ্যে ডুবে থেকেই যেন নতুন করে আবার সব জানতে বুঝতে সাধ যায়।

তাই, পরদিন আবার যতীনের কাছ থেকে ঘুরে এসে সুশীল যখন একটা সুসংবাদ দেয় যে যতীন তাদের একেবারে নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে বলেছে, তখন প্রথমটা আগ্রহে প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেও পরক্ষণে মণি ঝিমিয়ে যায়।

বলে, থাক গে। আজ এখানে কাল ওখানে আর ছুটোছুটি করতে পারি না। কত পালিয়ে বেড়াব ?

এই বিপদের মধ্যে থাকবে ?

অ্যাদ্দিন তো আছি ? আর সবাই তো থাকবে ?

সে উপায় ছিল না বলে, কী করব। ভালো পাড়ায় গিয়ে থাকার সুযোগ যখন পাচ্ছি, কেন যাব না ?

দুজনের কলহ বেধে যায়, নতুন রকমের কলহ। ঝগড়াঝাঁটি তাদের আগেও হয়েছে, এমন জোরালোও হয়েছে যে একবেলা খাওয়া বন্ধ কথা বন্ধও ঘটেছে তার ফলে। নিরীহ এবং মণির একান্ত বশংবদ হলেও দাম্পত্য কলহে সুশীলকে অপটু দেখা যায়নি। আজ একটা নতুন তীব্রতা, নতুন

তিক্ততা দেখা দেয় তাদের মতান্তরে। এতদিন যত মতবিরোধ ঘটেছে সব ছিল একাভিমুখী দুটি মতের তুচ্ছ অমিল, দুটি মতেই তারা এবং তাদের সংসারটাই বড়ো, দুটি মতেই কাজ হয়, শুধু কারটা খাটবে বেছে নেবার ঝগড়া। আজ যেন দু মুখী মনের বিপরীত স্বার্থের সংঘাত বেধেছে তাদের মধ্যে, ঘরোয়া সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে ভেদ।

সুশীলের মতো মানুষ সে যেন গালাগালি দেবার ভঙ্গিতে বলে, মাথা বিগড়ে গেছে তোমার, শয়তানি কুবুদ্ধি ঢুকেছে মাথায় ! বুড়ো বয়সে ঢং শিখেছ !

তীব্র জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে মণি ঝেঁঝে বলে, ভীরু কাপুরুষ অপদার্থ তুমি, তুমি ঢং দেখবে না ? মানুষ তো নও, কত কী তুমি দেখবে !

যতীন বালিগঞ্জে ছোটো একটি ফ্ল্যাট তাদের দিতে চেয়েছে এ সৌভাগ্য একদিন তাদের উল্লসিত করে দিত, জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকত না, আজ ওই নিয়েই পরস্পরকে তারা প্রথম ঘৃণার আঘাত হানল, ফাটল ধরে আলগা হয়ে গেল এতদিনের সম্পর্কের ভিত্তি।

ভোলানাথের বৈঠকখানাটি প্রথমে স্থির করা হলেও এ বাড়িটিই পাড়ার শান্তি কমিটি গড়াব আসল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই প্রতিবাদে সুবোধ সিংহদের ইঙ্গিতে একদিন রাত তিনটেব সময় গুন্ডা দলের হানা দেবার চেষ্টা হয় ! ইতিমধ্যে শান্তি কমিটি অনেকটা সুগঠিতভাবে গড়ে না উঠলে সেদিন সত্যই বিপদ ঘটতে পারত।

এই আক্রমণের সুযোগে পরদিন সকালে সুশীল অনেকটা নরম সুরে মণির কাছে আবার বালিগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার আবেদন জানায়। সত্যই আবেদন জানায়। চিবদিন যেমন জানিয়েছে।

আমি যাব না। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার।

আমি যাব না, তুমি যেতে পার ! এমন অনায়াসে মণি যে এমন কথা বলতে পারে কে কল্পনা করেছিল ? শুধু কথা শুনে নয়, মণির চোখ মুখ দেখে মনে হয় সে যেন মায়া-মমতা ভুলে গেছে।

শহরের অসংখ্য মানুষের রসুইঘর নেই, একটি উনান জ্বালাবার ঠাঁই নেই, রান্না করে খাবার সম্বল বা সময় নেই। মেস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, চা-খানা, খাবারেব দোকান, চিঁড়েমুড়ির দোকান থেকে আরম্ভ করে ফলমূল ছাতু-লংকার ফিরিওলা পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহের বিচিত্র ব্যবস্থা। শখের বা শখ-ধর্মী প্রয়োজনের সায়েবি খানা যে প্রকাণ্ড ঝকঝকে হোটেলগুলিতে, তাবই সামনা-সামনি রাস্তার অপরদিকে ময়দানের গাছতলায় হয়তো একজন বসেছে ছাতুব ধামা নিয়ে। তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে ও সস্তায় পেট ভরাবে গরিব মানুষ। মাজায় ঘষায় ঝকঝকে পিতল কাঁসার থালায় ছাতু মেপে নিয়ে জল দিয়ে মেখে ক্ষুধার্ত মানুষটা পেটে চালান করে দিল, তারপর মুখে ঢালল এক ঘটি জল।

থালাটি ছাতুওলার, জলও সেই দেয়।

মানুষ এভাবে ছাতু খায় এটা হয়তো জীবনে কোনোদিন চোখেও পড়ত না মণির, যদি না ময়দানের পাশে ট্রাম লাইনের ধারে গাছতলায় উবু হয়ে বসে গোকুলকে ওভাবে সে ছাতু খেতে দেখত। নীলিমার ভাই গোকুল। রিক্‌শাওলা বা ঠেলাগাড়িওলা বা ফিরিওলাদের সঙ্গে গাছতলায় সে ছাতু খায় !

বাড়িতে দম আটকে আসায় মণি হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। সুশীলের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ঝগড়ার পরে এবং কোথায় যাবে কী করবে না জেনে। শুধু পরনের সাধারণ কাপড়টা বদলে ফেলেছিল আর পাঁচ টাকার একটা নোট ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। বাড়ির বাইরে দুদণ্ডের মুক্তি এবং শান্তি খোঁজার এমন অন্ধ তাগিদ জীবনে তার এই প্রথম এল। অনেকদিন আগে এ বাড়ি

থেকে আরেকবার সে পালিয়েছিল, চিরতরে পালিয়েছিল, এই সুশীলকেই বগলদাবা করে। আজ একলা কোথায় যাবে ? ট্রাম চলেছে, ট্রামেই উঠে বসা যাক। ট্রামটাতেই না হয় একটা চক্র দিয়ে ঘুরে এসে ফের এখানে নামবে।

আপিসগামী যাত্রীতে ট্রাম ভরা। মেয়েদের রিজার্ভ সিট থেকে দুজন বৃদ্ধকে উঠিয়ে নিজে সেখানে বসে আনমনে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা ভেসে উঠে মনের মধ্যে রূপ নিতে থাকে। তার পরিত্যক্ত ছোটো বাড়িতে ফিরে গেলে কেমন হয় ? থাক সেখানে কারফিউ আর গোপন ছোরা, আতঙ্কে ভরাট হয়ে থাক দিন ও রাত্রি। তবু সেখানে সে ধাতস্থ ছিল, নিজের ভেতর থেকে নিজে এ রকম ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে বসেনি। সেখানে থাকার সময় সুশীল যদি যতীনের দয়ায় বালিগঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবার ব্যবস্থা করত, কত খুশিই না সে হত ? মনে মনে যতীনকে কৃতজ্ঞতার কত অর্ঘ্যই না জানাত—ঠিক করে ফেলত যে শীঘ্রই একদিন বেড়াতে গিয়ে যতীনের স্ত্রীকে আপ্যায়িত করে আসাটা বিশেষ জরুরি কর্তব্য ! কী অদ্ভুত পাগলামিতে তাকে পেয়েছে যে এমন একটা সুবিবেচনার প্রস্তাব করায় সুশীলকে সে যা মুখে এল বলে বসল ? একবার নয়, দুবার ? পাড়ার অবস্থাটা দেখে এলে কেমন হয়, তার নিজের বাড়ি যে পাড়ায়, কুক্ষণে যেখান থেকে প্রাণের ভয়ে সে প্রণবের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে ? এখন যাবে ? একা ? অন্তত কাছাকাছি যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে বুঝে আসবে হাঙ্গামা কমেছে কিনা, ফিরে যাওয়া যায় কিনা ?

এই ভাবনার মধ্যে ছাতু খাওয়ায় রত গোকুলকে দেখে ট্রাম থেকে সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

শহরে কারা রাঁধে আর কারা পথে-ঘাটে খাবার কুড়িয়ে খায়, প্রকাণ্ড হোটেলের প্রায় সামনেই কেমন সস্তায় সহজে ছাতু খাবার ব্যবস্থা থাকে, এ সব বর্ণনা গোকুল তাকে শোনায়। নিজেই শোনায়, জল খেয়ে কোঁচায় মুখ-হাত মোছে, ভূমিকাও করে না। মণি যে একা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এতে যেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই, খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

ছাতু খুব পুষ্টিকর জিনিস। একদিন খেয়ে দেখবেন।

আর কিছু পুষ্টিকর নেই ?

বেশি পয়সা লাগে। গাঁটে পয়সা কম থাকলে সস্তায় পুষ্টি চাই তো।

সকালে খেয়ে বেরোলে হত।

অত ভোরে কী খাব ?

কত ভোরে বেরোও ? রাত থাকতে ?

না, ভোরেই বেরোই। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

কেন ?

ছেলে পড়াই, দু-জায়গায় দুজনকে। একজনকে ছ-টায় পড়ানো শুরু করতে হয়, নইলে সময় কুলোয় না।

ছেলে পড়িয়ে দশটা নাগাদ এখানে এসে ছাতু খাও ? ছাতু খেয়ে যাও কোথায় ? তোমাকে কিন্তু আমি দশটা-এগারোটার সময় বাড়িতে দেখেছি মনে পড়ছে—

কথাটা বলে মণি ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে। গোকুল বাড়িতে থাকে, নীলিমার সে ভাই। এতদিন এক বাড়িতে বাস করেও তেইশ-চব্বিশ বছরের জলজ্যান্ত এই ঢেঙ্গা ছেলেটা কখন বাড়িতে থাকে, কখন বেরিয়ে যায়, কী করে, কিছুই সে সত্যই খেয়াল করেনি।

গোকুল হেসে বলে, রোজ এখানে ছাতু খাই না, ছেলে পড়িয়ে বাড়ি ফিরি ! আজ অন্য একটা কাজ আছে তাই। আপনি কোথায় যাবেন ?

আমি ? আমি যাব রাজাপাড়া লেন। আমাদের আগের বাড়িটা দেখে আসব ভাবছি।

ও পাড়ায় একা যাবেন ?

কেন ? একা গেলে কী হবে ? পাড়ার খবর জানো নাকি ? এখনও গোলমাল চলছে ? আচমকা বাড়ি ছেড়ে এলাম, ভাবছিলাম গিয়ে দেখে আসি—

গোকুল ধীরে ধীরে শার্টের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট বার করে ধরায়, একটিবার ক্ষণেকের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মণির মুখখানা দেখে নেয়। বলে, শুনেছি ওদিকে হাঙ্গামা চলছে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বরং খবর নিয়ে ওবেলা আপনাকে জানাব। আপনি বাড়ি ফিরে যান।

তাহলে তো ভালোই হয়। মণি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে।

পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তারপর এত জোরে এসপ্ল্যানেডের দিকে পা চালায় যে বেশ বোঝা যায়, মণির সঙ্গে কথায় তার জরুরি কাজের সময় নষ্ট হয়েছে। কথা বলার সময় কিন্তু মণি সেটা টেরও পায়নি।

প্রণবের কাছে পেয়েছে বোধ হয় গুণটা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রণব মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন আর কোনো কাজই তার আপাতত নেই !

বাড়ি ফিরে নীলিমাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনার ভাই কী করে ?

অসময়ে এই আকস্মিক প্রশ্নে নীলিমা একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, কত কিছু করে। ছেলে পড়ায়, কবিতা লেখে, খবরের কাগজে লেখে, মজুর উসকায়—

জবাব শুনে নীলিমা তামাশা করছে ভেবে মণি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এদের সঙ্গে নিজের অমিলটা আরও স্পষ্ট অনুভব করে মুখ ফিরিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, নীলিমা কোথা থেকে একটি লম্বাটে আকারের হালকা বই তার হাতে দিয়ে বলে, ওর লেখা কবিতা।

গোকুল তবে সত্যই কবিতা লেখে ? কবিতার ছাপানো বই পর্যন্ত তার আছে ? ঘরে গিয়ে বিছানার বসে পাতা উলটোতে প্রথমেই পৃষ্ঠার মাঝামাঝি ছোটো হরফে নামহীন ক-লাইন কবিতা তার চোখে পড়ে। উৎসর্গ বা ভূমিকা হবে—কবিতার বইয়ে বোধ হয এই রকম ভূমিকা লেখা রীতি।

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা পড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার
দখল করেছি ভবিষ্যৎ।
এ প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু-পরোয়ানা।
দুটো দিন বাকি আছে,
থাক,
পড়ো না ঘোষণা।

পড়ে মানে যে মণি ভালো বুঝতে পারে তা নয়, মৃদু অস্পষ্ট একটা আতঙ্ক অনুভব করে। জাপানি বোমা বা দাঙ্গার আতঙ্কের মতো নয়। এই আতঙ্কের স্থান যেন হৃদয়ের অন্য স্থানে, সমস্ত অনুভূতির একেবারে মূলে।

এত বড়ো শহরের জীবনযাত্রা যখন বেশি দিনের জন্য পঙ্গু ও ব্যাহত হয়, যুদ্ধ-বিপ্লব বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা অন্য যে কারণেই হোক, সেই ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার মারাত্মক

অস্বাভাবিকতার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মরীতি গড়ে ওঠে। কোন এলাকা কার পক্ষে কতখানি নিরাপদ বা বিপজ্জনক, কোন পথে দিবারাত্রির কখন যাতায়াত চলে, কখন চলে না, এ সব মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলে মানুষ। উন্মাদ ও গুন্ডাদের রক্তপিপাসাকে এড়িয়ে চলার দু-একটা কৌশলও শিখে ফেলে। তেমন দরকাব হলে সাজ-পোশাকের অদল-বদল ঘটিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটির ভেতর থেকেও যে ঘুরে আসা চলে দুঃসাহসী কর্মী বা সাংবাদিক দু-চারজন এটা হাতেনাতে প্রমাণ করেই দেয়। ধর্ম যেন উভয় পক্ষেই নিছক পোশাকি চরমতায় উঠে গেছে। সায়েবি পোশাকে তবু খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে, গুন্ডারা মাঝে মাঝে যাচাই করে নেবার চেষ্টা করে, কী নাম কী দরকার কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তুমি যে হিন্দু কিংবা তুমি যে মুসলমান বাইরে তার একটা চিহ্নধারণ করে, একটা গান্ধী টুপি বা ফেজ মাথায় চাপিয়ে, হত্যার জন্য উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দু বা মুসলমান-পাড়ায় তুমি অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পাব। গুন্ডারা বিরক্ত করতে সাহস পাবে না। গুন্ডারাও তো জানে তারা কীসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, এমন আশাতীত নরকে পরিণত করে রাখতে পেরেছে শহরটাকে !

যে পথে সম্ভব যতক্ষণ সম্ভব ট্রাম বাস গাড়ি আর পদাতিক মানুষ চলাচল করে, বাজার বসে, দোকানে বেচাকেনা হয়, আপিস চলে, কারখানা চলে, সিনেমা চলে, রেডিয়ো বাজে, বস্তিতে বস্তিতে মানুষ বাঁচে আর অভিশাপ দেয়, ফুটপাতে ঘুমানোব লোকদের পর্যন্ত ফুটপাতে ঘুমোতে দেখা যায়। বিরাট মহানগরীর বিপুল জনসাধারণ দাঙ্গাকে সয়ে চলেছে, কিন্তু জীবনকে সস্তা হতে দেয়নি ! এই তো সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরে গেল হিন্দু-মুসলমানের বাংলায়, শহরের অলিতে-গলিতে মরা ইঁদুরের চেয়ে অগুনতি মানুষ চোরাকারবাবির লোভ আর লাভের অস্ত্রে খুন হয়ে পড়ে ছিল, পচেছিল। ওটা জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে, সকলের অন্ন আর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি হাতে পাওয়ার জন্যই যুগ-যুগ ধরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আনন্দ বেদনা বিশ্বাস ও আবেগ পর্যন্ত বশীকরণের ওষুধ মিশিয়ে কর্তারা পরিবেশন করে এসেছে। দুর্ভিক্ষ দিয়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষকে হত্যা করা হল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে, ওটা হল কৌশলে হত্যা করা। কৌশলটা ধরি-ধরি করেও সাধারণ মানুষ ধরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে রাজপথে ছোরা মেরে হত্যা চলতে দেবার অসঙ্গতি জনসাধারণ অনুভব করে। তাই এ রকম হত্যা ঠিক যতটুকু চলতে দিয়েও মোটামুটি বাঁচা যায় শুধু ততটুকু হত্যাই শহরে সম্ভব হয়েছে।

রাজাপাড়া লেনের মধ্যে আটকা পড়ে গোকুলের তাই আত্মরক্ষায় দুঃসাহসিক প্রেরণা জাগে। মণিদের বাড়ির সংবাদ নিতে এদিকে এসেছে, পাড়াটা শান্ত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সব ধর্মের সব পোশাকের মানুষের স্বাধীনভাবে চলাচলের পিচ ঢালা নোংবা সংকীর্ণ পথটুকু তার মৃত্যুর ফাঁদে পবিণত হয়েছে—ধুতি-পরা সে হিন্দু যুবক।

হেঁটে, জোরে হেঁটে, এ পথটুকু পেরোতে মিনিট তিনেক লাগবে, তারপর ট্রাম রাস্তা, নিরাপত্তা। কিন্তু এই তিন মিনিটের পথে অনেক ছোরা কিলবিল করছে। পিছন থেকে পিঠে বা সামনে থেকে বুকে একটা ছোরা বসাতে দুই কী তিন সেকেন্ড লাগে। গোকুল পিছনে তাকায়। ওদিকে জবরদস্ত ঘাঁটি—ওদিকে ফেরা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব। সামনে তাকে এগোতেই হবে। দুশো-আড়াইশো গজ গলিটুকু পেরোতে যদি মরতে হয়, মরবে। অন্য কোনোদিকে অন্য কোনো উপায়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

দু-এক পলকের মধ্যে সহজ স্পষ্ট বাস্তব অবস্থাটা গোকুল আয়ত্ত করে ফেলে আর আয়ত্ত করতে করতে সেই দু-এক পলকের মধ্যেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে পানবিড়ির দোকানটাতে যায়। দোকানে পাঁচজন বিড়ি বানাচ্ছে একমনে। তাদের এই গলিতে যে একটা খুন হয়ে গেল, আরও খুনের জন্য গলিটায় তৃষ্ণা চরমে উঠে গেল, এ সব তুচ্ছ বিষয়ে তাদের যেন ভ্রুক্ষেপও

নেই ! বিড়ি পাকানো শেষ না করলে হয়তো আজও তাদের আস্তানার বাল-বাচ্চার, দু-একদিনের ভুখা থাকার মীমাংসা হবে না।

নারকেলের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে গোকুল বেপরোয়াভাবে মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ে। বিড়িতে টান দিতে দিতে হেলে দুলে ধীরপদে অগ্রসর হয়। তার তাড়া নেই, তার আতঙ্ক নেই, সে এই পাড়ারই লোক—চকচকে শানানো ছোরা যারা নিয়ে আসে তাদেরই আপনজন। নইলে, বিধর্মী অনাত্মীয় কেউ কি এসময় এখান দিয়ে এভাবে চলতে পারে ? পরনে অবশ্য শার্ট আর ধুতি, কিন্তু আজকাল কোনো মুসলমান ছেলে কি শার্ট আর ধুতি পরে না ?

দশ-এগারোবছরের একটা ছেলে, তার পরনে মখমলের পোকায়-কাটা পরিত্যক্ত ট্রাউজার কেটে তৈরি করা হাফপ্যান্ট, গায়ে হাতকাটা নকল খদ্দর, ছিটের বোতাম-ছেঁড়া কোট, সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, তুম কোন হ্যায় ?

গোকুল গর্জন করে বলে, চোপরাও ! শালা !

ছেলেটা ছিটকে সরে যায়।

ধীরে ধীরে এগোয় গোকুল। সেই যেন এই গলির কর্তা, বাদশা ! সে জানে, প্রত্যেক পলকে জানে, প্রাণটা সে বজায় রাখছে অভিনয় দিয়ে, ঢং করে ! কেউ কখনও যা করে না সে তাই করছে।

গলির মোড়ে পৌঁছে, ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া লোকজনের চলাচলের মধ্যে এসে, সে যেন হঠাৎ দিশে হারিয়ে ফেলে। নামাবলি গায়ে জড়িয়ে পিতলের শূন্যকুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে একজন উড়িয়া দোকানে দোকানে ঘণ্টা নেড়ে একটা ফুল আর একটু জল ছিটিয়ে ব্যাবসা চালিয়ে চলেছিল, অসাবধানে পা বাড়াবার ফলে সে বেচারিকে গোকুল না জেনে কুপোকাত করে দেয়।

মুখ থুবড়ে সে ফুটপাতে পড়ে যায়। তার জীর্ণ তসরের কাপড়ের তলা থেকে একটা বোতল ফেটে কাচ আর ধেনো মদের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত শহরেও সে ধর্মকে আশ্রয় করে দিব্যি ব্যাবসা চালাচ্ছিল। এক পয়সা মূলধন দরকার হয়নি, গায়ে দেবার সাধারণ একটা চাদরের বদলে নামাবলি চাদর, কয়েকটা ফুল-পাতা, একটু কলের জল। কলকাতার কলে গঙ্গার পবিত্র জলই সরবরাহ হয় !

সামলে-সুমলে উঠে ধর্ম-ব্যবসায়ী উড়িয়াটি গোকুলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলে, লেংড়ি মাবার মানেটা কী মশায় ?

কে লেংড়ি মেরেছে ?

শুনে লোকটি সিধে হয়ে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে পিতলের ফুল-চন্দন সজ্জিত দেবতার সাজিটি যে গড়াগড়ি যাচ্ছে সেদিকে খেয়ালও করে না। গায়ের নামাবলিটা খুলে কোমড়ে জড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, দেখুন, আপনিও বাঙালি, আমিও বাঙালি। আপনি দাঁতের মাজন ফিরি করছেন, আমি অন্য জিনিস ফিরি করছি। আমাকে লেংড়ি মেরে ফেলে দেবার মানেটা কী মশায় ?

সামনেই একটা ট্রাম যাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে লাফিয়ে গোকুল ট্রামটায় উঠে বসে, এখানে ওই অবস্থায় জীবনযুদ্ধের দুই ফিরিওলার হাতাহাতি যুদ্ধ সৃষ্টির সাধ তার ছিল না। বেচারির দেশি মদের বোতলটা চূর্ণ হয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় ও জ্বালা শান্ত হবার নয়। মার খেলে জীর্ণ শরীরে আরও ব্যথা পাবে। তার চেয়ে হার মেনে তার পলায়ন করাই ভালো !

আরও একটু কাজ ছিল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়। সন্ধান করে গিয়ে দেখতে পায়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে মণি রান্নাবান্নার কাজে নেমেছে,—একা। নীলিমা সরস্বতী বা ঊষা এরা কেউ ধারে-কাছে নেই।

মণি বলে, এত দেরি হল ? যাক গে', এক টুকরো রুটি আছে, চা খেয়ে নাও। আধঘণ্টার মধ্যে ভাত দেব।

গোকুল বলে, বলেন কী ? সন্ধ্যাবেলা ভাত খেয়ে নিলে মাঝরাতে খিদে পাবে যে ? চা-টা খাই, ভাত ঠিক সময়েই খাব। একা রাঁধছেন কেন ?

ভারী রান্না, এতে আবার কজন দরকার ?

মুখ-হাত ধুয়ে এসে গোকুল চা খায়, তার বাড়ির কথা মণি তোলে না। আসলে, কথাটা সে ভুলে গিয়েছিল।

গোকুল নিজে থেকে বলে, আপনাদের ও পাড়াটা দেখে এলাম। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মালপত্র কিছু রেখে এসেছিলেন ?

চেয়ার টেবিল খাট, ক-মন কয়লা, এই সব ছিল।

বোধ হয় আর নেই।

বাড়িতে ঢুকেছিলে ? তালা দিয়ে এসেছিলাম।

তালা নেই। অন্য লোক বাড়ি দখল করেছে, ভেতরে যেতে পারিনি। এমনিই প্রাণটা যেতে বসেছিল।

মণি ব্যাকুল হয়ে বলে, কেন তবে গেলে পাড়ার মধ্যে ? আমি শুধু বলেছিলাম তফাত থেকে গা বাঁচিয়ে পাড়ার অবস্থাটা একটু জেনে আসতে। বাড়ি পর্যন্ত যেতে তো বলিনি তোমাকে ?

যে বিপদ ঘটতে পারত তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে মণিকে কাতর হয়ে পড়তে দেখে গোকুল বুঝিয়ে বলে, জানলে আমিই কি যেতাম ? প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কী একটা ঘটল, নইলে ভাবনা ছিল না।

নীলিমাকে গোকুল জিজ্ঞাসা করে, ওঁকে একা রাঁধতে দিলে কেন ?

নীলিমা উদাসভাবে বলে, ওঁনার শখ। আমাদের খেদিয়ে দিলেন। কারও কিছু করবার দরকার নেই, উনি একা সব করবেন !

দুপুরে মণি একটু শুয়েছিল। উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় মনটা ছিল শান্ত। বাইরে থেকে ফিরে সুশীল একটু তফাতে ম্লান বিষণ্ণ মুখে চুপচাপ বসে থাকার পাঁচ মিনিটে সে শান্ত ভাবটুকুও বিগড়ে গেল।

সুশীল প্রথমেই কথা বললে বোধ হয় এ রকম হত না। তারপর সুশীল যখন অতি মৃদুকণ্ঠে আদরের সুরে কথা বলল গভীর বিতৃষ্ণায় জগৎটা তিতো হয়ে গেল মণির কাছে।

কিছু ঠিক করলে ?

সে তো বলেই দিয়েছি।

দ্যাখো—

মণি উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কোথায় যাবে ? রান্নাঘরে নীলিমা দুজনকে ভাত দিচ্ছিল, সেইখানে গিয়ে বসল।

সুশীল চুপচাপ বসে থেকে বলল, ওবেলা থেকে আমি রান্নাবান্না করব।

মণি হঠাৎ প্রায় গায়ের জোরে সেই যে রান্নার দায়িত্ব গ্রহণ করল, মনে হল মরলেও আর এ দায়িত্ব সে ছাড়বে না। অধিকাংশ সময় সে রান্নাঘরেই কাটায়। এ দেশের মেয়েরা যে সত্যিই নিছক পুরুষের ভোগের সামগ্রী, রাঁধুনি চাকরানি আর পুরুষের সন্তান-সন্ততির দুধ-মা ধাই—এ খবরটা সে চিরকালই জানত। মাসিকপত্রাদিতে কী কম লেখা সে পড়েছে এ বিষয়ে ! এ দেশের নারী-সমাজকে মনে মনে সে কী কম আহা জানিয়েছে ! সুশীলকে কেঁচো বানিয়ে নিজের ঘর-সংসারে তার ছিল অখণ্ড প্রতাপ, নিজেকে অবশ্য ওই অভাগীদের দলে সে ভাবতে পারত না। অহর্নিশ মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে, স্নেহ-সেবা কান্না-অভিমানের জাল বুনে, কী অধ্যবসায়ের সঙ্গেই একটি দুর্বল পুরুষ আর তিনটি ছেলেমেয়ে এই চারটি প্রজা নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য বশে রেখে সে অখণ্ড প্রতাপে শাসন করে

এসেছে। নিজের ঘরের কোণে নিজেকে সে যাই ভাবুক, আসলে সে-ও ওই বিরাট রাঁধুনি চাকরানি-মার্কা মেয়েদেরই দলে, এটা টের পেয়ে তাব প্রচণ্ড অভিমান ফেটে পড়েছিল। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব রাজনীতি নেতা নিয়ে বেশি মাথা-ঘামানোর বিরুদ্ধে তার সেদিনের অসহিষ্ণুতা, সুশীলের সঙ্গে শত্রুর মতো ঝগড়া, রান্নাঘরে আশ্রয় নেওয়া সবই তার প্রতিক্রিয়া। দেশটা বড়ো, দেশ-বিদেশ আরও বিরাট, রাজনীতির সুতো টানলে নিরালা ঘরের কোণে মশারির অন্তরালের গোপন মুহূর্তগুলিতে পর্যন্ত বুঝি টান পড়ে : এ সব কথা সামনে রাখলে নিজে তুচ্ছ হয়ে যেতে হয়।

তুচ্ছ যে হয়ে গেছে তার প্রতিকার মণির জানা নেই, নিজেব ছোটো সংসারটিতে ফিরে গেলেও আগের দিনগুলি তার ফিরবে না। নিজেকে বড়োই সে অসহায় বোধ করছিল। রান্নাবান্নায় মেতে যদি ভুলে থাকা যায় ! প্রহৃত আদুরে ছেলের মতো শঙ্কিত কাঁদো-কাঁদো মুখ কবে সুশীল যে আশেপাশে ঘুরঘুর করবে, এটা থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া গেছে।

তার রান্নাঘরে আশ্রয় নেওয়ার মানে সুশীল বুঝেছে এক রকম ! সে ভেবেছে, ঝগড়া কবে মণি এখন অনুতাপে কাতর। মণিকে নরম কল্পনা করে তার পৌরুষ ধাতস্থ হয়েছে। সেও গম্ভীর মুখে বই আর কাগজে মন দিয়েছে।

সকালে প্রণব এসে রান্নাঘরে টুলটা টেনে বসে। বলে, হঠাৎ রান্নার মধ্যে ডুব মারলে কেন ?

কারও সঙ্গে বনে না, কী করব। একটা কিছু নিয়ে থাকবে তো মানুষ ?

কারও সঙ্গে বনে না বলে একা এতগুলো লোকের রান্না রেঁধে মরতে হয় বুঝি ?

অনেকদিন পরে মণি আজ মুখ তুলে চেয়ে একটু হাসে।

যে যে-কাজের যোগ্য। রাঁধাবাড়া বাসনমাজা ছেলে বিয়োনো আমার কাজ। দেশ-বিদেশ যুদ্ধ-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ মার্কসবাদ এ সব কি আমার জন্য ? আমাব চালচলন কথাবার্তায় তোমাদের হাসি পায়, তোমরা বিরক্ত হও। তার চেয়ে যা পারি তাই করছি।

হাসিমুখের কথাগুলি করুণ কিন্তু তাতে কী ঝাঁঝ ! ঝাঁঝটা বোধ হয় প্রণব পছন্দ করে, নইলে মণির কথাগুলি সত্যই নিছক ন্যাকামি হয়ে যেত।

আমরা যে হাসি, বিরক্ত হই, এটা কিন্তু আমরাই জানি না।

ও সব আমি বুঝি ঠাকুরপো।

তুমি কিছুই বোঝ না। নিজেই বলছ, এতকাল ঘরকন্নায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছ, বড়ো বড়ো কথা তোমার জন্য নয়। নিজেই আবার বলছ তুমি সব বোঝো। এই কটা দিনে তোমাব বুঝবাব ক্ষমতায় ম্যাজিক ঘটে গেল ? তুমি বুঝে ফেললে যে রাজনীতি সমাজনীতি বোঝ না বলে আমরা মনে মনে হাসি ? নিজেকেই তুমি বুঝতে পার না, তুমি আমাদের কী বুঝবে ? ঝগড়া তোমার নিজের সঙ্গে, নিজের মনগড়া ধাঁধায় তুমি পাক খাচ্ছ।

শুনতে শুনতে মণির দুচোখে রোষের দীপ্তি ঝলক মেরে যায়। খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে সে এমন ভঙ্গি করে যেন খুন্তি দিয়ে প্রণবকে মেরে বসবার ঝোঁক সামলাচ্ছে।

বলে, ঠাকুরপো, আমার স্বামীও মস্ত বিদ্বান, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে যেয়ো, কেঁচো বনে যাবে। অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত প্রফেসার আমার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে বড়ো বড়ো কথা বলেছে, আমার দেওয়া চা-বিস্কুট খেয়েছে। তাদের কথা এক বর্ণ বুঝিনি। তাই বলে কি আমার মনটা জবুথুবু উই-ঢিবি হয়েছিল ? আমি হাসিনি কাঁদিনি ভাবিনি ? তোমার বিদ্বান দাদার মনের খুশি-অখুশিতে পুতুল নেচেছি ? কী বুদ্ধি তোমার ঠাকুরপো ! বড়ো বড়ো কথায় মেতে তোমার সহজ-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা নিয়ে আমি চলব না তো কি তোমার মনগড়া বিচার-বিবেচনা ধার করতে যাব ? আমার মনটা যেমন ছোটো তোমার মনটা তেমনি বড়ো তাই বলে কি তোমায় আমি বলব যে, তোমার মনটা দিয়ে আমার মনটা চালাও ?

মণির দুচোখ জলে ভরে যায়। গাল বেয়ে টপ-টপ করে জল গড়িয়ে পড়ে ! কিন্তু সে হিসাবি মেয়ে, বাপ-দাদার জুটিয়ে দেওয়া পুরুষটার সঙ্গে বহু বছর তিনটে ছেলেমেয়ে বিইয়ে খাওয়া পরা রোগ-ব্যারাম সামলে, নিজে খেয়ে-পরে আর সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে জীবন কাটিয়েছে, সে জানে এখন কাঁদলেই সর্বনাশ হবে। চোখ দিয়ে জল পড়ে তবু সে তাই কাঁদে না। ন্যাতা দিয়ে কড়াই মুছে নতুন ব্যঞ্জন রান্না শুরু করার মতো আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নতুন সুরে বলে, দুবার তুমি আমায় দিশেহারা করেছ ঠাকুরপো, আর পারবে না।

দুবার তোমায় দিশেহারা করেছি ? আমি ?

ভীরু নতুন বউ পেয়ে একবার মাথা বিগড়ে দিয়েছিলে। সবাই নিয়মে চালাত, ওঠাত বসাত, তুমি তোমার কলেজি চ্যাংড়ামি আব গোঁয়ারতুমি দিয়ে নিয়ম ভাঙতে, আমার রাইট নিয়ে ফাইট করতে, বিদ্রোহ করতে শেখাতে। মনে আছে সে সব কথা ? তোমার পাল্লায় পড়ে সংসারের দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলার বদলে স্বাধীন হতে শিখলাম—আহা, কী স্বাধীনতাই শেখালে ! বড়ো ছেলের বউ, বাড়ির হালচাল বুঝে আস্তে-আস্তে দশটা দায়িত্ব নিয়ে বাড়ির একজন হয়ে উঠব সবাই এটা চেয়েছিল—কাজেই ঠিক তার উল্টোটা কব, সকলকে পর করে দাও ! উঠতে বসতে ঠোকাঠুকি লাগাও ! একটু যে স্নেহ চায় গালে তার চড় মারো। নইলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না, সবাই তোমায গিলে ফেলবে। কেন ঠাকুরপো ? আমায় কি খেতে পরতে দিত না, গাল দিত, মারত কেউ ? আমায় একটু খুশি করার জন্যেই বরং কে কী করবে ভেবে পেত না। তুমি মাথা বিগড়ে না দিলে আজ কি আমার এ দশা হয় ? এ বাড়িতে ফিরে এসে মনে হয শত্রুপুরীতে এসেছি ? মা বেঁচে থাকলে এ সংসাবে যে ঠাঁই পেতেন, আমি আজ সেখানে থাকতাম।

প্রণব খানিক চুপ করে থেকে বলে, তোমায একটা খবর জানাই। শুনে খুব কষ্ট পাবে। কিন্তু না বলেও লাভ নেই। পবে ভুল ধারণা ভেঙে কষ্ট বরং আরও বেশিই হবে।

মণি নীরবে চেয়ে থাকে।

শেষের দিকে মা-র মাথাটা একটু খাবাপ হয়ে গিয়েছিল মণিবউদি। তীর্থে যাবার নাম করে পালাতেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনতে হত। মা-র চিকিৎসায় দুবছরে বাবার সমস্ত জমা টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। মা একদিন ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন।

বেশি জুরে মা হার্টফেল করেছিলেন।

মণির মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। তাব নিশ্বাস আটকে আটকে যাচ্ছে।

তাই আমরা সবাইকে বলেছিলাম। বাড়ির সকলেও জানত না। গুরুদেব এসেছিলেন। মা-র কথা সব শুনে বাবাকে বললেন, ছাদে একটা সর্বতীর্থ সৃষ্টি করতে হবে, তিন দিন হোমপূজা চলবে। মা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, সারাদিন ছাদে সব আয়োজন করতে মেতে গেলেন। আমি বাড়ি ছিলাম না, অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেই মা আমায় ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন। বোধ হয় আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, খোকা, আমায় সব তীর্থ দেখাবি বলেছিলি, এই দ্যাখ, সব তীর্থ তৈরি হচ্ছে। তোরা বাপ-ব্যাটায় আমায় ঠকাচ্ছিস কেন রে ?

ঠাকুরপো !

মা-র প্রত্যেকটি কথা মনে গাঁথা হয়ে আছে, একটি শব্দও এ জীবনে ভুলব না। মা বলেছিলেন, বুড়ো বয়সে তীর্থও করতে দিবি না তোরা ? গোরু-ছাগলের মতো ঘরের গোয়ালে মরতে পারব না খোকা। তীর্থে আমি যাবই। বলেই সোজা গিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কড়াইয়ে তরকারি পুড়ে যেতে শুরু করে। মণির হাত থেকে খুন্তি খসে পড়েছে। কথা বলতে বলতে প্রণব এমনভাবে হাতে হাত কচলিয়ে চলেছিল যেন তার মায়ের হত্যাকারীদের টুঁটি দুহাতে চেপে মারছে।

মা যে তীর্থে যেতে চেয়েছিলেন মণিবউদি, সে তীর্থ এ জগতে নেই, সমাজ-জীবনে নেই। দুবার ভারতের সমস্ত তীর্থ ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেকবার দু-একটা জায়গা ঘুরে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে একা এই বাড়িতে ফিবে এসেছিলেন। বেঁচে থাকতে সব কাজ ফুবিয়ে গেলে, মানুষ ফালতু হলে, এ রকম হয। সবাব বেলা আমার মা-র মতো চরম হয় না, মা-র মান-অভিমান চিরদিন খুব উগ্র ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে ঘবে পুরানো মায়েদের এই গতি, অবলম্বনহীন শেষ জীবন। শুধু সংসারটুকু জীবনেব ভিত, সংসারের ভিতটাই ধ্বসে যাচ্ছে।

তুমি আবার আমায় দিশেহারা করছ ঠাকুরপো।

মাপ চাইছি। মা-র কথা তুললে কিনা, আমার জন্য সংসারে মা-র স্থানটি নিতে পারনি বললে কিনা, তাই এ সব বলে ফেললাম।

এতদিন কেন আমায় কিছু বলনি ?

অবান্তর কথা আমি বলি না মণিবউদি।

কড়াইয়ে তরকারি পুড়েই চলেছিল, খেয়াল করে মণি তাড়াতাড়ি ঘটি কাত কবে জল ঢেলে দেয়। ক্ষুব্ধ চোখে তরকারিটার দিকেই চেয়ে থাকে। এ তরকারি আব পবিবেশন করা চলবে না, খানিক আগেও যা ছিল সবুজ সতেজ আলু-কুমড়ো, ভেজাল তেলে সাঁতলে খাদ্য হচ্ছিল, দু-দণ্ডে তা কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে। দু-এক মিনিটে জগতে কী অঘটন ঘটে যায় ! সকলে নিন্দা করবে, যা-তা বলবে। অন্তত মনে মনে ভাববে যে, আহা, গায়ের জোরে রান্নাব ভাব নিযে কী সুন্দর পোড়া তরকারিই ইনি খাওয়াচ্ছেন !

একটু বোসো ঠাকুরপো।

তরকারির ঝুড়ি দেখে মণির কান্না পায়। আধখানা বেগুন, গোটা তিনকে আলু, একটু টুকবো আদা, কয়েকটা পেঁয়াজ আর কালচে মারা শুকনো গোটা-দুই কাঁচাকলা ছাড়া তবকারিব ঝুড়িতে কিছু নেই। ডাল আর তরকারি দিযে একুশজন লোক ভাত খাবে।

মণি ফিরে গিয়ে বলে, ঠাকুরপো, আমায কিছু তবকারি এনে দাও, এদিকের বাজারে তো কারফিউ হয়নি ?

পুরোনো বাঁকানো হাতাটা দিয়ে উনুন খুঁচিয়ে কিছু কয়লা দিযে হাত ধুয়ে মণি আবাব মিনতি করে বলে, আলু পটোল বেগুন, কুমড়া যা পাও এনে দাও ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি। আমাদের কথা শেষ হয়নি, অনেক কথা আছে। তরকারিটা রেঁধে সারারাত তোমার সঙ্গে কথা বলব।

প্রণব উঠে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে। বলে, গোকুলকে বাজারে পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে। দ্বিতীয়বার কবে তোমায় দিশেহারা করলাম বলো তো শুনি ?

প্রথমবারের সব কথা বলা হয়নি। তুমি কেমন বিশ্বাসঘাতক সেটা শোনো।

বলো।

তুমি হঠাৎ মাকে টেনে আনলে। তুমি বিগড়ে না দিলে আমি এ সংসারেই মানিয়ে থাকতাম, মা-র আসনটি পেতাম। তার মানে কি এই আমি অবিকল মা-র মতো হতাম ? সংসার বদলাত না ? সংসার যেমন বদলেছে, আমিও তেমনি বদলে যেতাম—আমিও একালের মেয়ে। তুমি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে, বড়ো সার্থকতার পথ দেখালে। বেশ, আমি আজও বলি, তোমার ওই বিদ্রোহের পথেই সব ফাঁকি থেকে মুক্তি পেতাম, জীবনটা সত্য হতে পারত। কিন্তু তুমি কী করলে ? তোমার বাইরের জীবন বড়ো হয়ে উঠল, দুদিন পরে আর তোমার পাত্তা পাই না। একটু বেনোজল ঢুকিয়ে তুমি নাগালের বাইরে সরে গেল। নিজের পথ খুঁজে নিতে লাগলে, আমায় ছেড়ে দিলে এক অদ্ভুত অসহ্য অবস্থায়। সবার সঙ্গে বিরোধ, শুধু অশান্তি, আর কিছুই নেই। কেন, কী তোমার দরকার ছিল

গোবেচারি আমার মনটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ? বিচারবুদ্ধিতে ধাঁধা লাগিয়ে তোমাব পথে দু-পা সাথে করে এগিয়ে নিয়ে ফেলে পালাবার ?

আমি ফেলে পালাইনি। তুমিই সঙ্গে চলতে পারলে না।

মণি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, সঙ্গে চলতে পারলাম না মানেই তো ফেলে পালালে। আমি তো পারবই না তোমার সঙ্গে চলতে—তুমি যদি না চেষ্টা করে সঙ্গে নাও। সেটা ছিল তোমার দায়িত্ব। আমায় খানিকটা বিগড়ে দিলে, খানিকটা এগিয়ে নিলে তারপর আর ফিরে তাকালে না,—এ তো উচিত হয়নি। প্রথম থেকে উদাসীন থাকলেই পারতে।

তুমি ভুল করছ। জীবনে কত কাজ, কত দায়িত্ব, সে সব অবহেলা করে তোমায় মানুষ করার জন্য মেতে থাকলে তুমিই আমায় অশ্রদ্ধা করতে। এ পথে কেউ কাউকে চিরকাল হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তার মানে দাঁড়ায়, একটা মিথ্যে বোঝা বয়ে চলা। এগোবার সাধ থাকলে, তুমি নিজেই এগোতে পারতে। আমি পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

তুমি শুধু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলে।

তাহলে তো মীমাংসা হয়ে গেল। তোমার ছিল শুধু একটা ঝোঁক, একটা খেয়াল। সংসারী হওয়াটাই ছিল তোমার আসল সাধ। নইলে ধাঁধা লাগত না। দেশের জন্য দশের জন্য নিজেকে একটু কাজে লাগানো, এতে ধাঁধার কী আছে ? স্বাধীনতা ছিল তোমার সাময়িক একটা ঝোঁক, আর কিছু নয়।

ও ঝোঁকটা তুমিই গজিয়েছিলে। বেশ তো, ঝোঁকটা শুধরে নিয়ে ঘরে থেকেই যাতে বড়ো আদর্শ মেনে বড়ো কাজ করতে পারি, সেটা করলেই পারতে ? আমি তো তোমা বই আর জানতাম না ! তুমি হুকুম দিলেই তো আমি দেশের জন্য প্রাণটা দিতে পারতাম। বোকাসোকা একটা সাধারণ বউ, সে তো শিশুর সমান, তোমায় ও সব সংসার-ছাড়া ব্যাপারে তাকে শুধু খেপিয়েই দেবে, ঠিক পথে চলতে শেখানোর দায়িত্ব নেবে না ? সেটাই তো বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রণব নিজের মনে বলে, শিশুর সমান ! সংসারের ব্যাপারে নয়, সংসার-ছাড়া ব্যাপারে। সংসার-ছাড়া ব্যাপার ! শিশুর সমান !

মণি বলে, আগে শুনে নাও, পরে সমালোচনা করবে। এই তো গেল পুরানোবারের হিসেব। এবার কী কবলে ? একটু বীরত্ব দেখিয়ে থতোমতো খাইয়ে সাজানো সংসার থেকে হ্যাঁচকা টানে শিকড়-সুদ্ধ তুলে ফেলতে চাইলে। আমায় যদি তোমার দলে টানার সাধ, গড়ে-পিটে নাও, জানতে-বুঝতে শেখাও ? মুখ্যু তো আছিই, জ্ঞানও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই। সেটা নতুন কিছু নয়। ডেকে নিয়ে, টেনে নিয়ে অপদস্থ করা কেন ? আমার চালচলন কথাবার্তায় তোমরা যে হাসাহাসি কর, সেটা তোমাদেরই লজ্জা, বুঝতে পার না ?

বুঝতে একটা অসুবিধা আছে, তাই বুঝতে পারি না। তোমায় নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না, বারবার এ কথা বলেও তোমার ভুল ধারণা কাটাতে পারছি না। তোমায় নিয়ে হাসাহাসি করার সাধও কারও নেই, সময়ও নেই। নিজের মনে নিজেকে নিয়ে তুমি হাসাহাসি করছ। তোমার মনের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার মনের মধ্যে না ঢুকলে কী করে এটা আমাদের বোধগম্য হবে ?

প্রণবের কথা যেমন বাঁকা কথার সুর তেমনি কড়া হয়ে উঠছে খেয়াল মরে মণি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর প্রণবের মেজাজকে উপেক্ষা করে বলে, হাসাহাসি মানে কি ইয়ার্কি তামাশা ? সেদিন তোমরা খালি বড়ো বড়ো কথা বলছিলে, আমি বিরক্ত হয়ে গান-টান শুনতে চাইলাম। সবাই তোমরা কীরকম চুপ হয়ে গেলে আমি টের পাইনি ভেবেছ ?

মনগড়া টের পেয়েছ। নইলে এটুকু নিশ্চয় টের পেতে, তোমার মতো আমিও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, তখন শুধু জাবর-কাটা চলছিল।

একঘেয়ে লাগছিল সবারই, তুমি মুখ ফুটে সেটা বলে আলোচনাটা থামিয়ে দেওয়ায় সকলে বরং কৃতজ্ঞতাই বোধ করেছিল। তুমি উল্‌টোটা বুঝলে। মনগড়া বোঝা এই রকম হয়। বোঝাটা মনের মতো হলেই হল। আর কিছুই দরকার হয় না।

প্রণব উঠে দাঁড়ায়।

অন্য সব কিছুই তোমার মনগড়া মণিবউদি। যার সংস্পর্শে আসবে, যে তোমায় নতুন কিছু শোনাবে, একটু বিচলিত করবে, তাকেই যদি তোমার দায়িত্ব নিতে হয়, সংসারে একা থাকা ছাড়া তোমার গতি নেই। তোমার হিসাবে দাঁড়ায়, বন্ধুমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

রাগ করলে ? আমি কিন্তু সাধারণ লাভ-লোকসান নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলিনি। ওটা আদর্শগত বিশ্বাস রাখা-না-রাখার কথা।

তোমার বিশ্বাসও তবে দুরকমের ? একটা সাধারণ লাভ-লোকসানের, আরেকটা আদর্শগত ? কখন কোন হিসাবটা ধরবে ঠিক করব কী করে ?

মণি দু-চোখে আগুন জ্বালিয়ে তাকায়, তাতে তার চোখ দুটিই শুধু কটমটে মনে হয়। তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে চোখের ধমকে কাউকে কাবু করার সাধ্য তার আর নেই।

তর্ক করে আমার কাছে পার পেলে, জগতের কাছে পাবে না।

তর্কটাও তবে আমিই করলাম ?

জবাবের অপেক্ষা না করেই প্রণব বেরিয়ে যায়।

গোকুল চটের থলিতে তরকারি এনে ঢেলে দিচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী মেনে মণি বলে, দেখলে ? গাল দিয়ে জবাবটা শুনবার ধৈর্য রইল না, গটগট করে বেরিয়ে গেল ? এবাই দেশোদ্ধার করবে !

ঝিঙে-বেগুন গুছিয়ে রাখতে রাখতে গোকুল হেসে বলে, ভাবছেন কেন ? আপনার জবাব না শুনে যাবেন কোথা ? যেচে এসে জবাব শুনতে হবে।

মানে কী হল ?

মানে খুব সোজা। আপনার বিষয়ে অজানা কিছুই নেই। মানুষটা আপনি কেমন, কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সব জানা কথা। যে আপনাকে জানে তার মনে আজ প্রথম প্রশ্ন জাগা উচিত . আপনার মধ্যে এমন তোলপাড় উঠল কেন ? এমন সংসারি মানুষ আপনি, কেন আপনি এমনভাবে নাড়া খেলেন ? দেখে-শুনে মন-রাখা কথা কইতেন, মিষ্টি করে হাসতেন, চুকে যেত। তার বদলে সবাই কী ভাবে কী বলে, কী করে তাই নিয়ে হয়েছে আপনার জ্বালা। কেন ? এর জবাবটা তো আপনার কাছেই পেতে হবে।

খুন্তির গোড়াটা থুতনিতে ঠেকিয়ে মণি সংশয়ভরে তাকায়। তার আশঙ্কা হয়, হয়তো গোকুল তার ক্ষোভ দূর করতে মন-রাখা কথা বলছে।

আমি আবার একটা মানুষ !

গোকুল হাসিমুখেই বলে, সে প্রমাণটাই তো দিলেন যে এতকাল চোখ-কান বুজে সংসার করেও মানুষ রয়ে গেছেন। নইলে আপনার এত জ্বালা হবে কেন ? শুধু যদি আপনার মনে হত, আমাদের রকম-সকম আপনার পছন্দ নয়, সেটা আপনার মনে-মনেই থাকত। কিন্তু আপনি একেবারে ছটফট করছেন—এ তো সোজা ব্যাপার নয়। আপনার ভেতরে ওলট-পালট চলেছে। ফল কী দাঁড়াবে সেটা অবশ্য আলাদা কথা। তবে আপনি আর আপনি থাকবেন না মণিবউদি, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

কী হবো ?

কে জানে কী হবেন—বন্ধু অথবা শত্রু। কিন্তু বাইরের জগৎকে ঠেলে সরিয়ে উদাসীন হয়ে সংসার নিয়ে মেতে আর থাকতে পারবেন না।

বন্ধু হওয়া কপালে নেই। কারও সঙ্গে মিলছে না।

গলায়-গলায় ভাব দিয়েই বুঝি শুধু বন্ধুত্ব শুরু হয় ? শুধু মিল নিয়ে সৃষ্টি চলে ? মিল আর অমিল আছে বলেই জগৎটা এগোচ্ছে, নইলে কবে পচে গলে যেত ! তা জানেন ?— মুহূর্ত না থেমে এই কথার সঙ্গেই গোকুল যোগ দেয়, আবার কেন তরকারি রাঁধার হাঙ্গামা করবেন? বেগুন ভেজে ফেলুন।

বেগুন ভাজায় হাঙ্গামা কম নাকি ? না। ক্ষিদে পেয়েছে ?

কয়েক দিন গোকুলের কথাগুলিই মণির মনে ঘুরে বেড়ায়। কথাগুলি সরল কিন্তু সাংঘাতিক, তবু মণির বড়ো ভালো লেগেছে। নিজের মাধ্যমে জগৎকে বিচার করা তার চিরদিনের অভ্যাস। গোকুল এই মাধ্যমকে আমল দেয়নি, কিন্তু তাব অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে। সেটা মণির কাছে গোকুলের সততার একটা বিরাট পরিচয় হয়ে উঠেছে। প্রণব যেন সে তুলনায় অনেক বেশি অনুদার।

সাত

নাজিমের প্রথমে মনে হয়েছিল, পাড়ায় এবং জানা-চেনা লোকেদের কাছে সে আর কোনোদিন মুখ দেখাতে পারবে না। বেঁচে থাকতে মাকে সে যে খেতে দিত না, বাড়ি বাড়ি ঘুঁটে বেচে সে পেট চালাত, এজন্য নাজিমের বিশেষ কোনো লজ্জা ছিল না। গরিবের কঠোর বাস্তব জগতে মনগড়া লজ্জার ঠাঁই নেই। কোনো রকমে পেটে খেয়ে কে বেঁচে আছে সেটাই চরম কথা, কীভাবে খাওয়াটা সে যোগাড় করছে, কলে খেটে না ঘুঁটে ফিরি করে, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর গরজ কারও নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়ুক, নিজেকে সকলের নানি করে তুলে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে নাজিমের মা যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারত যে নিজের পেট চালিয়ে যাবাব ক্ষমতা তার নিজেরই ছিল ? সুতরাং তাকে খেতে-পরতে না দেওয়ায় নাজিমেব কোনো দোষ হয়নি। দয়া-মায়ায় কারও পেট ভরে না, শূন্য থেকে খানা নামে না। যে খায় সে জোগাড় কবেই খায়। কথার কথা যে যা বলুক, মাকে ছেড়ে সুন্দরী বউ নিয়ে থাকার জন্য সত্যিকারেব নিন্দা কেউ নাজিমের করেনি। বউ নিয়ে, খাপসুরত বউ নিয়ে, থাকবে না তো কাকে নিয়ে থাকবে মানুষ ? বুড়ি যদি কাত হয়ে পড়ত, রোগে বা অনাহারে সত্যই মরতে বসত পথের ধারে, তখন তার দিকে না তাকালে দোষ হত নাজিমের। লোকে বলত, ছিঃ, নাজিমের মা এভাবে প্রাণ দিয়েছে। তার চেয়েও বুঝি আপশোশের মরণ হয়েছে বুড়ির। গুন্ডা কাপুরুষ তাকে কুৎসিতভাবে হত্যা করেছে।

জোয়ান মন্দ মানুষ হলে কথা ছিল, শক্ত-সমর্থ স্ত্রীলোক হলেও বুঝি মনে করা চলত ওরা শয়তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বয়স যাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছে, শনেব মতো সাদা করে দিয়েছে মাথার চুল, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, গায়ের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে, এক পা কবরে দিয়ে যে প্রতিদিন মরণের অপেক্ষাই করছে—তাকে এভাবে হত্যা করা কীসের পরিচয় ? কেন, আর মানুষ ছিল না বেছে নেবার ? শিশুর মতো নিরীহ ভালো মানুষ এ বুড়িকে কেন ?

আপশোশে এমনি নাজিমের বুক পুড়ে যায়, মানুষের মুখের দিকে তাকাতে না পারায় গুম খেয়ে সে মাটিতে চোখ পেতে রাখে, তার উপর ক-জন চেনা লোক নানা কথা বলে তাকে উন্মাদ করে দিতে চায়। বলে, এ কেবল দাঙ্গার ব্যাপার নয়, সাম্প্রদায়িক ঝগড়া নয়। আমি তোমায় মারলাম, তুমি আমায় মারলে, এ তা নয়। এ নাজিমের কলঙ্ক, সমস্ত বস্তির কলঙ্ক, তাদের সমাজের কলঙ্ক। প্রাণ যাক, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নাজিমকে নিতে হবে। বেছে বেছে নাজিমের মাকে ওরা সাবাড় করেছে, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। শুধু ওই ভদ্রপাড়ার দুশমনদের নয়, ওই

যে বস্তি থেকে বউকে নিয়ে এদিকে সরে আসতে হয়েছে নাজিমের, সে বস্তির লোকেদেরও কারসাজি আছে তলায়-তলায়। রাত্রে ওরাই তো টেনে বার করেছে নানিকে, হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেছে মন্দিরের কাছে....

একজন বলে আপশোশের সুরে, একজন বলে খোঁচা দিয়ে, নাজিমের মরদের রক্তে তারা আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। সে আগুন যাতে সামনের ওই বস্তিটাতে লাগে, সেখান থেকে চারিদিকে আরও দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও এদিকে ভালো করে হাঙ্গামা বাড়েনি। বস্তিতে অধিকাংশই মজুর, দাঙ্গায় তাদের মন নেই। উত্তেজিত হয়ে প্রায় বাধিয়ে বসবার উপক্রম করেও কী ভেবে যেন তারা আবার অল্পেই সামলে নিয়ে থমকে থেমে গেছে।

নাজিম যদি সক্রিয় হয়ে নামে তাহলে বেধে যাবে ! দো-মনা মন কম নয়। নাজিম ডাক দিলে নানির কথা ভেবেও অনেকে মরিয়া হয়ে নেমে পড়বে।

পরীবাণু বলে, না।

মুখ দেখাতে শরম লাগে।

আরও শরম লাগবে। ওরা যে এ সব বলছে ওদের মতলব আছে। অর্ধেক মিছে কথা।

মিছে কথা ? নাজিম চোখ তুলে তাকায়। তার দু-চোখে আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে যায়।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল কে বললে ? আবদুলের মা আমায় বলেছে, তোমার ব্যারাম বলে কে যেন ডেকে নিয়েছিল। আরও কেউ কেউ জানে।

কে ডেকে নিয়েছিল ?

তা শুধোয়নি আবদুলের মা।

কী বলতে চায় পরীবাণু, কী বোঝাতে চায় ? ছেলের ব্যারামের কথায় ভুলিয়ে তাব মাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এতে বড়ো জোর প্রমাণ হয় একেবারে ঘর থেকেই কুকুর বেড়ালের মতো তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাতেই হত্যাটা শুধরে গেছে পরীবাণুর কাছে ? অথবা পরীবাণু শুধু কোনো রকমে ঠেকিয়ে রেখে তাকে বাঁচাতেই ব্যাকুল, দিশে হারিয়ে যা মনে আসছে তাই বলছে ? ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বউটার ওপর ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণা জেগেছে নাজিমের। পরীবাণু শহরে এই দাঙ্গা বাধায়নি। তার মার অপমৃত্যুর জন্যও সে কোন দিক দিয়ে দায়ী নয়। এ সব কথা অবশ্য মনেও আসে না নাজিমের, পরীবাণুর বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে মন তার বিগড়ে যায়নি। পরীবাণুকে নিয়ে মশগুল হয়ে দিন যাপনের অদ্ভুত খাপছাড়া একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। উদাসীনতা নয়, গভীর কষ্টকর প্রতিক্রিয়া।

রূপ যেন এতদিন চোখ মেলে দ্যাখেনি বউয়ের, শুধুই মুগ্ধ হয়ে মেতে ছিল—আর সব বিষয়ে আনমনা হয়ে। রূপ ? রূপ আছে পরীবাণুর, এমন ছিপছিপে নিটোল দেহ, এমন মোলায়েম রং, সুন্দর কোমল এই মুখ এমন আর কারও ঘরে নেই। কিন্তু বউয়ের রূপ আছে বলে কি আর কিছু থাকতে নেই জগতে ? সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে আলগোছে কোনো রকমে সমাজ-সংসার বন্ধুবান্ধব পুরুষের জীবনধারণের নিয়মরীতি বজায় রেখে কেবল বউয়ের রূপে মশগুল হয়ে দিনরাত্রি কাটাতে হবে ? পরীবাণুকে পাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনটা খুঁজে এই একটি নেশা ছাড়া আর কিছুই নাজিম দেখতে পায় না। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এ সবও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভিন্ন এক জগতে ঘটেছে, তার শুধু ছিল নিজের ঘরটি, যে ঘরে তার পরীবাণু থাকে।

পরীবাণু ঝুঁকে ঘরের কাজ করে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, সামনে দিয়ে এদিক-ওদিক চলা-ফেরা করে—তার দেহের চেনা রেখা ও ভঙ্গিগুলি, সজীব লতার মতো দেহের গড়নে যৌবনের পুষ্ট সম্ভারগুলি নাজিমের অচেনা মনে হয়। মনে হয়, ঘরের বউ রূপ দিয়ে এমনভাবেই ভুলিয়ে রেখেছিল

যে এ রূপও সে ঠিক মতো ভোগ করেনি, নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পরীবাণুকেও সে যেন স্বপ্নের মতো গ্রহণ করেছে।

বাস্তব সংসার ভুলে নরম হয়ে গেলে এই রকম হয় পুরুষের, সব দিকে সে ঠকে, ফাঁকিটুকু নিয়ে সে খুশি হয়ে থাকে।

নাজিমের বিতৃষ্ণা নতুন। রুক্ষ কঠোর বাস্তব জগৎ তাকে আচমকা কুৎসিত আঘাত দিয়ে সচেতন করেছে। সেই সঙ্গে তার তৃষ্ণাও জেগেছে নতুন—পরীবাণুর রূপেরই তৃষ্ণা, নতুন ধরনের। উগ্র নিষ্ঠুর উপভোগের মধ্যে এত দিন পরীবাণুকে পায়নি বলে নিজেকে তার বঞ্চিত প্রতারিত মনে হয়। রহমত খলিলেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রূপহীনা নোংরা সাধারণ স্ত্রীলোককে নিয়ে কী প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে নিজেদের পৌরুষ জাহির করে, হইচই করে সত্যিকারের মরদের মতো দিন কাটায়। পরীবাণুর মতো বউ থাকতে সে নিরীহ গোবেচারি সেজে ভীরু কাপুরুষের মতো মিইয়ে মিইয়ে জীবনটা কাটিয়ে এসেছে। এমনি পৌরুষবিহীন হয়ে গেছে সে যে বেছে বেছে তার মাকে খুন করেছে গুন্ডারা।

খপ করে সে হাত ধরে পরীবাণুর। হ্যাঁচকা টানে গায়ের ওপর এনে ফেলে। চিরকাল যে ডাকলেই খুশি হয়ে হাসিমুখে যেচে এসে বুকে আশ্রয় নেয়, কোমল দুটি হাতে গলা জড়িয়ে ধরে—সকাল না সন্ধ্যা না মাঝরাত্রি খেয়াল রাখে না !

পরীবাণু ভয় পেয়ে বলে, কী হল ? কী হল ?

সকালবেলা নটার সময় তার বড়ো বড়ো চোখের সে বিস্ফারিত চাহনি নাজিমের সহ্য হয় না, তার বিগড়ানো মনের উগ্র ভাব মিইয়ে শীতল হয়ে যায়। আরও বেশি যায় হ্যাঁচকা টানের ব্যথায় যখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে পরীবাণুর !

লাগল ?

লাগবে না ? হাতটা তুমি ভেঙে দিয়েছ !

পরীবাণুর ভয় ও রাগ ভাঙিয়ে আপিস যেতে সেদিন দেরি হয়ে যায় নাজিমের। দপ্তরির কাজ নিয়ে এই তার প্রথম গাফিলতি।

আপিসের কাজের পর সেদিন ইয়াসিনের কাছে তার ডাক আসে। ডাকতে আসে বুড়ো একটি লোক, মাথার সমস্ত পাকা চুল তার রং করা, গোলগাল মুখখানা মেয়েদের চেয়ে কোমল। মুখ দেখলে আর মিহিগলার কথা শুনলে মনে হবে এমন নিরীহ ভালো মানুষ লোক বুঝি জগতে আর হয় না, মনটা না জানি কত কোমল। তার নাম রেজ্জাক, স্ত্রীলোক সেজে শিশুহরণ তার প্রধান পেশা। অজানা পুরুষের চেয়ে অচেনা স্ত্রীলোকের কাছে ছোটো ছেলেমেয়ে সহজে বশ হয়।

রেজ্জাক রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। রেজ্জাক মেয়েলি ঢংয়ে মেয়েলি সুরে কথা কয়। বলে, ইয়াসিন সাব একটু ডাকছিল গো।

নাজিম ইতস্তত করে।

আজ আস্‌লি বিলাতি মাল।

গলির মধ্যে মদের দোকানে ইয়াসিন দুজন সঙ্গীর সঙ্গে গেলাস সামনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল। বিলাতি মদের এই সাদাসিধে দেশি বারটিতে দাঙ্গার আগে একদিন নাজিম এসেছিল, আপিস-ফেরত বাবুদের ভিড়ে সেদিন এত বড়ো ঘরটা সন্ধ্যার আগেই গমগম করছিল। বসবার ব্যবস্থা সস্তা কাঠের লম্বা-লম্বা টেবিল ও বেঞ্চ, আজ সেগুলি বেশির ভাগ খালি পড়ে আছে। বারটা যে পাড়ার মধ্যে পড়েছে তাতে ইয়াসিনের জাতভাই ছাড়া ভরসা করে ফুর্তি করতে আসবে না সহজেই বোঝা যায়। বিশেষভাবে ইয়াসিনরা সদলবলে দখল করে থাকায় তাদের জাতভাইরাও অনেকে এখানে ঢুকতে সাহস পায় না। ইয়াসিনদের কাছে নিজের জাত পরের জাত খানিকটা

সুবিধার ব্যাপার মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। এ শহরে অত ধর্মের আত্মীয়তা মেনে গুন্ডামির ব্যাবসা চালানো যায় না। ইয়াসিন নিজেই বলে যে অত মানতে গেলে পলিটিক্স করতে হয়, তাদের ব্যাবসা চলে না।

নাজিমের এ সব অজানা নয়। তার গা ছমছম করে। তবু সেই আতঙ্কের মধ্যেই সে এক নতুন উন্মাদনার সন্ধান পায়। যে হিংসা ও ক্ষোভের জ্বালা সে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না, এমনি সব ভয়ানক মানুষের সংস্পর্শে এমনি পরিবেশে একটা বেপরোয়া মরিয়া ভাবের মধ্যে সে তা থেকে খানিকটা মুক্তি পায়। এক চুমুকে সে গ্লাসের অনভ্যস্ত পানীয় অর্ধেকটা পেটে চালান করে দেয়, আগলহীন বিহ্বল কল্পনায় নানির হত্যার উদ্ভট অমানুষিক প্রতিশোধের ঘটনা ঘটিয়ে চলতে থাকে।

ইয়াসিন বলে, ঔর মত পিজিয়ে ভাই।

নাজিম বলে, আরে ভাই, লাও লাও। সব ঠিক হ্যায়।

ইয়াসিন মুখ বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকায়। দুদিন দেখে মানুষটার ওপর তার পর্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। একে দিয়ে কী হবে ? কোনো কাজের, কোনো দায়িত্বের যোগ্যতা কি এর আছে ? মানুষ মাপার মাপকাঠি ইয়াসিনেরও আছে, একদিকে তাকেও কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। অনেক ভয়ংকর লোকের সঙ্গে তার কারবার, নিজে শক্ত না হলে শক্ত হাতে দলকে শাসনে রাখার, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেকিয়ে চলার সাধ্য তার হত না, কবে সে ধ্বংস হয়ে যেত তার মিথ্যার ভাঁওতায় স্বার্থের বিরামহীন সংঘাতের জগতে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই বার বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায় নাজিমের।

রাস্তায় তাকে একা রেখে ইয়াসিনেরা চলে যায়। ইয়াসিন কেন তাকে ডেকেছিল জানবার কৌতূহলও দেখা যায় না নাজিমের।

চলতে চলতে ইয়াসিন বলে বাজে মার্কা লোক।

রেজ্জাক বলে, বউটা ওকে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছে।

বউ ?

আঃ ! রেজ্জাক যেন মেয়েলি ভঙ্গিতে জিভ চেটে স্বাদ পায়, বহুৎ খাপসুরত বিবি আছে ওর। সিনেমা স্টারসে আচ্ছা।

শুনে ইয়াসিন কৌতূহল অনুভব করে।

নাজিম টলতে টলতে এগিয়ে চলে। নেশার সঙ্গে রাগটা তার জমাট বেঁধেছে পরীবাণুর ওপর ! মনটা গিয়েছে বাড়ির দিকে, কাল্লু কখন সঙ্গ নেয় সে ভালো বুঝতে পারে না। কাল্লুই তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সেদিন রাত্রে প্রতিবেশীরা প্রথম পরীবাণুর কান্না ও চিৎকার শোনে।

কাল্লু মিস্ত্রির ঘর নাজিমের ঘরের লাগাও। তার স্ত্রী রাবেয়া বলে, লোকটার হল কী ?

কাল্লু বলে শয়তানের খপ্পরে পড়েছে, মাথা বিগড়ে গেছে। খুব মাল টানছে ইয়াসিন মিঞাদের সঙ্গে।

এমনি বেশ ভালো ছিল লোকটা।

অমন ভালো সবাই থাকে। কে কেমন চিজ ইমানদারিতে জানা যায়। সব খবর না জানতে পারে, মোটমাট তো জানা আছে নানির জানটা কেন গেল ? কিন্তু জেনেও জানবে না, সে মুরোদ নেই—নাজেরালি সাবের মোসায়েব তো। বড়োলোকের পা-চাটা কুত্তা এমনি করে, ঘরে বিবির ওপর ঝাল ঝেড়ে দেখায় আমি মস্ত মরদ।

কাল্লুর ঝাঁঝালো সমালোচনায় রাবেয়া একটু হকচকিয়ে যায়। মানুষটার চিরদিন এ রকম সহজ স্পষ্ট কথা। ওজনদার লোকেরা তাকে তাই বড়োই অপছন্দ করে। তবে গরিব খাটুয়েদের মধ্যে খাতির দিয়ে সেটা বোধ হয় পুষিয়েও বেশি হয়েছে। বস্তির লোকে তাকে বিশ্বাস করে, এ পাড়ায় আগুন জ্বলে উঠেও যে ঝিমিয়ে আছে, নানির হত্যা নাজেরালিদের আশানুরূপ ফলপ্রদ হয়নি, সে জন্য কাল্লুও অনেকটা দায়ি।

পরীবাণুর চাপা-কান্নার আওয়াজ থেমে যায়—বাইরে থেকে আর শোনা যায় না। ঘরে কান্না তার থেমেছে কিনা সেটা অবশ্য অনুমান করা যায় না। কয়েকটি কণ্ঠ থেকে আচমকা উগ্র হিংসার ধ্বনি রাত্রির আকাশে কর্কশ আঁচড় কাটে—আরও কতগুলি কণ্ঠ থেকে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। জবাবের মতো দূরে শোনা যায় তেমনি কর্কশ আওয়াজের ওঠা-নামা। খানিক আগে পরীবাণুর তীক্ষ্ণ বেদনার্ত চিৎকার যেন স্বপ্নের পর্যায়ে চলে যায়।

রাবেয়া বলে, লোকটা হয়তো জানে না ? ওরা হয়তো অন্য রকম বুঝিয়েছে ? কাল একদফা বাতচিত কর না ?

কাল্লু বলে, কুলিমজুরের সাথে বাতচিত করতে কি গরজ হবে ?

তবু সে রাবেয়ার কথা রাখে, সকালে কাজে যাবার আগে নাজিমের ঘর হয়ে যায়। নাজিম তখন মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। রাত্রির আঘাতেব চিহ্ন গোপন করতে পরীবাণু মুখ ঢেকে কাল্লুর সামনে আসে, কাল্লুর কাছে তার পর্দা ছিল না। তাকে কাল্লু জানিয়ে যায়, বিকালে সে আপিসে নাজিমের সঙ্গে দেখা করবে, জরুরি কথা আছে। কাল্লুর খাটুনি চারটে পর্যন্ত, তবু যদি কোনো কারণে দেরি হয়, নাজিম যেন কাজের পরেও তার জন্য অপেক্ষা করে।

পাঁচটার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে আপিসে খবর নিয়ে কাল্লু শুনতে পায়, দপ্তরি নাজিম একঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কাল্লু নিজের মনে বলে, শালা বেইমান !

দপ্তরির এই চাকরিটা পেয়ে মস্ত লোক হবার আগে বড়োই যখন খারাপ সময় চলছিল তখন কাল্লুর কাছে পাওয়া উপকারগুলির কথা নাজিমের মনে নেই। মনে থাকলে নেহাত জরুরি কাজে বেরিয়ে যেতে হলেও অন্তত একটা খবর সে রেখে যেত কাল্লুর জন্য।

বস্তিতে ফিরে ঘরের সামনে ছোটো মোড়ায় নাজিমকে বসে থাকতে দেখে কাল্লু একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। তবে বুঝতে পারে, এটা কালকের প্রতিক্রিয়া। পাকা গুন্ডাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করা এখনও তার আয়ত্ত হয়নি। নেশার ঝোঁকে একদিন বউকে মার-ধর করলে পরদিন মনটা এখনও তার খুব বিগড়েও যায়—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভালো ছেলে হয়ে একটু প্রায়শ্চিত্ত করার সাধ জাগে।

এই যে কাল্লু ভাই ! কী কথা আছে বলছিলে ?

সস্তা কাঠের একটা জলচৌকিতে সে কাল্লুকে বসতে দেয়, একটা বিড়িও দেয়। এটাও কালকের গুন্ডামির প্রতিক্রিয়া, নয় তো কাল্লুকে এতটুকু খাতির করতেও অনেকদিন আগেই নাজিম ভুলে গিয়েছিল।

কাল্লুকে বেশ খানিকক্ষণ বসতে হয়।

যে কথা সে বলতে এসেছে তা আচমকা বলার নয়। নাজিমের মানসিক অবস্থাও শোচনীয়, কী বলতে সে কী বুঝে ফেলে কিছুই ঠিক নেই। ভালো কথা শুনে হঠাৎ রেগে যাওয়াই তার পক্ষে বেশি সম্ভব।

বেশ খানিকটা ভূমিকা করে রইয়ে সইয়ে কাল্লু তাকে নানির হত্যাকাণ্ডের পিছনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানায়। নাজিম শান্তভাবেই সব কথা শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না।

' বলে, এ সব ঝুটা বাত।

আজিজকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে। ক-রোজ নাজের আলি ইয়াসিন সিংহী এরা বাত-চিত করছিল।

বাতচিত কী হয়েছিল আজিজ কি জানবে ?

কেরামত আর খালেকও জানে।

ওরা তোমাদের দলের লোক।

কাল্লু বিরক্ত হয়ে বলে, এটা কী বলছ তুমি, অ্যাঁ ? বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা তোমাকে আমিই বা বলব কেন, ওরাই বা বলবে কেন ?

আল্লা জানে কী মতলব তোমাদের। নাজের আলি সাব বলেন, পাকিস্তানে গরিবেব কিছু হবে না, এ বাত যারা বলে তারা বেইমান।

তারা যদি ফের এ বাতও বলে যে হিন্দুস্তানেও গরিবের কিছু হবে না ? যদি বলে আপসের এ কারবার বেইমানি ?

নাজিম আর কথা কয় না ! এ বিষয়ে তর্ক করতেও তাকে নারাজ দেখা যায়। সে কিছু বুঝতে চায় না, যে ধারণাটা জন্মেছে তাই অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকবে। কাল্লু জানত, সহজ সাধারণ যুক্তি মানবার মতো মনের অবস্থা নাজিমের নেই, নাজের আলি ইয়াসিনেবা মনকে তার বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার বউ জোর না করলে নাজিমকে বোঝাবার এই মিথ্যা চেষ্টাও সে কবত না। সেও আব কথা না বাড়িয়ে ফিরে যায়।

তার বউ বলে, কী হল ?

কাল্লু মাথা নাড়ে।

সেদিন রাত্রে আবার নাজিম মাতাল হয়ে ঘরে ফেরে, নাজের আলির মৌটরে। বস্তির কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আজিজ তাকে ধর্‌াধরি করে ঘরে পৌঁছে দেয়।

পরদিন জানা যায়, নাজের আলি ড্রাইভার আজিজকে বরখাস্ত করেছে।

কাল্লু শুনে বলে, শালা নাজিমের কাজ এটা।

আচমকা এভাবে আজিজের চাকরি যাওয়ার কারণটা সে সহজেই অনুমান করতে পারে। নানির বিষয় কথা বলার সময় প্রসঙ্গক্রমে সে আজিজের নাম উল্লেখ করেছিল। নাজিম সে কথা নাজের আলিকে জানিয়ে দিয়েছে। তার সম্বন্ধেও যে অনেক কথা নাজিম নাজের আলিকে জানিয়েছে তার প্রমাণ পেতেও বেশি বিলম্ব হয় না।

সন্ধ্যাবেলা মুদি দোকান থেকে কয়েকটা সওদা কিনে কাল্লু ঘরে ফিরছে, বস্তিতে ঢুকবার মুখে আবদুলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হাতের ডাল-মশলা ছড়িয়ে পড়ে, তেলের শিশিটা ছিটকে পড়ে ভেঙে যায়। ইচ্ছা করে গায়ে না পড়লে পথ চলতি দুটি মানুষের মধ্যে এত জোরে সংঘর্ষ সম্ভব হয় না এবং যে ধাক্কা দেয় প্রতিবাদ শোনামাত্র নরম হয়ে মাপ চাওয়ার বদলে সে এমনভাবে রুখেও ওঠে না।

দুজনের বচসা বাধতে না বাধতে কোথা থেকে আরও পাঁচ-সাতজন এসে জোটে, সকলে মিলে একা কাল্লুর উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে মারতে আরম্ভ করে দেয়। বস্তির কাছাকাছি ঘরের মানুষগুলি হইচই করে বেরিয়ে এসে কাল্লুকে ছাড়িয়ে নেয়।

কী ব্যাপার ?

আবদুল পাতলা পাঞ্জাবি-পরা আধবুড়ো একটি লোককে দেখিয়ে বলে, এর পকেট মেরেছে। ব্যাগটা নিয়ে ভাগছিল।

লোকটির হাতে একটা জীর্ণ মনিব্যাগ ছিল, সেটি সে তুলে ধরে দেখায়।

পকেট মেরেছে ! আবদুল নাম করা পকেটমার, দাগি আসামি, তাকে বুক ফুলিয়ে কাল্লুর নামে পকেটমারার অভিযোগ করতে শুনে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যেও অনেকের হাসি পায়। জগতে সবাই যেন পকেট মারে আবদুলের মতো এবং ধরা পড়লে মার খায়। তবে ধরা পড়ে মার খেয়ে আবদুলের যেমন প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার সাধটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কাল্লুর তা দেখা যায় না। আবদুলের গালে সে প্রচণ্ড একটা চাপড় বসিয়ে দেয়।

কাল্লুর পক্ষ নিতে বস্তির লোকেরা একটু ইতস্তত করছিল। তারা বেশির ভাগ কল-কারখানার মজুর, কাল্লুকে তারা ভালো করেই চেনে,—কিন্তু এতগুলি লোক বলছে পকেট থেকে ব্যাগটা তোলার সময় কাল্লুকে তারা হাতেনাতে ধরেছে। বুড়ো রহমান এগিয়ে আরেকটা দলবদ্ধ উদ্যত আক্রমণ থেকে কাল্লুকে টেনে সরিয়ে আড়াল করে দাঁড়ানোয় বস্তির লোকেরাও এগিয়ে যায়।

রহমান বলে, খপর্দার, মারপিট চলবে না !

আবদুলেরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, পকেটমারকে পিটব না ? কী তাজ্জব !

রহমান বলে, পকেট মেরেছে, থানায় লিয়ে চলো। তোমরা এত আদমি সাক্ষী আছ, কয়েদ হয়ে যাবে। চলো, আমরা সাথে যাব।

প্রস্তাব শুনে তারা ভড়কে যায় ! আধবুড়ো লোকটি, যার পকেট মারা গেছে, সে বলে, অত হাঙ্গামায় কাজ কী ? ব্যাগ তো মিলে গেছে। ছেড়ে দাও, যাক গে।

রহমান বলে, তোমার নাম সালেক না ? তুমি দুর্গা লেনের বস্তিতে থাক ?

সালেক বোধ হয় ভাবতেও পারেনি এত দূরে এখানে তার চেনা লোক কেউ বেরিয়ে পড়বে, এই বেশেও তাকে চিনতে পারবে। সে জবাব দেয় না।

রহমান আবার বলে, এবার তোমার কয়েদ হয়েছিল কেন সালেক ? কত রোজ থেকে ছাড়া পেয়েছ ?

সালেক বিব্রত হয়ে বলে, কী বলছ তুমি আবোল-তাবোল যা-তা কথা ? একজনার নামে বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল ! চলো চলো, আমরা যাই।

রহমান বলে, আবে আরে, যাবে কোথা ? মোদের পাড়ায় এসে পকেটমাব পাকড়েছ, তাকে নিয়ে থানায় চলো আগে। চলো থানায় ডাইরি করবে ! মোদের আদমিকে ঝুটমুট পকেটমার বলে পিটে ভেগে যাবে, সেটি চলবে না হুজুর !

আবদুল সালেকেরা তখন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলে বাঁচে। এটা যে প্রধানত মজুরবস্তি তাদের তা জানা ছিল না, জানলে এখানে এসে এভাবে কাল্লুকে মারপিট করতে সাহস পেত কিনা সন্দেহ। পালাতে পালাতে ক্রুদ্ধ বস্তিবাসীর হাতে তারা কাল্লুকে যত না মেরেছিল সুদে-আসলে তার অনেক গুণ তাদের জুটে যায়।

কাল্লুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে আশ্চর্যরকম খুশি আর চাঙ্গা মনে হয়। কিছু তেল ডাল মশলার ক্ষতি আর কতগুলি গুন্ডার হাতে কিছু মার খাওয়ার পরিবর্তে সে যেন অনেক বেশি দামি প্রতিদান পেয়েছে তার বস্তিবাসী মানুষদের কাছে।

এই ব্যস্ত নগরের প্রাসাদ থেকে আস্তাকুঁড়েতে পর্যন্ত মানুষের যে ব্যস্ততা তার তুলনা নেই। জীবনের গতি এখানে তীব্র, অল্প সময়ে অনেকখানি জীবনঠাসা, গ্রাম্য শিথিলতা এখানে মানুষ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। চলা-ফেরা আহার-বিহার কাজ-কর্ম সব বিষয়েই অসীম ব্যস্ততা। জীবনধারণের জন্য যে খাদ্য গ্রহণ তাতেও দেবার মতো যথেষ্ট সময় মানুষের নেই।

তবু এই ব্যস্ততার মধ্যেও মানুষ অবসর খুঁজে নেয়, বিলাসের অবসর। সিনেমা দেখে রেডিয়ো শুনে তাস পিটে রেস খেলে মদ খেয়ে মেয়েমানুষ নাচিয়ে হোটেলে ভোজ খেয়ে শহরে টাকার লোভে ব্যস্ত পাগলেরা জীবনের উর্ধ্বশ্বাস গতিতে ঢিল দেবার চেষ্টা করে। সন্ধ্যার পর সংগীতমুখর আলোয় ঝলমল বড়ো হোটেলে গেলে প্রথমে মনে হবে, সত্যই বুঝি এখানে ব্যস্ততা নেই—শান্ত না হোক, জীবন এখানে ধীর। দশ মিনিট বসলে কিন্তু ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। আপিসের চেয়ারে মানুষগুলি বসে থাকে শান্ত ধীরভাবে অথচ প্রতিটি মুহূর্ত লাভের পিছনে উদ্দাম গতিতে তার সমস্ত চেতনা ছুটে চলে, এখানেও তেমনিভাবে হোটেলের চেয়ারে বসে জীবন থেকে পান-ভোজন ও উপভোগ আদায়ের লিপ্সায় সে উন্মত্ত হয়েই থাকে। সন্ধ্যার দিকে এটা আড়াল থাকে, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে বাইরে ফুটে বেরোয়। উন্মত্তের মতোই তারা তখন নাচে গায় হাসে হাত-পা ছোঁড়ে কথা কয়।

নীচের স্তরে নামতে থাক--একই ব্যাপার। শুধু পরিবেশ বদল হয়ে যাবে উপকরণ ও আয়োজনের রিক্ততা ও দীনতায়।

প্রণবদের বাড়ি যে দুর্গা ঝি কাজ করে তার মাসি প্রমদা ফুলুরি বেগুনি পেঁয়াজ বড়া বেচে দিন চালায়। সম্বল তার একটি তোলা উনান, একটা লোহার কড়াই, একটি বাবকোশ আর কয়েকটা ছোটোবড়ো মুখকাটা টিন। দেশি মদের দোকানটার গা ঘেঁষে একটা ভাঙনধরা একতলা বাড়ির ভাঙা সরু রোয়াকটির কোণে বসে সে তার সুখাদ্যগুলি তেলে ভেজে বাবকোশে সাজিয়ে রাখে। কড়াইয়ের তেল কখনও বদল হয় না, তেল কমে এলে তাতেই আবার খানিকটা কাঁচা তেল ঢেলে দেয়। বিক্রি না হলেও বাসি ভাজি কখনও ফেলা যায় না, গরম তেলে ডুবিয়ে একবার শুধু শুধরে নেওয়া হয়।

মদের দোকান আজকাল তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। মদ পেটে গিয়ে মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রবৃত্তি উসকিয়ে দেয়, আইডিয়াটা হল এই। মাতাল যেন কোনোদিন বউকে মারা আর এলোমেলো হল্লা করা ছাড়া বড়ো হাঙ্গামায় মাতার সাধ-আহ্লাদ রাখে বা তাতে স্বোয়াদ পায়। মদের পিপাসা একটা ব্যারাম—মানসিক ব্যাধি নয়, অত্যন্ত স্থূল বাস্তব রোগ। রোগী না কি দাঙ্গা করে !

দুর্গার মাসি প্রমদা পর্যন্ত এটা জানে। তার সাধ্যমতো জানে। সে বলে, এ রোগে ধরলে যার অদেষ্টে যেমন। ঠিক যেমন জ্বর-জ্বারি কলেরা মা-র দয়া—একে অল্পে খালাস দিচ্ছে, ওকে সাবাড় করছে। অ্যাদ্দিন তো দেখছি, আমি জানি। একজন চুপচাপ আসে, অল্প করে খায়, চুপচাপ ঘর চলে যায়। দিন নয়, মাস নয়, বছরের পর বছর—একদিন একটিবার বাড়াবাড়ি নেই। আরেকজন শুরু করতে না করতে আকাশে চড়িয়ে দেয়, রোজ খানায় পড়ে। বছর ঘুরতে দেখায় যেন শ্মশানঘাটের জ্যান্ত মড়া। এ বড়ো ব্যারাম বাবা, ধনে-প্রাণে মারে !

দুদিন নাজিমের ধেনো খাওয়ার রকম দেখেই টের পাওয়া যায়, সে শেষের পর্যায়ের রোগী।

ইয়াসিন তাকে ছেঁটে ফেলার কথা ভাবছিল। কোনো মতলব হাঁসিল করতেই লোকটা কাজে আসবে না এই হয়েছিল নাজিমের সম্পর্কে তার ধারণা। রেজ্জাকের সঙ্গে আচমকা একদিন বেলা এগারোটার সময় তার বাড়িতে হাজির হয়ে পরীবাণুকে সে দু-তিনমিনিটের জন্য দেখে গেছে। নাজিম অবশ্যই তখন বাড়ি ছিল না, কাজে গিয়েছিল। রেজ্জাক মেয়ে সেজে গিয়েছিল, মলমলের পোশাক জরি-চুমকি বসানো ওড়নায় সম্ভ্রান্ত ঘরের প্রৌঢ়া মহিলার বেশ ধরে। সঙ্গে ছিল আট-নবছরের একটি ছেলে। পরীবাণুকে পর্দা বাতিল করিয়ে সে ইয়াসিনের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তবে কথা বলাতে পারেনি, দু-একমিনিটের বেশি দাঁড় করিয়ে রাখতেও পারেনি। ইয়াসিনের দৃষ্টিপাতে পরীবাণুর সর্বাঙ্গ উৎকট লজ্জায় শিরশির করে উঠেছিল। আচমকা সে পালিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

তারপর থেকে ইয়াসিন আবার নাজিমের সঙ্গে খাতির করছে। পরপর দুসন্ধ্যা নিজের সঙ্গে বিলাতি-বারে বিলাতি খাইয়েছে, যত সে খেতে পারে। একজন দোস্ত সে জুটিয়ে দিয়েছে নাজিমকে।

তার নাম ইয়াকুব। নাজিমের সমান পর্যায়ের মানুষ, বেশভূষা চালচলন কথাবার্তা সব দিক দিয়ে। শুধু বয়সটা তার কিছু বেশি হবে। মনটা তার আশ্চর্যরকম উদার ! নাজিমের চেয়ে বিশেষ বড়োলোক না হলেও দুদিন সে নাজিমকে মদ খাইয়েছে। ইয়াসিন সেদিন তাকে ডাকেনি, কোথায় যাবে কী করবে ভেবে কাজের শেষে বিকালের দিকে গভীব হতাশা আর জোরদার কিছু করার অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষাময় উত্তেজনা জেগেছিল নাজিমের।

হঠাৎ ইয়াকুব এসে হাজির। তার স্ফূর্তি করার সাধ জেগেছে, কিন্তু একা কি স্ফূর্তি করা যায় ? নাজিমকে সঙ্গে যেতে হবে। যেতে হবেই, ইয়াকুব ছাড়বে না, নাজিমকে তার বড়োই পছন্দ হয়েছে। ছুটি হতে এখনও একঘণ্টা বাকি ? ছোঃ, একটা বাচ্চার বুদ্ধিও নাজিমের নেই !

ইয়াকুব সেদিন তাকে প্রথম দেশি মদ খাওয়ায়। অ্যালকোহল নয়, স্পিরিট। যত সে খেতে পারে। সে রাত্রে অজ্ঞান মৃতপ্রায় নাজিমকে নিজের গাড়িতে ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়ে ইয়াসিন ইচ্ছা করলেই পরীবাণুকে ভোগ করতে পারত। পরীবাণুও মেয়েলি বোধশক্তিতে ভাবছিল যে ওই রকম কিছু বোধ হয় ঘটবে। কিন্তু ইয়াসিন সস্তা, সাধারণ গুন্ডা নয়, সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী এই কলকাতায় প্রায় পৌনে এক স্কোয়ার মাইল এলাকার গুন্ডাদের বাদশা। সে ইংরেজি জানে, ইংরেজি বই পড়তে পারে, ইংরেজি সব ছায়াছবির কথোপকথনের মোটামুটি মানে বোঝে !

তাই, পরীবাণুকে অভয় দিয়ে সে ফিরে যায়। কৃতজ্ঞতায় ঘুম অচল ও বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরীবাণু তার বস্তির ঘরের বাঁশের বাতার শিক-বসানো ছোটো জানালাটিতে মুখ রেখে আকাশ-পাতাল ভাবে। ভাবনার আকাশেও থাকে তার নসিব, পাতালেও থাকে তার নসিব। বুকের মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভ উথলে ওঠে, কেন তার নসিব এমন হল ? তার নাকি রূপ-যৌবন আছে, অনেক মেয়ের চেয়ে সে নাকি অনেক বেশি খাপসুরত ? কেন তবে তার বস্তির এই ছোটো ঘরটিতেও ভাঙন ধরল ?

নেশায় অচৈতন্য নাজিম ভিতরের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখবার সাধও পরীবাণুর হয় না। নাজিমের আকস্মিক পরিবর্তনে প্রথমটা সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হতাশ হয়নি। ভেবেছিল, নানির মরণের আঘাতে সাময়িকভাবে মাথাটা বিগড়ে গেছে, ঠিক হয়ে যাবে। নেশাব ঘোরে নাজিমের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারেও সে দমেনি। ভেবেছে, নাজিম তো তাকে মারেনি, নাজিমের মগজ দখল করে তাকে মেরেছে ওই শয়তান নেশা। ওই নেশা তার দুশমন, নাজিম নয়। নেশা করা কোনোদিন নাজিমেব ধাতে ছিল না, গভীর দুঃখে সে মদ খেয়ে নিজেকে সামলাতে পারে না। তার কী দোষ ?

কিন্তু সব আশা ঘুচে গেছে পরীবাণুর। ভয়ে ভয়ে আজকেই সে নাজিমকে ইয়াসিনের কথা বলেছিল, লোকটার যে মতলব সে আন্দাজ করেছে তা-ও জানিয়েছিল। শুনে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল নাজিমের। তখন সকাল, মাথা থেকে নেশার শয়তান উপে গেছে, রেখে গেছে শুধু অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া।

শালাকে খুন করব।

না না, হাঙ্গামা কোরো না। ওর সাথে না মিশলেই ফুরিয়ে গেল ! সকাল সকাল ঘরে চলে এসো।

সেই নাজিম আজ রাত্রেই আবার সেই ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেয়ে তারই গাড়িতে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি ফিরেছে। এ অবস্থায় না হয় তার খেয়াল নেই যে তাকে ঘরে পৌঁছে দিতে এসে আবর্জনার মতো তাকে একপাশে ফেলে রেখে ইয়াসিন তার পরীবাণুর দিকে হাত বাড়ালে কারও কিছু করার থাকত না। কিন্তু ইয়াসিনের সঙ্গে মদ খেতে বসার আগেও কি পরীবাণুর সকালবেলার

কথাগুলি নাজিমের মনে পড়েনি ? মদ খেতে খেতে জ্ঞান লোপ পাবার আগে একবারও কি খেয়াল হয়নি গাঁটের পয়সা খরচ করে কেন এ লোকটা তাকে মদ খাওয়ায় ?

নিশ্চয় মনে পড়েছে, খেয়ালও হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। নতুন নেশার কাছে পরীবাণু তার তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দূরে কোথায় আগুন লেগেছে। পরীবাণুর এই জানালা থেকে আগুন দেখা যায় না, শুধু চোখে পড়ে খানিকটা রক্তিম আকাশ। সেদিকে চেয়ে পরীবাণুর ভাবনায় ভাবনায় লালচে মারা চোখ ফেটে জল আসে।

পরদিন দুপুরে রেজ্জাক আসে। তেমনি মেয়েমানুষের বেশে। কানের একজোড়া সোনার ফুল পরীবাণুকে দিয়ে সে বলে, ইয়াসিন সাব পাঠিয়েছে। তোমার জন্য পাগল হয়ে গেছে লোকটা।

তাকে ইয়াসিনের কথা শোনায় রেজ্জাক। কত তার টাকা, কত তার প্রভাব প্রতিপত্তি আর কী দরাজ তার দিল। সোনার ফুল হাতে করে পরীবাণু নিঃশব্দে শুনে যায়।

রেজ্জাক বলে, চলো না, গাড়ি চেপে হাওয়া খেয়ে আসি ?

পরীবাণু মাথা নাড়ে—ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে তার আতঙ্ক টের পেয়ে রেজ্জাক মেয়েলি ভঙ্গিতে মুখ টিপে হাসে। বলে, আচ্ছা আচ্ছা, আগে ভাব হোক, ভয় ভাঙুক, কেমন কি না ? আজ রাতে এসে ভাব করে যাক !

ঘরের মালিকের সামনে ?

রেজ্জাক আবার মুখ টিপে হাসে।—মালিক আজ ঘরে ফিরবে না গো, তার মন বাইবে গেছে। কাল ইয়াসিন সাব জোর করে তুলে এনে ঘরে পৌঁছে দিল বলে তো, নইলে নতুন বিবির ঘরেই ঘুমিয়ে থাকত।

এ কথা পরীবাণু কাল রাত্রেই শুনেছিল। এ কথা শোনার পরেই মনটা তার একেবারে বিগড়ে গেছে। যার ঘরে রাত কাটাতে এত ব্যাকুল নাজিম, সে কি তার চেয়েও খাপসুরত ?

প্রমদার একটু জ্বর এসেছিল। দুর্গা তাই সেদিন গিয়েছিল তার তেলেভাজার কারবার বজায় রাখতে। মাঝে মাঝে দুর্গা গিয়ে মাসির কাছে বসে, ফুলুরি বেগুনি পেঁয়াজ বড়া বিক্রি দ্যাখে। প্রমদা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গেলে নিজেও বিক্রি করে। কোনটার কত দাম তার জানা আছে। মাতাল ক্রেতা তেলেভাজার বদলে তাকেই কিনতে চাইলে কীভাবে তাকে ঠেকাতে হয় তাও দুর্গার অজানা নয়।

বস্তিতে বাস, ঝি-গিরি করে পেট চালায়, বয়স কম। এ সব না জানা থাকলে চলে না।

নাজিম সেদিন হাঙ্গামা করে। ইয়াকুবের সঙ্গে মদের দোকানে ঢোকার সময় দুর্গার কাছ থেকে সে তেলেভাজা কিনেছে, দুর্গার দিকে ভালো করে চেয়েও দ্যাখেনি। দোকান থেকে বেরিয়ে নজরে পড়তেই তার মনে হয় দুর্গা ছাড়া তার এ জগতে আর কেউ নেই।

দুর্গা কড়া গলায় ইয়াকুবকে বলে, সামলে নিয়ে চলে যাও না বাবু ?

ইয়াকুব একটা আস্ত দশ-টাকার নোট তার সামনে ধরে বলে, আজ রাতটা তুমিই সামলাও না ?

দশ টাকা ! এক বাড়িতে পুরো এক মাস বাসন-মাজা ঘর-ঝাঁটানো মশলা-বাটা কয়লা-ভাঙ্গা জল-তোলার খাটুনির দাম !

দুর্গা তবু বলে, আমি পারবোনি।

ইয়াকুব কাঁচা একটা টাকা বার করে বলে, কে পারবে দেখিয়ে দাও না। নোটটা সে নেবে, তুমি টাকাটা নিয়ো।

এগারোটা করকরে টাকা ! দুর্গা নাজিমকে ভালো করে চেয়ে দ্যাখে। মোটামুটি ভদ্র চেহারা, ধুতি আর পাঞ্জাবি ফরসা। দুর্গা মরিয়া হয়ে নোট আর টাকাটা ছিনিয়ে নেয়, বলে, আচ্ছা, আমিই সামলাবো।

নাজিমকে দুর্গা ঘরে নিয়ে যায়। এগারোটা টাকা পেয়েছে, একটা বাড়িতে পুরো একমাস খেটেও যা সে পায় না, তাই তাড়াতাড়ি মাটির ঘরের মাটির প্রদীপ নিবিয়ে সে নাজিমের পাশে শোয়। পুরুষালি ব্যবহারের ভয়ংকরতম নমুনা পাবার ভয়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে রাখে।

মড়ার মতো পড়ে থাকে নাজিম।

খানিক পরে দুর্গা ওঠে। আবার তার মাটির ঘরের মাটির প্রদীপ জ্বালে। জল এনে নাজিমের মাথা ধুইয়ে দেয়। পাখাটা খুঁজে এনে নাজিমের মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

তখন অল্পে অল্পে তার মনে হতে থাকে মানুষটা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে ! পথে-বাজারে হোক, অন্য কোথাও হোক, আগে যেন দু-একবার দেখেছে এ লোকটাকে। প্রদীপটা তুলে এনে মুখের কাছে ধরে দুর্গা ঠাহর করে দ্যাখে। মনে পড়ি-পড়ি করে মনে পড়তে চায় না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটা এমনভাবে রহস্যময় হয়ে ওঠে যে সেটা রীতিমতো ভয়-ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় দুর্গার পক্ষে !

প্রদীপটা রাখতে রাখতে আচমকা নাজিমের পথে দেখা মূর্তিটা দুর্গার মনে ঝলক মেরে যায়— ধুতির বদলে লুঙ্গি পরা নাজিম, ছককাটা ছাপমারা লুঙ্গি।

কী সর্বনাশ ! দুর্গার গা কাঁপে, সে শিউরে ওঠে। জানাজানি হলে কী হবে ? পাড়ায়, ঝি-সমাজে তার লজ্জা আর কেলেঙ্কারির সীমা থাকবে না। মানুষটা ও পাড়ার বস্তির, তার চিনতে দেরি হলেও এ পাড়ার অনেকেই হয়তো তাকে ভালো করেই চেনে, নাম জানে, পরিচয় জানে। কে জানে, কেউ দেখেছে কিনা ঘরে আনবার সময় ?

প্রমদা একনজর তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। অনেক দিন ইতস্তত করে দুর্গা যে আজ মনস্থির করেছে, প্রথমবার পুরুষ নিয়ে ঘরে এসেছে, এটা প্রমদার খুশি-অখুশির ব্যাপার নয়। দেশে যাবার নাম করে দুর্গার স্বামী এক বছরের ওপর ভেগেছে, পরে জানা গেছে সে রেলপুলের কাছের বস্তিতে আরেকটি মেয়েমানুষের সঙ্গে বসবাস করেছে। এ অবস্থায় কী করবে না করবে দুর্গারই স্থির করার কথা, আর কোনো চারা নেই। তবে ভাজি বেচতে গিয়ে পথ থেকে আচমকা একজনকে কুড়িয়ে না আনলেই প্রমদা সুখী হত। এর চেয়ে ক-দিন চেনাজানা হবার পর একটু যাচাই-করা মানুষের সাথে ঘর বাঁধা ভালো।

কী করবে ভেবে না পেয়ে দুর্গা এসে প্রমদাকে বলে, মাসি, লোকটাকে চিনিস নাকি দেখবি আয় তো ?

আমি যাব না।

বড়ো ঝঞ্ঝাট হল মাসি, পায়ে পড়ি আয়। বেঘোর হয়ে পড়ে আছে। তোর ডরটা কী ?

ঝঞ্ঝাট কীসের ?

প্রমদা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে আসে। নাজিমকে দেখে আঁতকে উঠে বলে, মা গো মা দুগ্‌গা, তোর কাণ্ডজ্ঞান নাই ? একটা বেজাতকে নিয়ে এসেছিস !

আস্তে কথা বল মাসি, লোকে শুনবে না ? কী করি এখন বল দিকি ?

আনলি কেন ?

কেমন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে, মোটে চিনতে পারিনি গোড়ায়।

প্রমদা বলে, গোষ্ঠকে ডাকি ? মোরা মেয়েলোক কী করব ?

দুর্গা ভয় পেয়ে বলে, না না, গোষ্ঠকে নয়। ওর খপ্পরে পড়ব না বাবা, দফা নিকেশ করে দেবে। তবে চুপ মেরে থাক। রাত বাড়লে মোরা ধরাধরি করে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে আসব।

তুইও থাক মাসি। ঘোর কেটে যদি জেগে ওঠে ?

জ্বর গায়ে বসতে পারবনি। মোর মাথা ঘুরছে।

প্রমদা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বেজাত পুরুষটাকে আগলে ঘরে একা জেগে বসে থাকে দুর্গা। অস্পষ্ট আওয়াজ করে নাজিম একটু নড়লে চড়লে তার বুক ঢিপঢিপ করে। একগাদা মদ খেয়েছে বলেই শুধু গোড়ায় মানুষটার সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল, নইলে সুন্দর চেহারার জোয়ান মানুষটাকে বিশেষ তার অপছন্দ হয়নি। প্রদীপ নিবিয়ে পাশে শোয়ার সময় ভয়ের মধ্যেও প্রত্যাশার উত্তেজনা বোধ করেছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের অনেকগুলি রাত তার এই শয্যায় নিঃসঙ্গ কেটেছিল। নেশায় মানুষটাকে কাবু দেখে মাথায় জল ঢেলে সেবা করার সময় মন তার ভরে গিয়েছিল মমতায়। শুধু জাতটা টের পাওয়া মাত্র সেই মমতা তার ভয়ে-বিতৃষ্ণায় শত যোজন তফাতে সরে গেছে ! এখন ওকে যদি বাঘে টেনে নিয়ে যায় সে যেন বেঁচে যাবে ! অধীর হয়ে সে সময় গুনছে কতক্ষণে রাত গভীর হয়ে পাড়া নির্জন নিঝুম হয়ে যাবে, মাসির সঙ্গে ধরাধরি করে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসবে মানুষটাকে !

ক্রমে ক্রমে নাজিমের ছটফটানি বাড়ে, যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ স্পষ্টতর হয়। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে দুর্গার বোধগম্য হতে থাকে যে লোকটা ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে, অদ্ভুত রকম বিকৃত হয়ে গেছে তার মুখটা। বেশি মদ খেলে কি এ রকম হয় ? না মদের সঙ্গে অন্য কিছু খেয়েছে ? বিষ-টিষ কিছু ? সঙ্গের সেই লোকটা খাইয়ে দিয়েছে ?

হাত-পা অবশ অবসন্ন হয়ে আসে দুর্গার। হয়তো মেরে ফেলার মতলবে সঙ্গের লোকটা সত্যই একে মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে দিয়েছে, তারপর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে কেটে পড়েছে। নইলে একরাত্রির জন্য তাকে কেউ এগারোটা টাকা কখনও দেয় ? তার ঘরে এভাবে লোকটা যদি মরে যায় কী সর্বনাশ হবে তার !

কী কুক্ষণে আজ তার এই কুমতি হয়েছিল।

দুর্গা এখন করবে কী ?.

ইতিমধ্যে একসময় বমি করে নাজিম দুর্গার বিছানা ঘর-দুয়ার ভাসিয়ে দেয়। দুর্গা নিজের হাতে আজ যে ভাজি বিক্রি করেছিল সে সবও বেরিয়ে আসে তার পেট থেকে। দুর্গার গা ঘিনঘিন করে। নিজের মরণ চাইতে চাইতে সরে গিয়ে কোনায় দাঁড়ায়। নাজিম আর ছটফট করে না, গোঁঙায় না। নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। দুর্গা ভাবে, এইবার কী করবে মানুষটা ?

খানিক পরে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে নাজিম জল চায়। কোনো রকমে উঠে বসে।

তার ঘরে সে যে মরবে না, মরে গিয়ে তাকে যে ভীষণ বিপদে ফেলবে না, নাজিমের এই অনুগ্রহে দুর্গার যেন কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না—সে যে বেজাত বিধর্মী, বমি করে সে যে তার ঘর-দুয়ার নোংরা করে দিয়েছে, সব দুর্গা ভুলে যায়। জল গড়িয়ে গেলাসটা সে নাজিমের মুখে ধরে।

জল খেয়ে নিজের বমির মধ্যে চিত হয়ে পড়ে নাজিম এক রকম সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

দুর্গা বলে, শুনছ ? কথা শুনছ ?

গেলাসের তলাটা নিয়ে মাথায় ঠেলা দেয়। নাজিম নড়েও না, সাড়াও দেয় না। ভোঁস-ভোঁস নিশ্বাস ফেলে ঘুমোতে থাকে।

কলসি আর বালতিতে জল তোলা ছিল, জল ঢেলে ঝাঁটিয়ে দুর্গা মেঝেটা সাফ করে ! এটা তাকে করতেই হবে, আজ অথবা কাল। এই ঘরে না থেকে যখন তার উপায় নেই, এখনি সাফ করে ফেলা ভালো। তার স্বামী অঘোরের বমিও দু-চারবার তাকে সাফ করতে হয়েছে। নেশার অভ্যাস ছিল না অঘোরের, খেলেই বেতাল হয়ে পড়ত, আর ঠিক এমনিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড় তুলে অঘোরে ঘুমোত। জাগত শেষরাত্রে।

দুর্গার ভয়-বিহ্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যায়। পিঁড়ি পেতে বসে ঘুমে বেহুঁশ নাজিমের দিকে চেয়ে সে ভাবে, এতটা উতলা হবার কী আছে ? তার ঘরে এসেছে মানুষটা, চারিদিকে হিন্দুর বসবাস। মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক তার ভয়ের কী আছে—এ পাড়ায় এই লোকটারই বরং ভয় পাবার কথা। ঘুম ভেঙে ভালোয়-ভালোয় যেতে না চায় একটু ভড়কে দিলেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবে না। বোকামি করে ঘরে যখন এনেই ফেলেছে মানুষটাকে, মিছামিছি বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। মাসির পরামর্শটা এতক্ষণে বেশ খানিকটা খাপছাড়া ঠেকে দুর্গার কাছে ! ধরাধরি করে একটা জ্যান্ত মানুষকে রাস্তায় নিয়ে ফেলার ঝুঁকি কম নয়। কে দেখবে, কীসে কী হবে কে জানে। তার চেয়ে মানষটাকে ঘুমিয়ে নেশা কাটাতে দিয়ে রাতারাতি ভাগিয়ে দেওয়াই ভালো—যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যাবে, কেউ টের পাবে না।

করকরে নগদ টাকাগুলি হাত পেতে নিয়েছে, তার বিশ্বাসটাও তো রাখা উচিত ? জাতধর্ম শুধিয়ে যখন সে টাকা নেয়নি, মাতাল দেখেও টাকা নিতে আপত্তি করেনি, রাতটা শুধু তার ঘরে ঘুমিয়ে কাটাতে না দিলে অন্যায় হবে, পাপ হবে ! সে কি ঠক-জোচ্চোর যে টাকাটা হাতে পেয়ে কড়ার ভুলে যাবে, বাঁচুক মরুক অচৈতন্য মানুষটাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসবে ?

গভীর রাতে প্রমদা চুপিচুপি খবর নিতে আসে—দুর্গাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলে তার কিছু বখরার আশাও ছিল।

দুর্গা বলে, থাকে গে মাসি। অত হাঙ্গামার কাজ নেই। নেশা কাটলে ভোররাতে ভাগিয়ে দেব।

প্রমদা ক্রূর চোখে তাকায়, বলে, ওর সাথে তুই রইবি রেতে ?

দুর্গা বলে, রাম রাম, মোর গলায় দড়ি জোটে না ?

তোকে ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছিস ? একে ইয়ে তায় মাতাল ?

একদম কাবু হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবার সাধ্যি হবে না। তাছাড়া, প্রাণেব ডর নেই ওর ? কোন পাড়ায় এসেছে টের পেলে প্রাণটা নিয়ে কতক্ষণে ভাগবে তার চেষ্টা দেখবে না ?

ক্রূর চোখে চাইতে চাইতে প্রমদা ফিরে যায়।

পিঁড়িতে বসে ঢুলতে ঢুলতে চমকে চমকে তন্দ্রা ভেঙে দুর্গা সারারাত জেগে কাটায়। শেষরাত্রে ঠেলে তুলে দেয় নাজিমকে। বলে, মরণ-দশা পেয়েছে বুঝি তোমায়, এ পাড়ায় এয়েছ ফুর্তি করতে ?

দেখা যায়, হিসাব দুর্গার ভুল হয়নি। ব্যাপার বুঝতে একটু সময় লাগে নাজিমের, কিন্তু বুঝে পালাবার জন্য সতাই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে !

দুর্গা তাকে সাথে নিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আসে। বস্তির ঘরে ঘরে তখনও সকলে ঘুমোচ্ছে।

সকালে দুর্গা প্রমদার ঘরে ঢুকতে যাবে খবরটা দিতে, প্রমদা একেবাবে খেঁকিয়ে ওঠে ! বলে, বেরো বেরো, ঘরে ঢুকিস নে তুই আমার ! জিনিসপত্র ছুঁসনে আমার ! তোকে ছুঁতে নেই !

মাসির কাছে দুর্গার জাত গেছে ! একরাত্রে সে অস্পৃশ্যা হয়ে গেছে। সেদিনটা কাজ কামাই করতে হয় দুর্গার।

একরাত্রে এমন দুর্বল হয়ে গেছে যেন কতকাল রোগ ভোগ করে উঠেছে। রাতের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মাসির অদ্ভুত ব্যবহার এক অজানা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তার মনে। এমন একটা ফাঁড়া গেল, মাসি কোথায় একটু দরদ জানাবে, তার বদলে রাতারাতি সে যেন নিষ্ঠুর হিংস্র শত্রু হয়ে গেছে ! তার সর্বনাশ করতে না পারলে মাসির যেন শান্তি নেই।

নাজিমকে ঘরে এনে সে যেন মাসিরই এমন ক্ষতি করেছে যার পূরণ নেই। প্রতিশোধ নিতে মাসি তাই খেপে গেছে।

অথচ রাতের ব্যাপারটা মাসি কেন রটিয়ে দেয় না দুর্গা বুঝতে পারে না। যা দিনকাল, যে কাণ্ড চলছে শহরে চারিদিকে, তাতে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে সে রাতে নাজিমকে এনেছিল জানলে বস্তির মানুষ এখান থেকে তার বাস না উঠিয়ে ছাড়বে না। এ শত্রুতাটা মাসি অনায়াসেই করতে পারে। গায়ের জ্বালায় যা-তা বলে বেড়াচ্ছে, তাকে শাসাচ্ছে শাপছে অথচ আসল কথাটা মুখ দিয়ে বার করছে না। মাসির দিক থেকে এটা আরও বেশি ভয়ের কারণ হয়েছে দুর্গার। কে জানে, কী মতলব ভাঁজছে মাসি !

ঝি-রা কামাই করলে মণির গা জ্বালা করে। বিশেষত এখন যেচে ঘরকন্নার দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ায় তার দারুণ খাটুনি চলছিল। পরদিন দুর্গা যখন দেরি করে কাজে এল, মণি মনে মনে অনেকগুলি কড়া কড়া ধমক আউড়ে নিচ্ছিল। দুর্গার সাদাটে শুকনো মুখ দেখে গলার কাছে উঠে আসা গালগুলি তাকে প্রায় ঢেঁকি গেলার মতো গিলে ফেলতে হয়। কিন্তু একটা উদ্‌গার সে ছাড়ে।

বলে, সত্যি তবে অসুখ হয়েছিল, শখের কামাই নয় !

দুর্গা বলে, শখ করে কেউ কামাই করে ?

মণি ঝালের সুরে বলে, তোমরাই কর, একবার ছেড়ে দশবার ! ঝিদের এই একটা বিচ্ছিরি ব্যারাম আছে বাবা !

তারপর উদার সুরে যোগ দেয়, যাই হোক, তুমি যে ফাঁকি দিয়ে কামাই করনি তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি দুর্গা।

দুর্গার গা জ্বলে যায় তার কথার ধরনে। স্থিরচোখে চেয়ে বাঁকা হাসি হেসে সে বলে, খুশি হয়েছো নাকি ? তবে দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও !

তোদের খালি মাইনে বাড়াও, মাইনে বাড়াও ! মুখে আর কথা নেই। কী হয়েছিল তোর, এক দিনে এমন চেহারা করেছিস ?

ওরে মা রে বাবা রে ! সে কথা শুনলে তুমি ভিরমি যাবে। কাল মোকে মাম্‌দো ভূতে ধরেছিল বউদি, আসল মাম্‌দো !

রাগে মণি লাল হয়ে যায়। একটা ঝিরও তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবার তামাশা করার স্পর্ধা হয় !

এককাঁড়ি বাসন নিয়ে দুর্গা কলতলায় মাজতে বসেছে, আবির্ভাব ঘটে তার মাসি প্রমদার।

মণি তরকারি কুটছিল, হাত তিনেক তফাতে বসে প্রমদা বলে, একটা ভারী বিশেষ কথা বলতে এলাম মা।

সে যেন নেতিয়ে পড়েছে। সে যেন খবর দিতে এসেছে যে জগৎ সংসার শেষ হয়ে গেছে কিংবা যায়-যায় হয়েছে, আর বেঁচে থেকে লাভ নেই !

কী কথা বাছা ?

এই যে বলি। বড়ো দুঃখের কথা, বড়ো খারাপ কথা মা। বলতে মন চায় না মোটে। মায়ের পেটের বুনের পেটের মেয়ে তো। তা জেনেশুনে চুপ করেই বা রই কী করে ? মানুষের জাত-ধম্মো নষ্ট করিয়ে চিরটা কাল নরকে ডুবব ?

নরকে তো তোমরা ডুবেই আছ। কী বলবে বলো চট করে।

মা গো, তুমি রাগ করেছ ? বুঝেছি মা, এই দুগ্‌গা ছুঁড়ির জন্য তোমার মেজাজ ভালো নেই। ওই বজ্জাতটার কথাই বলতে এসেছি মা।

মাইনে বাড়াতে হবে ? এই সেদিন এসে ঝগড়া করে দুটাকা বাড়িয়ে নিয়েছ, আর এক পয়সাও বাড়াতে পারব না, আগে থেকে বলে রাখছি। না পোষায় কাজ ছেড়ে দিক।

প্রমদা জিভ কেটে বলে, ছি ছি, ও বজ্জাতটার হয়ে ফের বলব ? সেদিন বলতে এসেছিলাম বলেই না আজ এই নাক কান মলছি ! ছুঁড়িটা যে কত পাজি কত বেহায়া মোটে মোর দিশে ছিল না। ওটাকে আর রেখোনি মা, এই দণ্ডে দূর করে দাও। ওর ছোঁয়া জল খেতে নেই, হারামজাদি এক বেজাতের সাথে মেতেছে।

মাম্‌দো ভূত ! দুর্গাকে আসল মাম্‌দো ভূত ধরেছিল ! মণি কৌতূহলে ফেটে পড়তে চায়।

মা ! মুসলমানের সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে। ওর স্বামী ?

সে ওকে কবে ছেড়ে গেছে। ও বজ্জাতটার সাথে কে ঘর করবে বল ? সে ছিল ভালোমানুষের ব্যাটা, এ সব্বোনাশির খোয়ার কী তার সয় ? মেরে আধমরা করে রেখে জন্মের মতো ছেড়ে চলে গেছে। আহা, একেবারে শেষ করে যদি রেখে যেত গো !

একবছর ধরে প্রমদা দুর্গার পলাতক স্বামী আর তার চোদ্দোপুরুষের শ্রাদ্ধ করে এসেছে, অভিশাপ ঝেড়েছে তার সাধ্যে যতটা কুলায় ! আজ সে অঘোরের পক্ষে। যাবার আগে সরু লোহার শিক দিয়ে অঘোর দুর্গাকে অমানুষের মতো মেরেছিল, সাত দিন বিছানায় পড়ে ছিল দুর্গা, প্রথম দুদিন জ্বরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে ছিল। তখন হাতের কাছে পেলে প্রমদা অঘোরকে অনায়াসে মেরে বসতে পারত। দিবারাত্রি কাছে থেকে দুর্গার সে সেবা করেছিল, সর্বাঙ্গের অসহ্য ব্যথায় দুর্গাকে কাতরাতে দেখে নিজেও যে কতবার কেঁদেছিল ঠিক নেই। আজ তার হৃদয় থেকে আপশোশ ঠেলে উঠছে—অঘোর কেন মেয়েটাকে একেবারে খুন করে রেখে যায়নি !

গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে আর বিদ্বেষে ঘৃণায় আক্রোশে বুক যেন জ্বলে পুড়ে ফেটে যেতে চায়। তার মুখ দেখে মণির পর্যন্ত সর্বাঙ্গে একটা ভীতিকর শিহরন বয়ে যায়। মোটাসোটা প্রৌঢ়বয়সি বিধবাটির থলথলে মুখ যেন সারাজগতে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত হিংসায় ত্যারা-বাঁকা হয়ে গেছে।

মণি একটু ভয়ে ভয়েই বলে, তা তুমি অত খেপেছ কেন প্রমদা ? ও নষ্ট হয়ে থাকে, ওর সঙ্গে তুমি আর সম্পর্ক রেখো না, ফুরিয়ে গেল !

প্রমদা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, তুমি বলছ কী মা ? এ যে আসল সম্পর্ক গো, ঘরের সম্পর্ক জেতের সম্পর্ক সমাজের সম্পর্ক—রাখব না বললে কী এ ফুবিয়ে যায় ফুসমন্তরে ? মোর একার ব্যাপার নয় তো যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করলাম আব চুকে গেল ? মায়ে-বেটিতে মুখ দেখে না সে ব্যাপার তো কত ঘটছে, মোরা শুধু মাসি-বোনঝি। ছুঁড়ি যে সমাজ ধম্মো বিকিয়ে দিলে, জেতের গলায় ছুরি দিলে—এতে যদি না খেপব তবে কীসে খেপব বল ?

কী জানি বাছা, তোমার এ বিচার মাথায় ঢুকছে না। একটা মেয়ে যদি নিজের খুশিতে জাত-ধর্ম নষ্টই করে, সে নিজেরটাই নষ্ট করলে, তোমাদের দশজনের কী এল-গেল ? তোমরা নয় ওকে ছেঁটে ফেল, ও নিজের পথ দেখুক।

তাই তো বলতে এয়েছি মা, এই দণ্ডে ছুঁড়িকে দূর করে দাও।

মণি বলে, আমি কেন ওকে দূর করতে যাব বাছা ? ও মুসলমানের সঙ্গে পিরিত করুক আর খ্রিষ্টানের সঙ্গে পিরিত করুক, আমার কী এল-গেল ? দুবেলা ঠিকমতো জল তুলে বাসন মেজে দিয়ে গেলেই হল।

প্রমদা থ বনে যায়।—তুমি হিঁদুর মেয়ে ?

নয় তো কী মুসলমানের মেয়ে ? বেচারাকে দুবেলা খাটিয়ে মারছি, জানি তো যে ক-টা টাকা দি, তাতে আজকের দিনে কারও পেট ভরে না। এই পাপেই হয়তো নরকে যাব। অন্য সময়টুকু বেচারা নিজের ঘরে কী করছে না করছে, তাতেও যদি শাসন করতে যাই, নরকেও আমার ঠাঁই হবে না !

কলকাতায় রোদ পড়ে না, চিরন্তন ছায়ায় ভিজে পিছল শ্যাওলা ধরা ফাটা সিমেন্ট থেকে ভেজা নরম আটকানো ভাপ ওঠে ! বাসনের কাঁড়ি নিয়ে আজ দুর্গা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। যে যেখান

থেকে উৎখাত হয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, তারা সবাই আর যা-ই কিছু ফেলে এসে থাক, মুঠি কয়েক চালডাল আর বাসনপত্র আনতে ভোলেনি। বাড়ির মানুষের মাথা গুনে বাসন দিয়ে হিসাব ধরলে মনে হবে, শহরে বুঝি ভাতের অভাব নেই, জোড়াতালি কনট্রোল নেই—ভোজ ছাড়া কী খেতে এত ঘটিবাটি থালা গেলাস হাঁড়ি কলসি দরকার হয় ? যন্ত্রের মতো বাসন মাজতে মাজতে দুর্গা কায়ক্লেশে মণি আর প্রমদার কথা শুনছিল। মণি তাকে তাড়িয়ে দেবে, এতে দুর্গার ভয়ের কিছু নেই। কালকেই আরেক বাড়ি কাজ পাবে। ঝি-চাকরের অভাবে শহুরে বাবুদের বাড়িগুলি খাঁ-খাঁ করছে।

সে মুখ বুজে ছিল মাসির সম্পর্কে ওই অজানা আতঙ্কে। দুদিন আগে এসে যে মাসি ঝগড়া করে তার দুটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই মাসি আজ যেচে এসেছে ভাংচি দিয়ে তার কাজ খসাতে ! এর পিছনে নিশ্চয় একটা অলৌকিক ভৌতিক প্রক্রিয়া আছে—নিশ্চয় এর পেছনে মন্ত্র-টন্ত্র প্রক্রিয়া-টক্রিয়া খাটিয়ে তার সাংঘাতিক কোনো ক্ষতি করার মতলব আছে মাসির।

মণির কথায় এক নিমেষে তার সব ভয় জুড়িয়ে যায়, ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ঠিক কথা, মণিও তো হিঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে বামুনের বউ। তার প্রমদা মাসির চেয়ে শত ধাপের উঁচু স্তরের মানুষ, মন্ত্র-তন্ত্র মারণ-বশীকরণ যাদের ছেলেখেলার ব্যাপার। মণি যদি তার মিথ্যা অপরাধটা এমন হালকাভাবে নেয়, দাসের ঘরের ছোটো জাত প্রমদা মাসি তার কী করতে পারে !

তড়াক করে উঠে আসে দুর্গা। হাত নেড়ে মুখ খিঁচিয়ে বলে, গায়ে পড়ে শত্তুরতা করতে এয়েছিস ? মিথ্যুকি শতেকখোয়ারি বুড়ি ! মরণ হয় না তোর ?

মণিকে সে বলে, ওর সব বানানো কথা, মিছে কথা। ওর কথা শুনো না বউদি। আমি কাবও সাথে মজিনি, মজে মোর কাজ নেই।

আবার সে প্রমদাকে গাল দেয়। প্রমদা জবাব দিতে মুখ খুলেছে, মণি তাকে ধমকে থামিয়ে দেয়। কঠিন সুরে বলে, তুমি যাও—এখ্খুনি যাও। না না, তোমার কোনো কথা আমি শুনব না। বেরোও তুমি এ বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যাও !

প্রমদা চলে গেলে বলে, বোস তো দুর্গা এখানে।

আচমকা তার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টায়, স্নেহ আর প্রশ্রয-মেশানো আদবের সুরে দুর্গা একটু ভড়কে যায়। ভাবে, এ আবার কী রে বাবা !

মণি বলে, কী ব্যাপার সব খুলে বল দিকি আমায় লক্ষ্মীটি। তোর কোনো ভাবনা নেই। যে জাতের হোক, যত বাধা থাক, আমি তোদের মিল ঘটিয়ে দেব।

দুর্গা ভয় পেয়ে বলে, কার কথা বলছ বউদি ? কার সাথে মিল ঘটিয়ে দেবে ?

মণি মুচকে হেসে বলে, যে মামদোর সাথে তোর ভালোবাসা হয়েছে।

ভালোবাসা ? ভালোবাসা কী গো ! ও পিরিত ভালোবাসার ব্যাপারে মোর কাজ নেই, দূর থেকে পায়ে দণ্ডবৎ। আসল ব্যাপারটা বলি শোনো।

মাতাল নাজিমকে দাঙ্গার শিকার বানিয়ে দুর্গাকে গল্পটা ফাঁদতে হয়, নইলে মণি তো বুঝবে না পেটের দায়ে কেন তাদের অজানা মানুষ ঘরে আনতে হয়। পেটের দায়ে বাসন-মাজা ঝি-গিরি মণি বোঝে, অচেনা পুরুষের কাছে রাতের ঝি-গিরি তার মাথায় ঢুকবে না !

মণির মুখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরকমভাবে বদলে যেতে থাকে। ভ্রূকুটি ভরা কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে আসে তার মুখে, চোখে ঝিলিক মেরে যেতে থাকে তীব্র ঘৃণা আর হিংস্র বিদ্বেষ। দুর্গার নামে নালিশ করার সময় প্রমদার মুখ আর চাউনি যেমন হয়েছিল, তারই আশ্চর্য প্রতিফলন যেন ঘটছে।

খানিকক্ষণ সে গুম খেয়ে থাকে। মাছ-তরকারি কুটতে কুটতে বঁটিটা হয়েছে চকচকে, কাঠের হাতলে চাপানো তার পায়ে এদিকে জলে জলে ক-দিনে উপক্রম হয়েছে হাজা ধরার। চৈতি বিচিভরা বেগুনটা অভ্যাসবশেই সে দুফালি করে কাটে।

তুইও বিদেয় হ দুর্গা। বেরিয়ে যা।

এই তোমার বিচার হল ?

হ্যাঁ, তোকে দেখলে ঘেন্না করছে। এখুনি বিদেয় হও, কাল এসে মাইনে নিয়ে যেয়ো।

মণিকেও কড়া কড়া কটা গাল দেবার সাধটা চাপতে চাপতে দুর্গা বলে, বেশ তো—বেশ তো, বিদেয় এখুনি হচ্ছি। যে বাড়ি যাব খেটে খাব, ভয় দেখাও কীসের ? তা, অপরাধটা কী হয়েছে শুনতে পাইনে ?

তোর অপরাধ ? শুনবি তোর কী অপরাধ ?—বেগুনের ফালি দুটি মাটিতে ফেলে দিয়ে মণি দুহাতে এলোচুল পিছনে ঠেলে দেয়, প্রমদার রোগাটে ভদ্র প্রতিমূর্তির মতো হিংসা-বিদ্বেষ চাপা দেওয়া সুরে বলে, তুই হিন্দু-মুসলমান মেথর-মুদ্দফরাস কার সাথে ভালোবাসা করেছিস, আমার তাতে বয়ে যেত দুর্গা। হিসেব করে প্রেম হয় না জানি তো আমি। কিন্তু এ তো তোর ভালোবাসার ব্যাপার নয় ! টাকার জন্য তুই একটা মাতালকে ঘরে এনেছিলি ? তোর মুখ দেখলে পাপ হয় !

দুর্গা বলে, পাপ হয় ? তবে আর পাপ বাড়িয়ে কাজ নেই বউদি, আজকেই মাইনেটা দিয়ে বিদেয় দাও ! কাল ফের মাইনে নিতে এলে পোড়ামুখ দেখতে হবে, আরও খানিকটা পাপ হবে !

মণি নীরবে উঠে গিয়ে আগের দিনের কামাই কেটে পাই-পয়সার হিসাব করে দুর্গার মাইনে এনে দেয়। হিসেব হয় সাত টাকা তেরো আনা এক পাই। এক পাই কাটবে না পুরো একটা পয়সা দেবে, মিনিট খানেক ভাবতে হয় মণিকে !

হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে বলে, এক পাইয়ের জায়গায় একটা পয়সা দিয়েছি—তিন পাইয়ে এক পয়সা।

তোমার অনেক দয়া বউদিদি ! দয়ার সিমে নেই তোমার !

হাত পেতে বেতন নিয়ে দুর্গা মুচকে হাসে, বলে, আজ এখুনি কেন মাইনে চেয়ে নিলাম জানো ? মোরও তো একটা পাপপুনির হিসেব আছে ? তোমার মুখ দেখে মোর পাপ হবে জেনেছি। কাল ফের মাইনে নিতে এসে পাপ বাড়াব ? তাই জন্যে !

বলে গজর-গজর করতে করতে দুর্গা বেরিয়ে যায়।

কাজ দুর্গা পরদিনই পেয়ে যায়, এক বাড়ির বদলে দুবাড়িতে, প্রণবদেব পাড়াতেই কাছাকাছি দুটি বাড়ি। বাজারে ঝি-র টানাটানি, যদিও চাকরের অভাবের মতো নয়। গেরস্ত-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ছাড়া যারা কলে-কারখানায়, এমনকী চালের কলে পর্যন্ত কাজ করার কথা ভাবতে পারত না, যুদ্ধের বাজারে তাদেরও এ সংস্কার ভেঙে গিয়েছে। চালের কলে নতুন ধানের মরশুমের সময় দু-একমাস ভদ্রপাড়ার গিন্নিদের ঝিয়ের শোকে চোখে প্রায় জল এসে পড়ার উপক্রম হয়।

দুবাড়ির কাজ, কাক-ডাকা ভোরে দুর্গাকে বেরিয়ে যেতে হয়। এমনি ভোরে একদিন ডোবার ঘাটে কাপড় কেচে সে রাস্তায় উঠেছে, চেয়ে দ্যাখে সামনে দাঁড়িয়ে নাজিম !

তুমি ফের এয়েছো এ পাড়ায় ? কী সব্বোনাশ !

নাজিমের শীর্ণ ম্লান মুখে মৃদু একটু হাসি ফোটে। সে বলে, সেদিন জান বাঁচিয়েছিলে, দুটো কথা বলতে এলাম সাদা চোখে।

কী কথা ?

বিশেষ কথা কিছুই নয়, কৃতজ্ঞতা জানাতে এসে দুটো কথাবার্তা বলে যাওয়া। দুর্গার নাম তো জানে না নাজিম, কোনটা তার ঘর, তাও ঠিক মনে ছিল না। সে তাই ভোরবেলা দু-চারদিন এখানে ঘোরা-ফিরা করে গেছে। দুর্গা নিশ্চয় ভোরবেলা ঘাটে কাপড় কাচতে আসে, যদি দেখা হয়ে যায় !

ভয়ে দুর্গার গা কাঁপছিল—নাজিমের ভয়ে নয়। তাকে নিয়ে হাঙ্গামা হবার ভয়ে। প্রমদা মাসি যদি ঘাটে আসে এখন, যদি দেখতে পায় লোকটাকে, তবে আর উপায় থাকবে না—সঙ্গে সঙ্গে হইচই বাধিয়ে লোক জড়ো করবে, বাঁচবার আশা থাকবে না নাজিমের ! প্রমদা ছাড়াও পাড়ার অন্য দু-চারজন নাজিমকে চেনে না, এমন নয়। কিন্তু এ লোকটা কি পাগল ? সে রাত্রে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে দুটো কথা বলতে প্রাণ হাত করে এই যমপুরীতে এসেছে—আজকে প্রথম নয়, আগেও তাকে খুঁজতে এসে ঘুরে গেছে দু-চারদিন !

তুমি কি পাগল ? পাড়ার কেউ চিনলে যে মেরে ফেলবে তোমায় ?

নাজিম জোর দিয়ে বলে, না, মারবে না।

মারবে না ? চাদ্দিকে মারছে যে যাকে পারে, তোমায হাতে পেয়ে মারবে না ?

কেন মারবে ? আমি বলব আমি গরিব মানুষ, খেটে খাই ; আমার জাত ভি নেই, ধরম ভি নেই। তবু যদি মেরে ফেলে, মারবে ! নাজিম নির্ভয় নিশ্চিন্তভাবে একটু হাসে, তুমি মিছে ডরাচ্ছ, আমাকে কেউ মারবে না। এটাও গরিব আদমিব পাড়া।

দুর্গা বলে, গরিব মানুষ কী আব মারবে তোমাকে ? মাববে পাড়াব গুন্ডারা।

গুন্ডাকে ডরালে চলবে কেন ? আজ এই অজুহাতে মারছে, কাল ফের অন্য অজুহাতে মারবে।

নাজিমকে চেনা যায় না, ভাবা যায না, এই লোকটাই সে রাত্রে মদ খেযে বেতর হযে তার ঘরে বমি করে ভাসিয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল, জ্ঞান হয়ে কোন পাড়ায় এসেছে শুনেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চোরের মতো গিয়েছিল পালিয়ে। আর সেই মানুষটা আজ ভোরে সাদা চোখে সাধ করে আবার মরতে এসেছে এ পাড়ায়। না মরতে আসেনি। অপমরণের গালে থাবড়া মারতে এসেছে !

কী করা যায় এখন ? মানুষটাকে তো খেদিয়ে দেওয়া যায় না যে দেখা হযেছে, কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, এবার তুমি ভাগো, আর বেশি কথায় কাজ নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাও বলা যায় না মানুষটার সঙ্গে এভাবে। বলছে কিনা যে আঁতে ঘা লেগে চোখ খুলেছে, জানতে পেরেছে খাটুয়েব জাত-ধর্ম নেই—কোন আঁতে কী ঘা লেগে তার মাথা খুলে গেছে কিনা জানলেই বা দুর্গার চলে কী করে !

কী হয়েছে তোমার ? বউ ঝগড়া করে বাপের বাড়ি গেছে ?

বাপের বাড়িই গেছে। বাপের সাথে নিকা বসতে গেছে !

দুর্গা ভেবেচিন্তে বলে, ঘরে এসো, বসে ধীবে সুস্থে কথা কও। অত গলা চড়িযো না।

নাজিমের হাবভাব কথাবার্তা পাগলের মতো। মাথা বিগড়ে যাবার পর উমেশের চোখে যে রকম ঝিলিক খেলতে দেখেছিল দুর্গা, নাজিমের চোখও থেকে থেকে তেমনিভাবে ঝলসে উঠছে। দুর্গার কিন্তু ভয় করে না। লোকটা যদি উন্মাদ হয়ে গিয়ে থাকে, উন্মাদ হয়েই যেন সুস্থ আর শান্ত হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। নাজিমের কথাগুলি তার বড়ো ভালো লাগে শুনতে। নাজিম যেন নতুন একটা ধর্ম প্রচার করছে—জগতে হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, আছে শুধু বড়লোক আর গরিবলোক। জগতে আছে শুধু গুন্ডা আর তাদের শিকার লাখ লাখ কুলিমজুর, বাস্ খতম। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয়, স্রেফ ধনী আর গুন্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।

আচমকা দুর্গার হাত চেপে ধরে নাজিম কী যেন বলতে চায়, কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোয় না। বক্তব্যটা বোধ হয় এখনও শুধু আবেগ, ভেতবে ফেটে পড়তে চাইছে কিন্তু কথায় রূপ পাচ্ছে না। বোবাকে ধরে বেদম মেরে ছেড়ে দিলে যেমন করে, খানিকটা সেই রকম মনে হয় নাজিমের কথা বলার চেষ্টা। দুর্গার একটু ভয় ভয় করে বইকী। তবে কোনো পুরুষের কাছেই জাত-ধর্ম হারাবার সত্যিকারের ভয় তার নেই, ও সব পাট অনেক কাল চুকে গেছে, বজায় আছে শুধু ঠাটটা। তাছাড়া, এ ছটফটানি পিরিতের নয় বোঝা যায়।

নাজিম বলতে চেয়েছিল নানির কথা, তার ঘুটে-বেচা বুড়ি মাকে শয়তানেরা কীভাবে ষড়যন্ত্র করে জবাই করেছে দাঙ্গা উসকানোর আশায়। বলতে চেয়েছিল পরীবাণুর কথা, তার সরল নিরীহ বউটার মন ওই শয়তানেরা কী কৌশলে বিগড়ে দিয়ে তাকে ঘর ছাড়িয়েছে, তাকে দিয়েই ভেঙেছে তার পরীবাণুর মন। কিন্তু বলতে গিয়ে কথা খুঁজে পায় না, মনে হয় ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন যেমন ঘুমন্ত মানুষের আর্তনাদকে বোবায় ধরিয়ে চেপে রাখে, তার মা-বউয়ের কাহিনিও তেমনি তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনও বেরোতে পারবে না।

নসিব ! আর কী ? সব নসিব !

দুর্গার হাত ছেড়ে নিজের কপালটা থাপড়ে দিয়ে নাজিম শান্ত হয়ে যায়। খাপছাড়া একটু হাসি পর্যন্ত সে হাসে। দুর্গার ঘরের চাবিদিকে এমনভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, যেন এতক্ষণ তার খেয়াল হয়েছে সে কোথায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে সোজাসুজি বলে, মোর কেউ নাই ভাই। মা ছিল, বউ ছিল, দুটোকে মাটি দিয়েছি। বাচ্চাকাচ্চা ভি একটা নাই। রোজগার করি, উড়িয়ে দিই, ভালো লাগে না।

দুর্গা বলে, ফের বিয়ে করো। অত মদ খেলে মানুষ বাঁচে ?

নাজিম বলে, আরে না, মাল টানা মোর ধাত নয়। লোকের পাল্লায় পড়ে খেয়েছিলাম। মাল টানতে যে শিখে গেছে, তার ওই রকম দশা হয় ? তুমি বল ?

দুর্গা এটা স্বীকার করে। সে রাত্রে নাজিম যে নমুনা দেখিয়েছে পাকা মাতালের ও রকম হাল হয় বটে। ফরসা আকাশের আলো আস্তে আস্তে রোদ হয়ে পৃথিবীতে নামছে, ঘরের ভিতরের আবছা আঁধার হালকা হয়ে এসেছে দুর্গার। অতিথিকে বসতে বলে চট করে সে বেরিয়ে যায়, মন্টার দোকান থেকে কাচের গ্লাসে চা আর ছেঁড়া কাগজে ভাজা বিস্কুট এনে দেয়। যাবার সময় আসবার সময় প্রমদাকে সে ডোবার ঘাটে বাসন মাজতে দেখেছে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্রমদার বাসন সামান্য, রোজকার দু-একটি থালা বাটি কড়াই মাজতে ধুতে তার ঘণ্টা-খানেক সময় লাগে। অনেকক্ষণ একটি থালা মাজে, বারবার জলে ডুবিয়ে ধোয়, তবু তার শকুনির নজরে ধরা পড়ে যায় যে থালাটার কানার কাছে এঁটোর দাগ। আবার মাজে, আবার ধোয়। আজ পিলসুজ, ডাবর আর ঢালাই কলসি তার ঘাটে গেছে। মাজতে ঘষতে নটা বাজবে।

ডবল চায়ের গেলাস থেকে নিজের জন্য কাপে একটু চা রেখে চায়ের গেলাস আর বিস্কুট দুর্গা নাজিমকে দেয়। কাপটা সে দু আনায় কিনেছে। হাতল নেই, নতুন প্রক্রিয়ায় জোড়া লাগানো ভাঙা কাপ।

চা-বিস্কুট খেয়ে হঠাৎ মুখ তুলে নাজিম বলে, একসাথে থাকি এসো না ? রোজগার যা করি, তা দুজনে খাব। আর মাইরি বলছি, খোদার কসম, মাল-টাল ছোঁব না।

দুর্গা হঠাৎ জবাব দেয় না। আগে থেকেই সে জানতো, এ রকম একটা প্রস্তাবের জবাব তাকে দিতে হবে, তবে এতটা সে ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, নাজিম তাকে বাঁধা রাখতে চাইবে, মাইনে দিয়ে। স্পষ্ট পরিষ্কার না বলবে দুর্গা এটা ঠিক করেই রেখেছিল।

নাজিম জিজ্ঞাসা করে, কী বলছ ? হয় না ?

দুর্গা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।

নাজিম বলে, মন সরছে না ? জাতে বাধছে ?

দুর্গা স্বীকার করে যে, কথাটা তাই। বলে, ওই যে বললে। গরিব মানুষ তোমার আমার জাত-ধর্ম নাই, কথাটা বড্ড মানি আমি। কিন্তু মেনে হচ্ছে কী বলো ? তোমায় আমায় বনবে না একসাথে, ওই যে বলে না, স্বভাব যায় না মলে ? তুমি আমি শত্তুর নই, কিন্তু স্বভাবে মিশ খাবে না মোদের। আমি রাঁধব পুঁই, তুমি বলবে ওতে পিঁয়াজ দাও। বুঝলে না ?

নাজিমের নিজের মনেও এ বিষয়ে খটকা ছিল। দুর্গাকে আপন করতে চেয়েও চব্বিশ ঘণ্টা এক ঘরে দুজনের আপন হয়ে থাকার ধরনটা ভাবতে গিয়ে তার কল্পনা ভড়কে যাচ্ছিল। তাই বটে,

কতকাল ধরে উপরতলার আদমিরা তাদের পাহারা দিয়ে শাসনে রেখে হালচাল বিগড়ে দিয়েছে, আজ তাদের দিল মেলে তো চাল মেলে না।

দোস্তি হবে, পিরিত চলবে না, আঁ ?

তুমি ঠিক বুঝেছ !

দুর্গা খুশি হয়ে সায় দেয়।

নাজিমকে দুর্গা সদর রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। প্রমদা তখনও ঘাটে বাসন মাজছে।

আট

কয়েক দিন পরে এক অদ্ভুত ঘটনা।

তিন বাড়ি কাজ সেরে সন্ধ্যার পর দুর্গা শালপাতা কেনার জন্য বাজার হয়ে ঘরে ফিরবে, বাজারের লাগাও পোড়ো জমিটায় মস্ত এক সভা। সাধারণ লোকের সভা দেখে নয়, বক্তাকে দেখে দুর্গা থমকে থেমে গিয়ে গুটি-গুটি পা বাড়িয়ে সভার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। নাজিম তারস্বরে বক্তৃতা দিচ্ছে ! তার সাধারণ আলাপের মৃদু মিষ্টি গলা চড়ায় উঠে খ্যান-খ্যান করে বাজছে ভাঙা কাঁসরের ব্যান্ডবাদ্যির মতো।

একটা মাছ-চালানি কাঠের বাক্সে আলু-চালানি বস্তা বিছিয়ে সভাপতিকে বসানো হয়েছে, সভাপতি স্থানীয় শান্তি কমিটির সম্পাদক ধীরেনবাবু। সভাপতির আসন কাঠের বাক্সোটার এ-পাশে ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন, তার মধ্যে প্রণব, গোকুল আর ভূপেনকে দুর্গা চেনে। কয়েক শো হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি উবু হয়ে বসে সভাটা গড়েছে, দেখলেই চেনা যায়। বাজারের কিছু বেচুনে আর কিনুনে মানুষ সভা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে—শ-খানেকের কম নয়।...

দুর্গা দাঁড়িয়ে যায়, নাজিমের বক্তৃতা শোনে। সেই কথাই বলছে নাজিম, সেদিন দুর্গার ঘরে বসে যা বলেছিল—গরিবের জাত নেই, খাটুয়েরা এক জাত। কিন্তু সেদিন যেন নিজের মনের খেদই শুধু আউড়েছিল নাজিম, তার জাতভাই তার ঘর ভেঙেছে, প্রাণে দাগা দিয়েছে বলেই যেন গরিবেরা এক জাত হয়ে গিয়েছিল নাজিমের কাছে ! মোট কথাটা দুর্গা সহজেই বুঝেছিল, গরিবরা যে এক জাত এ আর কোন গরিব মানুষ না জানে—গরিবেরা সবাই গরিব ! কিন্তু কথাটার আরও যে কী বড়ো মানে নাজিম করতে চেয়েছিল, সেটা সেদিন তার মাথায় ঢোকেনি। আজ নাজিম সেই মানেটা এত সহজ করে বলে যে শুনতে শুনতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির পিছনে কী কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে, এখনও না সমঝালে গরিব মানুষকে—খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কী বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কী জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসি বড়ো বাবুরা আর লিগের বড়ো সায়েবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপস লড়াই আদায়-নিকাশের ব্যাবসাদারি খেলা—খেটেও যারা খেতে পায় না। তাদের জাত-ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড়ো চাল। মজুর চাষি গরিব খেপে গেছে, খেপে গেছে জাহাজের দেশি ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসি বড়োবাবুদের, লিগের বড়োসায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষি, গরিব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরিব খাটুয়ের—সর্বনাশ ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়-নিকাশের ঘরোয়া আপস ভালো।

দাঙ্গা হল এই আপসের একটা দর-কষাকষি ! ইংরেজের সেরা চালবাজি। আমরা ভাব করি, দাঙ্গা করি, আপস করি, তুমি বিদেশি ইংরেজ, তোমার মাথাব্যথা কেন ?

কারখানা-ফেরত মজুররা সন্ধ্যায় বাজারে সওদা করতে আসে, দলে দলে তারা জমায়েতে ভিড়ে যায়। দেখতে দেখতে দু-তিনশো মানুষের ছোটো সভাটা হয়ে দাঁড়ায় হাজার মানুষের জমায়েত। অদূরে বিড়ির দোকানে দুটি কারবাইড জ্বালিয়ে জন পনেরো লোক বিড়ি পাকাচ্ছিল, কাজ বন্ধ করে তারাও জমায়েতে যোগ দেয়। একজন একটি আলো এনে কাঠের বাক্সের উপর বসিয়ে দেয়। নাজিমকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পায় সকলে। নোংরা বাজারের আবর্জনা-ভরা পোড়ো জমিতে হিংসায় শঙ্কায় গুম খাওয়া এই দিনে সন্ধ্যার ভয়ার্ত অন্ধকার নামার পর এমন জনসমাবেশ কে কল্পনা করতে পেরেছিল ?

বহুদিন বিষের নেশায় আচ্ছন্ন আত্মহারা হয়ে থেকে আজ এখানে মানুষগুলি যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছে, আটকানো নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে জীবন্ত মানুষের মতো।

জোর বাতাসে গ্যাসের আলোটা নিবুনিবু হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে, তিনটি লাল ঝাণ্ডা উড়ছে পতপত করে, আশা উৎসাহ আত্মবিশ্বাসের জোয়ার আসছে মানুষের মনে। ভয়াবহ রক্তাক্ত ফাঁকির কবল থেকে এখানে আজ মুক্তি ঘোষণা !

এক বুড়ো জমায়েতকে একটা খাপছাড়া চমক দেয়।

দুর্গার কাছে, প্রায় তার গা ঘেঁষে বুড়ো দাঁড়িয়েছিল। কোমরে নিয়মিত গঙ্গাস্নানে মেটে রংয়ের সাতহাতি কাপড় জড়ানো, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় মস্ত একটা টিকি। থেকে থেকে বুড়ো কাশছিল। প্রণব চড়া গলায় বক্তৃতা শেষ করে কাঠের বাক্সের মঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াতেই বুড়ো দাবি জানায়, সে কিছু বলবে।

নাজিম ডেকে বলে, আইয়ে।

কাঠের বাক্সে উঠে বুড়োব কাশির ধমক আসে। নিজের মুখে থাবড়া মেরে-মেরে এক দলা কফ তুলে সে কাশি থামায়। মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলে, মোছলমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও !

হাজার মানুষ চমকে ওঠে, থ বনে যায়। এতগুলি লোকের গরম নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত থেমে গিয়ে হঠাৎ যেন গুমোট নেমেছে মনে হয়।

অন্য সভা হলে তখনি একটা গোলমাল শুরু হয়ে যেত, শান্তিসভায়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সভায় এ কী বেয়াড়া কথা ! মোছলমান ভাইসব, তোমরা গো-মাতার মাংস খাও ! বুড়ো হাঙ্গামা বাধাতে চায় নিশ্চয়। থামাও বুড়োকে, থামিয়ে দাও ! মারো !

কিন্তু সভায় বেশির ভাগ মজুর। অত অল্পে তারা ভড়কে যায় না, নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখে। বুড়ো দেখুক না চেষ্টা করে গোলমাল বাধাতে পারে কিনা, নিজেই গলায় রক্ত তুলে চেঁচিয়ে মরবে, সভা তাকে গ্রাহ্যও করবে না। শোনাই যাক, দু-একমিনিট কী বলে বুড়ো !

একটু থেমে বুড়ো বলে, মোদের হিঁদু জেতের বড়োবাবুরা গো-মাতার মাংস খাওয়া পাপ বলে দুধ খায়। ক্ষীর ছানা মাখন ঘি খায়, দই সন্দেশ রাবড়ি রসগোল্লা খায়, ফের আবার দুধ মিশিয়ে চা-ও খায় ! বড়োবাবুরা খায়, পয়সাওলা বাবুরা। মোরা গরিব বেচারারা গোস্ত খাওয়ার নাম শুনলে বলি, রাম রাম ! দুধ ছানা খাবার সাধ জাগে, তা, হা মোদের পোড়া অদেষ্ট, ট্যাক গড়ের মাঠ ! স্বাধীন হয়ে দুধ ছানা সন্দেশ খেয়ে মোটা হব এই ভরসায় দিন গুনি, গঙ্গাজল খেয়ে খিদেও মেটাই, তেষ্টাও মেটাই !

প্রণবরা এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে। প্রণব আর গিরীন দু-জনে কোঁচার কাপড়ে মুখ মোছে। বুড়োর রসজ্ঞান আছে !

বুড়োর গলা ক্রমে ক্রমে চড়ছিল। একটু থেমে আরও চড়া গলায় বলে, শুনবে ভাইরা, শুনবে ? মোর বাচ্চা ছেলেটা আজ মরে গেছে ! একটু দুধ না পেয়ে মরে গেছে। মায়ের বুকের দুধ গেল শুকিয়ে, গো-মাতার দুধ পেল না, বাচ্চাটা মোর গলা শুকিয়ে মরে গেল—যাঃ ! না মশায়রা, গো-মাতা মোদের মা নয় গো, বড়ো মানুষের মা, মোরা গো-মাতার ত্যাজ্যপুত্তুর।

বুড়ো আবার খানিক থামে। আরও কী বলার আছে বুড়োর ? সকলে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে। বুড়ো এবার গলা আকাশে চড়িয়ে দেয়, যেন দূরের কোনো জাত-শত্রুকে শুনিয়ে শাপ দিচ্ছে : তারপর শুনবে ? মোর বাচ্চাটা তো মোল, মোকে এসে বলে কী, তোর ওই ছেলেটাকে দে, মরা ছেলেটাকে দে, টাকা পাবি ! মরেই তো গেছে, কী করবি ছেলেটাকে দিয়ে ? মোদের কাজে লাগবে, দিয়ে দে। মাথাটা ছেঁচে, গা কাটাকুটি করে দশজনকে দেখাবে, দাঙ্গা বাধাবে। শুনলে ? মোর মরা বাচ্চাটাকে ছেঁচে কেটে দাঙ্গার উসকানি দেবে ? না ভাই, হিঁদু-মোছনমান এক না দুই জানি না বাবা, দাঙ্গায় মোদের কাজ নেই ! দাঙ্গা মোরা করব না, বাস ! ওদের দাঙ্গা ওরা করুক।

বুড়োর পর কাঠের বাক্সে ওঠে অন্য প্রদেশের একজন মুসলমান মজুর। বোঝা যায় সে পাকা বক্তা, জমায়েতে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আছে। উর্দু-বাংলা মেশান ভাষায় সে বলে যে, না, দাঙ্গা আমরা আলবৎ করব না, আমরা দাঙ্গা রুখব। মজুর দাঙ্গার মানে জানে। মজুর শুধু জোর-গলায় বলতে পারে তারা উসকানিতে ভোলেনি, নিজের নিজের এলাকায় দাঙ্গা রুখেছে। মালিক সরকারের দালাল-পুলিশের সাথে মজুর লড়ে, জাত-ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করে না। মজুরের কাছে হিন্দু-মজুর মুসলিম-মজুর নেই, এ-দেশি মজুর ও-দেশি মজুর নেই, দুনিয়ার মজুর এক জাত, সারা দুনিয়া মজুরের দেশ। মজুর দুনিয়ার সাচ্চা মানুষ। কিন্তু নিজেরা দাঙ্গা না করলেই শুধু চলবে না, নিজের এলাকায় দাঙ্গা রুখলেই শুধু চলবে না, মজুর ভাইদের এগিয়ে গিয়ে সব এলাকায় দাঙ্গা রুখতে হবে।

প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি তুলে জমায়েত সাড়া দেয়, সায় দেয়। শুধু দাঙ্গা না করলেই চলবে না, এগিয়ে গিয়ে রুখতে হবে দাঙ্গা ! কেরানি দোকানি যারা বাজার করতে এসে সভায় আটকে গিয়েছিল তারা দু-একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, ইতস্তত করে, তারপর তারাও গলা খুলে সাড়া দেয়, সায় দেয়। জমায়েতের সমবেত কণ্ঠের সে আওয়াজ বড়ো দালান কুঠির কয়েকটি কানে পৌঁছায় দূরাগত ক্রুদ্ধ সাগর-গর্জনের মতো, ঝড়ের ইঙ্গিতের মতো—হাজার হাজার উৎসুক কানে পৌঁছায় আশ্বাস-বাণীর মতো। আধঘণ্টা পরে সভা পরিণত হয় শোভাযাত্রায়। চারিদিক মুখরিত করে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি তুলে তুলে শোভাযাত্রা অগ্রসর হয় : হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই ; দাঙ্গা চাই না, রুজি চাই ; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক আপসকারীরা ব্রিটিশের গোলাম, মোদের খুন ওদের শরবৎ.....

সমস্ত এলাকার আবহাওয়া বদলে যায় এক বেলায়। প্রতিদিন এদিকে ওদিকে অলিতে-গলিতে দু-একটা খুন-জখম হয়ে আসছিল, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সংঘর্ষ বাধছিল। দিনের বেলাও এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যেতে ভয় পেত, বাজার আর ট্রামেবাসে বড়ো রাস্তার সীমাবদ্ধ একটা অংশ ছাড়া দুই ধর্মের মানুষকে একত্র চলাফেরা করতে দেখা যেত না। আজ চারিদিকের অদৃশ্য ভয়ের দেয়ালগুলি চুরমার হয়ে যেতে থাকে, ভয়ার্ত মানুষ পথে নেমে আসে, আর এই ভয় যারা সৃষ্টি করেছে—জিইয়ে রেখেছে, তারা ভয় পেয়ে আড়াল খোঁজে, খুন-জখমের মতলব আর হাঙ্গামার ষড়যন্ত্র বাতিল করে দেয়। মানুষ জানতেও পারে না আগামী কত বড়ো একটা কুৎসিত দুর্ঘটনাকে আজকেরই সভা আর শোভাযাত্রা কাঁচিয়ে দিয়েছে। ছোটো দরগা লেনের এক প্রান্তে ক-দিন গোপন পরামর্শ ও প্রস্তুতি ঘনীভূত হয়েছিল—প্রথম রাত্রেই রাস্তার অন্য প্রান্তে একটু ছড়ানো ও দুর্বল পাড়াটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল একটা দল।

এ অঞ্চলে আগুন জ্বলেও দাউদাউ করে জ্বলছিল না, নানির হত্যার মতো ব্যাপারও এদিকের মানুষগুলিকে খেপিয়ে দিশেহারা করে দিতে পারেনি, তাই আয়োজন করা হয়েছিল এই বড়ো রকম

আক্রমণের। একটা পাড়াকে ছারখার করে দিতে হবে—এমনভাবে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে রক্তপাত ঘটাতে হবে, আগুন জ্বালাতে হবে, সে রক্তপাত যেন আর না থামে, সে আগুন আর না নেভে। উন্মত্ত আক্রোশে মানুষ হিংসা আর প্রতিহিংসা ছাড়া সব যাতে ভুলে যায়।

বাজারের কাছে শান্তি কমিটির সভার খবর শুনে উদ্যত আক্রমণকারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, এ এলাকায় লরি বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এসেছে শুনলেও তারা এতটা ভড়কে যেত না। জমায়েত যখন শোভাযাত্রায় পরিণত হল, তারা তখন অস্ত্র আব পেট্রোলের টিন গোপন করে ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে শুধু ঘোষণা করেছে, শান্তি চাই। সে আওয়াজ শুনেই অবশ হয়ে গেছে গোপন হিংসার ছোরা-ধরা হাত—শিকার ধরতে ওত পাতা বাঘ দল-বাঁধা মানুষের সাড়া পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে ইটের জঙ্গালের গোপন অন্ধকারে !

শোভাযাত্রা সমস্ত এলাকা টহল দেয়, রাস্তার দুপাশে মৃতপ্রায় পাড়াগুলি দূর থেকে শোভাযাত্রার আওয়াজ শুনে জীবন্ত সজাগ হয়ে উঠতে থাকে। দুপাশের গলি থেকে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। অনেকে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে বিভক্ত পাড়াগুলি। অনেকে শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়ে। আঃ, এই তো চাই ! পেষণে পেষণে দুঃখে-দুর্দশায় নাজেহাল হয়ে আছি, মিছামিছি মারামারি কাটাকাটি করা কী আমাদের পোষায় !

মণি আলুথালু বেশে গলির মোড়ে ছুটে যায়। সেখানে ইতিমধ্যেই বিশ পঁচিশটি মেয়েবউ আর শ-খানেক নানা বয়সের পুরুষ জমা হয়েছে। ছোটো ছেলেমেয়েরা জুড়ে দিয়েছে চেঁচামেচি। আনন্দে ও উত্তেজনায় সকলে তারা চঞ্চল। মণি আশ্চর্য হয়ে যায়। শোভাযাত্রা তখনও দূরে, শুধু সাড়া পেয়ে ইতিমধ্যে এত লোক জমে গেছে ? আরও সে আশ্চর্য হয়ে যায় বস্তির মুসলমান বাসিন্দাদের এই গলি দিয়ে মোড়ে এসে তাদের সঙ্গে দাঁড়াতে দেখে। নানির হত্যাকাণ্ডের পর এ পথে ভয়ে ওদের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

গভীর উত্তেজনার সঙ্গে মণির অদ্ভুত এক হতাশা ও আপশোশ জাগে। এত খেটে ছুটোছুটি করে এই শোভাযাত্রা যারা গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে আছে তার ঘরের মানুষ, তারই বাড়িব ছাদে এদের কত পরামর্শ হয়েছে এই দাঙ্গা-বিরোধী অভিযান গড়ে তোলার। অথচ সে-ই সবার শেষে টের পেল চারিদিকে কী সাড়া পড়ে গেছে এই সভা আর শোভাযাত্রা নিয়ে !

মণি জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলে। শোভাযাত্রার মাথা তার দিকে এগিয়ে আসে। কাছাকাছি এসে সে স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ করে, নাজিম আর দুর্গা পাশাপাশি চলেছে সামনের লাইনে, বীরদর্পে পা ফেলে হাত তুলে দুজনে শান্তির আওয়াজ দিচ্ছে !

পাশে সরে দাঁড়ায় মণি। প্রায় সে ভিড়ে পড়েছিল শোভাযাত্রায়, সামনের ওই লাইনে। হয়তো ওই দুর্গার পাশে পাশেই তাকে চলতে হয় ! দুর্গার গায়ে ব্লাউজ বা শেমিজ নেই। আরও মেয়ে আছে শোভাযাত্রায়—সামনেই আছে। মজুর-মেয়ে, কেরানি-ঘরের মেয়ে। মজুর-মেয়েদের মণি চেনে না, কাল্লু মিস্ত্রির বউ রাবেয়া হয়তো ঠিক মজুর-মেয়ে নয়। আভা, শোভা, ইন্দিরা, জিন্দার মা কাসেমের পিসিকে চিনতে চিনতে তাকে ছাড়িয়ে শোভাযাত্রার মাথা এগিয়ে যায়।

প্রণব তাকে দেখতে পায়নি। গোকুলের সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি হয়েছে। গোকুল মাথা হেলিয়ে স্পষ্ট ইশারায় ডাক দিয়েছে : ভিড়ে পড়ো ! মণিও মাথা নেড়ে ইশারায় জানিয়েছে, না !

রাত এগারোটার পর প্রণব আর গোকুলেরা ফিরল। প্রণবের জ্বর এসেছিল, গুরুতর কিছু নয়। তবু তো জ্বর ! খাবার বেলায় দুপুরে ভাত না খেয়ে সাগু খেল অথচ বেলা তিনটেয় কাজে বেরোবে বলে তৈরি হল—মণির সঙ্গে তখন একচোট তার ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। মণিই ঝগড়া করেছিল একতরফা। বাজারে শান্তি কমিটির মিটিং করার গুরুত্ব মণি স্বীকার করেনি—এ অবস্থায় দু-দশজনকে নিয়ে মিটিং কার কী লাভ হবে ? প্রণব না গেলেও কি এই সামান্য কাজটা হয় না ?

প্রণব বলেছিল, হয়। কিন্তু আমারও দায়িত্ব আছে তো ?

কাজে এই বাড়াবাড়ি নিষ্ঠা, চলার পথে শুধু চলার জন্যই সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাকুলতা, মণির কাছে পাগলামির সামিল ঠেকেছিল।

প্রণব গোকুল গিরীনদের মণি খাওয়ায়, হেঁসেল সে ঠিক করেই রেখেছিল। তিনজন বাড়তি এবং অজানা মানুষ এসে পড়ায়, তিনজন যে খাস মজুর দেখেই সেটা চিনতে পারায়, কয়েক মুহূর্ত একটু শুধু সে অস্বস্তি বোধ করে যে ভাত ডাল তরকাবিতে কুলোতে পারবে কিনা, ওদের মন উঠবে কিনা এই খাদ্য খেতে !

এগারোজন শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত মানুষ তার পুঁইডগার চচ্চড়ি আর মটর ডাল দিয়ে যে রকম আগ্রহে ভাত খায়, তিনটি ডিম ফেটিয়ে মামলেট ভেজে ছোটো ছোটো টুকরো করে রাঁধা ডিমের ডালনা সামনে ধরতেই সবাই যে রকম জয়ধ্বনি করে ওঠে, তাতে মণি সত্যই কৃতার্থ হয়ে যায়। আগেব দিনে কোনো বিশেষ উপলক্ষে দু-তিনশো লোককে পোলাও-মাংস খাইয়েও কোনোদিন তার এমন আনন্দ হয়নি—পোলাও-এ ঘি কম হয়েছে কিনা, মাংসে দই বেশি মেখেছে কিনা, মাছের কালিয়ায় গরম মশলা বেশি পড়েছে কিনা, এই ভাবনায় নেমন্তন্ন খাওয়ানোর রাত্রে তার ঘুম হত না, ছটফট করত, আধঘুম আধজাগরণের স্বপ্নে চমকে উঠে চিৎকার করে ভয়ার্ত নখে সুশীলেব গা আঁচড়ে বক্ত বাব কবে দিত ! বড়ো বড়ো লোকেরা নেমন্তন্ন খেতে আসত তার বাড়িতে— প্রাণপণ যত্নে খাইয়েও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পেরেছে কিনা, না জানি কী ত্রুটি হয়েছে, কী জানি কী হবে ভেবে ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ কবত।

হেঁসেল ঠিক রেখে সকলকে যা জোটে যেমন জোটে খাওয়াবার কাজটা সেও যে ভয়ংকর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে, প্রণবের কাজের নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজের নিষ্ঠার যে কোনো তারতম্য নেই, এটা মণির খেয়ালও হয় না।

খাওয়ার পর সকলে ছাদে যায়। মাদুর শতরঞ্চি বিছিয়ে আগে থেকেই কয়েকজন ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। মণি না খেয়েই ছাদে যায়। প্রণবকে বলে, একটা কথা শুধোঁব ?

প্রণব কিছু বলার আগেই গোকুল বলে, নিশ্চয় !

গোকুল একটা বিড়ি ধরিয়েছে। গোকুলকে বিড়ি খেতে মণি এই প্রথম দেখল। কবি বিড়ি খায় !

মণি বলে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের আর কোন প্রতীক তোমরা পেলে না ? একটা সস্তা বেশ্যা আর তার মুসলমান বাবুটাকে সামনে দাঁড় কবিয়ে দিলে ?

ঘুমে প্রণবের চোখ জড়িয়ে আসছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে বসে একজনের কাছে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে সে ধরায়। বলে, সস্তা বেশ্যা ? সস্তা বেশ্যার মুসলমান বাবু ? দু-শো আড়াইশো মেয়ের মধ্যে তুমি বেশ্যা চিনলে কী করে বউদি ? দেড়-দুহাজার পুরুষের মধ্যে বেশ্যাটার মুসলমান বাবুটাকেই বা কী করে চিনলে ? গায়ে কি লেবেল আঁটা ছিল ?

মণি চটে বলে, কেন, আমাদের দুর্গা ? দুর্গার বাবু ওই নাজিম ?

প্রণব আশ্চর্য হয়ে খানিক্ষণ মণির মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বলে এত বড়ো প্রসেশনে তুমি দুর্গা ঝি ছাড়া কাউকে দেখতে পেলে না মণিবউদি ?

দেখতে পাব না কেন ? কিন্তু দুর্গাকে কী বলে তোমরা প্রসেশন লিড করতে দিলে ?

গোকুল মুচকে হেসেই ফস করে আবার নেভা বিড়িটা ধরিয়ে ফেলে। প্রণবও হাসে।

তুমি হাসালে মণিবউদি। যার খুশি হচ্ছে প্রসেশনে যোগ দিচ্ছে, সামনে থাকছে, পাশে থাকছে, পিছনে থাকছে, আমরা কি বাছতে বসব, কে কেমন লোক ? দুর্গাকে বলব, তুমি সস্তা বেশ্যা, বেরিয়ে যাও ?

ও ! তাই বলো ! আমি ভাবলাম, তোমরাই বুঝি ওদের দুজনকে সামনে দিয়েছ।

গোকুল চুপ করে শুনছিল, হঠাৎ সে বলে, ছেলেবেলা আপনি খুব আদুরে ছিলেন না ?

মণি ভ্রু কুঁচকে বলে, তার মানে ?

না এমনি বলছিলাম।

মণি মুখ কালো করে উঠে যায়।

সকালে চা খেতে খেতে গোকুল বলে, জানেন, আসল কথাটা তা নয়, আপনি যা ভেবেছেন।

গোকুল ভোরে উঠেই কী কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল, একটু বেলায় ফিরে একা চা খাচ্ছিল। কবি যে সময় নেই অসময় নেই এত কাজ করে, সমিতি শোভাযাত্রা মজুর-মিটিং থেকে বাজার করা—অথবা এত বাজে কাজ করেও যে কেউ কবি হয়; এটা মণির ধারণায় আসতে চায় না। কবি শুধু কবি, সে কেন কাজের মানুষ হবে ?

আমি কিছু ভাবিনি।

গোকুল এ কথা কানে তোলে না। বলে, ছেলেবেলা বাপের আদুরে ছিলেন, আপনার স্বভাব তাই বিগড়ে গেছে, আমি তা বলিনি। আপনি আমি মধ্যবিত্ত, মজুর-বিপ্লবের চাড় যখন বাড়ছে, তখন আমরা যে আসলে কী, তার কতগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমিও ছেলেবেলা বাপের আদুরে ছিলাম। তাই আপনার আমার লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

সে আবার কী !

লক্ষণ হল, কী চাই জানি না, যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। জীবন মনের মতো নয়, জগৎ মনের মতো নয়। আমি একদিকে আর সমস্ত জগৎ আরেক দিকে। নিজের জ্বালায় ভাজা-ভাজা হয়ে নিজের রসে সিদ্ধ হয়ে কবিতা লিখি—তোমার চোখে মরা তারা, অমাবস্যার রাত, আকাশ-ভরা কাদের জ্বলা চোখ ? তোমার চোখে মানুষ উঁকি দেয়, মাটির প্রদীপ নিবতে চেয়ে নিজের বুকে দপ্‌দপিয়ে জ্বলে, শেষ যাতনার রোখ ! আমি তোমার চোখে দেব চুমা, শেষ-মিলনের মরণ-কামড় দিয়ে—

গোকুল হাসে, এই সেদিনও এ রকম কবিতা লিখলাম। মরণের জয়গান করতাম। আপনিও তেমনি আজ দেড় হাজার মানুষের শোভাযাত্রায় জীবন না দেখে, ভবিষ্যৎ না দেখে, দেখলেন একটি ঝিকে ! কারণ, বেচারাকে আপনি ঘেন্না করেন।

মণি হাতজোড় করে ঝাঁঝালো সুরে বলে, আমার অপরাধ হয়েছে, এবার আমায় রেহাই দেও।

গোকুল বলে, রেহাই নেই। আমিও একদিন রেহাই চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন ?—মণি আশ্চর্য হয়ে বলে,—এই তো বয়েস তোমার। ছেলেবেলাতেই তোমার সমাজ-সংসার অসহ্য হয়ে উঠেছিল না কি ?

গোকুল হাসে।—ঠিক ছেলেবেলা নয়, ক-বছর আগের কথা বলছি। নিজের মনে ঘরের কোণে বসে শুধু কবিতা লিখতাম,—আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আমার জীবন গেল ! লিখতাম—এই কালো অতল মৃত চোরাবালিতে আমি তলিয়ে যাবই, তুমি আমার একমাত্র আশা। তুমিও কি চোরাবালিতে ধরা পড়েছ ? আমিও কি তোমার একমাত্র আশা ? এসো তবে ডুবে যাই, ডুবে যেতে মিলে যাই, মরণেরে জয় করি একসাথে মরে !

মণি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, মেয়েটি কে ঠাকুরপো ?

আমার মেয়ে। আমি তার বাপ।

তোমার মেয়ে ! পাগল হলে নাকি তুমি ?

আমার মানস-কন্যা। মানস-প্রিয়া বলে তো কিছু হয় না ? মন নিজের মধ্যে যাকে সৃষ্টি করে, সে মনের মেয়ে বটেই তো ! এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার না হলে কেউ একসাথে বাঁচতে চাওয়ার

বদলে মরতে চায় ? জগৎকে এড়িয়ে ঘরের কোনায় একলা বসে প্রাণভরে প্রিয়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে মরার কবিতা লিখেও রেহাই পাইনি। কারও রেহাই নেই মণিবউদি ! জীবনের বন্যায় ধরা পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি বলেই না আপনার আমার রেহাই পাবার সাধটা এমন উগ্র হয়েছে ? বদ্ধজলায় পচা-নালায় যারা আটকে গেছে, তারা পচে গেঁজে বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে উপে যেতেই ভালোবাসবে ; কিন্তু কোটালের জোয়ার আমাদের ভাসিয়ে এনেছে জীবন নদীর স্রোতে। এই স্রোতে মিশে না গিয়ে আমাদের উপায় কী ? স্রোতে এসে পচা-নালার ঘোলাটে জল কতক্ষণ আমিত্ব বজায় রাখতে পারে ?

প্রণবের চেয়ে গোকুলের কথা মণির ভালো লাগে, গোকুলের কথা সে মনে-প্রাণে বুঝতে পারে। গোকুল পাছে কথা শেষ করে কাজের তাগিদে উঠে যায় তাই মণি তাড়াতাড়ি বলে, ঠান্ডা চা গরম করলে স্বাদ থাকে না। এক কাপ টাটকা চা বানিয়ে দেব ?

যদিও মণি জানে, জরুরি কাজের তাগিদ থাকলে গোকুল তার জন্যও দেরি করবে না, টাটকা চায়ের জন্যও নয়।

দিন না। দিন।

তুমি যে রকম কবিতা লিখতে বললে, তোমার বইয়ে তো ও রকম কবিতা পড়িনি ? শুধু লোহার ডান্ডার মতো শক্ত কবিতা।

পুড়িয়ে ফেলেছি।

কত কবিতা লিখেছিলে ?

কয়েকটা খাতায় শ-চারেক।

মায়া হল না ? শ-চারেক কবিতা তো একদিনে লিখতে পারোনি, দু-চারবছর লেগেছিল নিশ্চয় ! খাওয়া নেই ঘুম নেই দিনরাত নেই শুধু ছটফটানি, জীবনটা ক্ষয় করা। আমি জানি, অল্পবয়সি এক কবিকে আমি ভালো করে দেখেছি। পুড়িয়ে ফেলতে মায়া হয়নি ?

গোকুল সগর্বে বলে, কীসের মায়া ? যা আমার পরাজয় মানার—

গোকুল থেমে যায়। লজ্জায় এক মুহূর্তের জন্য মাথা হেঁট করে।—না মণিবউদি, মিছে কথা বললাম। মায়া হয়েছিল, ভীষণ মায়া হয়েছিল। যখন বুঝলাম, এই চার-পাঁচশো কবিতা আমার বাহাদুরির প্রমাণ নয় আমার কাপুরুষি লজ্জার প্রমাণ, কবিতাগুলি তখন নষ্ট করে ফেলব ঠিক করলাম। তারপরেও প্রায় এক বছর ইতস্তত করেছি। কতবার পুড়িয়ে ফেলতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ভেবেছি, পুড়িয়ে ফেলব ? যদি দাম থাকে কবিতাগুলির ? এই যে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছি, এটা যদি ভুল হয়ে থাকে ? যদি হঠাৎ বুঝতে পারি আমার কবিতাগুলি অমূল্য ছিল ? পুড়িয়ে ফেলে সারা জীবন যদি আপশোশ করতে হয় ? এ রকম কত দ্বিধাসংশয় যে জাগত !

তারপর একদিন পুড়িয়ে ফেললে ?

হাঁ, তারপর একদিন পুড়িয়ে ফেললাম। একটা কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল ! আমার চোখের সামনে শুধু ধর্মঘট করার জন্য তিনজন মজুর গুলি খেয়ে মরে গেল। প্রাণে আমার আগুন ধরে গেল। রাত্রে কবিতা লিখতে বসলাম, প্রাণের সেই আগুনকে একটি কবিতায় পরিণত করব। ঘরের কোণে রাত দুটো পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে কবিতা একটা দাঁড় করালাম, জগৎটাকে যেন জয় করেছি এমনি তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোলাম। অনেক বেলায় উঠে চা-টা খেয়ে কবিতাটা পড়ে নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছা হল—

কী লিখেছিলে কবিতাটায় ?

মণির আগ্রহ গোকুলকে আশ্চর্য করে দেয়। প্রকাণ্ড উনানে গনগনে আগুন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের ভাত সিদ্ধ হয়। অন্যমনে খালি হাতে ফুটন্ত জলের কেটলিটা নামাতে গিয়ে মণির হাতে ছ্যাঁকা লাগে !

গোকুল বলে, সবটা মনে নেই। আরম্ভ করেছিলাম—

কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, কী আওয়াজ !
কানে যেন কোটিখানেক বিঁধলো সবু ছুঁচ !
প্রাণটা যেন ছুঁলো হঠাৎ কোটি কোটি প্রাণ
তীক্ষ্ণ ইশারায়।
নক্ষত্রের মতো।
মনের আকাশ জুড়ে জীবনের অপলক চাওয়া—

কেন, আরম্ভটা তো বেশ !

বেশ ? গোকুল হাসে, কী উপমা, কল্পনার কী ত্যারচা গতি—

মণি বুঝতে পারে না। চা ছেঁকে দুধ-চিনি মিশিয়ে কাপ এগিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে গোকুল বলে,—এ কী কবিতা ? এ তো আত্মপ্রতারণা ! মাটির পৃথিবীর ঘটনা মনে প্রতিবাদের আগুন জ্বালল, কবিতা চলে গেল মনের আকাশে জীবনের নক্ষত্রের মতো কোটি কোটি চোখ মেলে চেয়ে থাকায়। মনের আকাশটাই সব ? ঘরের কোণে একা একাই তো মনের আকাশের চাষ করা যায়—তাতেই বরং আকাশ-কুসুমের ফসল ভালো ফলে।

মণি তবু বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

গিরীন মাঝে মাঝে কবি মনসুরের খবর নেবার চেষ্টা করত। তিন সপ্তাহ মনসুরকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। মাথা তার বিগড়ে যায়নি, এক বিষয়ে ছাড়া। গিরীন ভেবেছিল, স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এলেই মনসুর তার উদ্ভট ধারণা ভুলে যাবে যে এতকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীন কৌশলে তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালে তাকে দেখেই মারতে চাওয়া, বাড়ি বয়ে গিয়ে রশৌনার ঝগড়া করে আসা, এ সব ব্যাপার নিয়ে খানিকটা হাসাহাসি হবে—এ-ও গিরীন আশা করেছিল।

মনসুরকে একটু সুস্থ হবার সময় দিয়ে দিন-দশেক পরে গিরীন আবার হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিল। এবার মনসুর তাকে কামড়ে দেবার চেষ্টা করেনি, তাকে দেখেই রাগে ঘৃণায় মুখ তার বিকৃত হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও। বেইমান ! হারামি ! কাফের !

সুস্থ হয়েও মনসুর তার বিকার কাটিয়ে উঠতে পারেনি, বন্ধুর বীভৎস বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা ধারণা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে ছিল সাম্প্রদায়িকতার অনেক উঁচুতে, ধর্মগত ছদ্মবেশী গোঁড়ামি পর্যন্ত যার কাছে ছিল বর্বরতায় শামিল, একটি হিন্দু বন্ধুর কাল্পনিক বজ্জাতি তাকে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মাদ করে দিয়েছে। কোমর বেঁধে সে নেমেছে হিন্দুবিরোধী প্রচারে। তার বিষোদ্গারের নমুনা গিরীনকে স্তম্ভিত করে দেয়, ভাবতেও তার অবাক লাগে যে ঘটনাচক্র মনসুরের কবি-হৃদয়ে কী আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ডাকে মনসুরের নতুন কবিতার বই আসে, গিরীনের নামেই আসে। ছোট্ট চটি বই, গোটা পঞ্চাশেক পৃষ্ঠা, কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছত্রে কী সীমাহীন আক্রোশ যে কাব্যহীন নগ্নতায় প্রকাশ পেয়েছে ! নতুন একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে—সম্পাদক মনসুর। প্রথম সংখ্যা পড়ে গিরীন বাক্যহারা হয়ে থাকে, এই কাগজের পিছনে তাদের মনসুর আছে—কবি মনসুর ? বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়।

নীলিমা কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে খানিকক্ষণ গিরীনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সব ফাঁকি। এবার বুঝতে পেরেছি।

কী ফাঁকি ?

কবি হয়ে, প্রগতিশীল হয়ে সুবিধা হচ্ছিল না, একটা অজুহাত খাড়া করে ভোল পাল্টেছে। কাগজের সম্পাদক, মোটা বেতন, আরও কত সুবিধে পেয়েছে কে জানে ! পরেও অনেক পাবে

নিশ্চয়। কী করব, কোন দিকে যাব ভাবছিল, এমন সময় মার খেয়ে হাসপাতালে গেল। ব্যাস, আর পায় কে ? বেইমান বন্ধু, মস্ত ষড়যন্ত্র—মানুষ এ সব সহ্য করতে পারে ? এই হল অজুহাত।

একটু থেমে নীলিমা যোগ দেয়, রশৌনার দুঃখ ঘুচল। দামি দামি শাড়ি পড়বে, জড়োয়া গয়না চড়াবে।

তাই কি তবে মনসুরের পাগলামির মানে ? নীলিমার কথা একেবারে বাতিল করতে পারে না গিরীন। নীলিমা হয়তো বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু মনসুরের আকস্মিক দিক পবিবর্তনের পিছনে বাস্তব লাভ-লোকসানের চাপ হয়তো ছিল—যার হিসাব সে সোজাসুজি কারবারি প্রথায় না করলেও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মানসিক আদর্শগত নিয়ম-নীতি বন্ধুত্ব প্রেম প্রীতি বিশ্বাস বেইমানির স্তরে করেছে। সাধারণ লোক যা সোজাসুজি কওত, কবি বলে মনসুর তাই জটিলভাবে করেছে।

মন কিন্তু মানে না গিরীনের। সে জানে, সংসারে বেঁচে থাকার বাস্তবতাই মানুষকে চালায়, যে শ্রেণির যার যেমন বাঁচা। তারও অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, যারা সামান্য একটা চাকরির জন্য গরিব শোষিত মানুষের শত্রুর দলে ভিড়তে পারে—কিন্তু সে আর তা পারে না। পারে না যে তাতে তার কোনো বিশেষ বীরত্ব বা অসাধারণ বাহাদুরি নেই, কারণ পারিবারিক সম্পর্কে পাড়া সম্পর্কে আর স্কুল-কলেজ সম্পর্কে যারা ছিল আত্মীয়বন্ধু, তারা শুধু নামে, পুরানো দিনের নিছক জের টানার নামে আত্মীয়বন্ধু হয়ে আছে। দেখা হলে কুশল প্রশ্ন করতে হয়, বিয়ে বা শ্রাদ্ধের ব্যাপারে একবার উঁকি দিয়ে আসতে হয়। নতুন বন্ধু, নতুন আত্মীয়, নতুন স্বজনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে তার নতুন জীবন, দৈনন্দিন খুঁটিনাটিতে, সমাজ-রাষ্ট্রের বড়ো বড়ো ব্যাপারে। খবরের কাগজের যে কেরানি, চাকরি তার আজ আছে কী কাল নেই, কিন্তু তাকে সম্পাদকের পদ কেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চাইলেও সে আপনা থেকে গড়ে ওঠা এই বন্ধুত্ব বাতিল করে পুরানো ধামাধারী পা-চাটিয়ে আত্মীয়বন্ধুর দলে ভিড়তে পারবে না। কারণ, সেটা হবে তার আত্মহত্যার শামিল। সে একা হয়ে যাবে, নিজের বিকার দিয়ে নিজেকে কুরে-কুরে মারবে, অভিশপ্ত প্রেতের মতো একাকীত্বের মহাশূন্যে ঝুলে থাকবে।

এদিক দিয়ে, চেতনা আর জীবনের এই পরিণতির হিসাবে, মনসুরের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল ছিল। মধ্যবিত্ত জীবনের ঠাটটুকু আছে, খোলসটুকু আছে, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনার সঙ্গে, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের চুকে গেছে। দুটো বেশি পয়সা এক টুকরো জমিতে ছোটো একটি বাড়ি, বেতনভোগী চাকরের কোটিপতির হাস্যকর অনুকরণে সংকীর্ণ অসংলগ্ন ভাবগ্রস্ত জীবনকে ঘষে-মেজে মিথ্যা জলুস দেবার চেষ্টা—এ পথে ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে। দুজনেরই পক্ষে। কিন্তু মনসুরের পক্ষে এভাবে বিগড়ে যাওয়া সম্ভব হল কী করে ?

বিগড়েই গিয়েছে মনসুর। তার নতুন কবিতার বই আর তার কাগজ পড়ে আর তাতে সন্দেহ করা যায় না। মাথায় চোট লেগে মাথা যত দিন বিকারে ঝাপ্‌সা হয়েছিল, ততদিন গিরীনের সঙ্গে হিন্দু সমাজটাকে ধ্বংস করার ঝোঁকটা হয়তো তার ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু মাথা যে মনসুরের এখনও কিছুমাত্র ভোঁতা হয়ে আছে মাথায় আঘাত লাগার ফলে তার এতটুকু চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাঙা মাথার ভোঁতা মস্তিষ্ক দিয়ে জঘন্য কাজও মানুষ এত নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারে না।

একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ গিরীনের মনকে চেপে রাখে, চেষ্টা করেও কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনসুর তার বন্ধু, শুধু এ জন্য নয়। তার জীবন-দর্শনের যেন একটা বাস্তব ব্যতিক্রম ঘটে গেল, যার মানে সে বুঝতে পারছে না। সে জানে, তার আর মনসুরের মতো মানুষের নতুন পথে চলতে হয় অনেক দ্বিধা-সংশয় নিয়ে, অনেক দুর্বলতা তাদের অগ্রগতিকে মন্থর করে রাখে, জীবনের নতুন মানে খুঁজতে অনেক সময় ভুল করে তারা অতীতের দিকে তাকায়। কিন্তু এ তো তা নয়। এ যে ডিগবাজি খাওয়া ! ইতস্তত করতে করতে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে এগোবার বদলে ঘুরে

দাঁড়িয়ে মৃত অতীতের দিকে মরণের খোঁজে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলা। এ রকম কাণ্ড মানুষ করে, তাদের মতো সাধারণ মানুষ শুধু নয়, অসাধারণ মানুষ, তাদের নেতৃস্থানীয় মানুষও করে। গিরীনের পরিচিত দু-চারজন এভাবে অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করেছে—গিরীন আশ্চর্য হয়নি। আগে পরিষ্কার না ধরতে পারলেও দিক পরিবর্তন করা মাত্র এদের কতগুলি বিশেষত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গিরীনের কাছে, সে বুঝতে পেরেছে এই পরিণতিই ছিল ওদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। লক্ষণগুলি আগে গৌণ ছিল, কিন্তু ছিল।

মনসুর তো এ ধাঁচের নয়। তার এমন কোনো ত্যারচা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার লক্ষণ তো আজ ভেবে বার করা যায় না, যার মধ্যে তার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। হতাশা ঘনিয়ে আসুক। বিষাদে দিগন্ত আচ্ছন্ন ভারাক্রান্ত হয়ে যাক, জনসমুদ্রের জোয়ার তাকে অক্ষম সকাতর ভীরু করে দিক, সক্রিয় বিশ্বাসঘাতক হওয়া মনসুরের ধাতে ছিল না।

অথবা ছিল ? মনসুরের সবদিক জানেনি বোঝেনি সে, শুধুই ভেবেছে মনসুর তার সব-জানা বন্ধু ? গিরীন নিজেকে বোঝায়, হয়তো তাই হবে। মনসুরের জীবনে হয়তো এমন অনেক বাস্তবতা গোপন ছিল, সে যার হদিস পায়নি। অন্য দু-চারজন বন্ধু যারা বিগড়ে গেছে, তাদের মতো হয়তো স্থূল ছিল না মনসুরের জীবনের বিরোধ আর সংঘাত, অবস্থার ফেরে হয়তো তার ভিতরের দুর্বলতা আর তেজ পরস্পরকে দাবিয়ে রেখেছিল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা ঘুচে একটি শক্তি অন্যটিকে চুরমার করে মহাসমারোহে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মনসুরের সঙ্গে আরেকবার দেখা করার জন্য গিরীন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। দেখা করে ব্যাপার বুঝে চরম বোঝাপড়া করে আসবে। প্রস্তুত হয়েই যাবে—মনসুর কামড়াতে এলেই ভড়কে যাবে না। ধমক দিয়ে বলবে, চোপ ! বোস এইখানে। দশ মিনিট কথা বলতে এসেছি, কথা বলে চলে যাব। চলে যেতে না দিতে চাস কথা শেষ হবার পর আমায় খুন করিস !

মনসুরের খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে দেখা করা কঠিন নয়। তার খবরের কাগজের আপিসে যেমন মুসলিম কম্পোজিটর, দপ্তরি আসে, মুসলিম কবি শিল্পী সাহিত্যিক রিপোর্টার আসে—মনসুরের খবরের কাগজের আপিসেও যে তেমনি হিন্দু কম্পোজিটর দপ্তরি কবি শিল্পী সাহিত্যিক রিপোর্টার যাতায়াত করে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। নইলে কাগজ চলে না !

মনে মনে গিরীন জানে, তাকে খুন করা দূরে থাক, মনসুর তাকে রীতিমতো খাতির করবে। হাসপাতালের আহত বিকারগ্রস্ত মনসুর খবরের কাগজের সম্পাদক মনসুর নয়।

গিরীন কিন্তু যায় না। এ দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। এত তার কীসের বন্ধুপ্রীতি যে জন-সমুদ্রকে ভুলে গিয়ে কাজের ক্ষতি করে একটি মানুষের জন্য, একটি বুদ্‌বুদের জন্য সে মাথা ঘামাবে ? চুলোয় যাক মনসুর। জনতার রোষে অমন কত হিন্দু মনসুর, মুসলিম মনসুর ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রণব বলে, তা যাবে কিন্তু এ অভিমান তো তোমায় মানায় না গিরীন। একটা মানুষ বিগড়ে গেছে, তোমার হিসাবে সেটা বেখাপ্পা ঠেকছে, কেন বিগড়ালো কারণ খুঁজে পাচ্ছ না। হঠাৎ কোনো খাপছাড়া অসাধারণ কারণ হয়তো মনসুরকে কাবু করেছে। এটা মনসুরের সাময়িক দুর্বলতা হওয়া অসম্ভব নয়। চেষ্টা করলে হয়তো তাকে বদলানো যায়। একটু সাহায্য পেলে হয়তো মনসুর ক্রাইসিস্‌টা কাটিয়ে উঠতে পারে, না পেলে হয়তো—

কানু হাজির ছিল। প্রণবকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা বাড়িয়ে দেয়।

গোসা করলে চলবে কেন গিরীনবাবু ? লিখাপড়া জানা আদমি কমজোর হবে, ভুলচুক করবে। গোসা করবেন তো তাকে রাস্তা বাতলাবে কে ?

গিরীন মাথা নেড়ে বলে, রাস্তা ঢের বাতলানো হয়েছে। আর বেশি রাস্তা বাতলাতে গেলে ভাববে, তেল মাখাতে এসেছে। অহংকার বাড়বে শুধু।

প্রণব বলে, তোমার বিশেষ বন্ধু তাই—

না, আর বন্ধু নেই। কোনোদিন ছিল কিনা ভাবছি।

কয়েক দিন পরে এক প্রেস কনফারেন্সে মনসুরের সঙ্গে গিরীনের মুখোমুখি দেখা। মনসুর প্রথমে কথা বলে।

কেমন আছ ?

আছি এক রকম। তোমার খবর কী ?

জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করা, তোমার খবর কী, নইলে মনসুরেব খবর কিছু অজানা নেই গিরীনের। তবে, চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে মনসুরের। শুধু রোগা হয়ে যায়নি, মুখে একটা অস্বাভাবিক বিবর্ণতা, চোখ বসে গেছে, কিন্তু সেই চোখে মারাত্মক রোগের সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের খাপছাড়া তীক্ষ্ণ জ্যোতি—দেহের আড়ালে প্রাণশক্তি জমার চেয়ে বেশি খরচ হতে থাকলে যে জ্যোতি আসে। মাথার ফাটার দাগটা এখনও চুলে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়নি, সবটা কোনো দিন ঢেকে যাবেও না, চুলের ভেতর থেকে চিহ্নটা বাঁদিকে কপালে খানিক দূর নেমে এসেছে। কিন্তু মাথা ফাটার সঙ্গে মনসুরের এখনকার খারাপ চেহারার কোনো সম্পর্ক যে নেই, সেটা খুব স্পষ্ট। মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে গিয়ে মানুষের কঙ্কালের মতো শীর্ণ-বিশীর্ণ হয়ে পড়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু ফাটা মাথা জোড়া লাগার পর সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন শরীর হাজার রোগা হোক, স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির চিহ্ন তাতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। বোঝা যায়, মানুষটা অসুস্থ কিন্তু সুস্থ হচ্ছে। মনসুরকে দেখলে মনে হয় উলটোটা ঘটছে, স্বাস্থ্য তার ক্ষয় হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

মনসুর মৃদু হেসে তার কথার জবাব দেয়। দুজনেই তারা পরস্পরের পাশ কাটিয়ে অন্যত্র তাকায়, আবার দৃষ্টি তাদের মুখোমুখি হয়। দুজনেই জানে যে এমন আচমকা দেখা হওয়ায় এটুকু অস্বস্তি বোধ না করে তারা পারছে না !

মনসুর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই হাত বাড়িয়ে গিরীন তাকে বাধা দেয়। মনসুরের মুখেচোখে মরণের ছাপ দেখতে দেখতে সে আর সব কথা ভুলে গেছে।

এ কী চেহারা হয়েছে ? কী ব্যাপার মনসুর ?

কিছু না। ব্যাপার আবার কী ?

তার মানে ?

মানে ? মনসুরের দুচোখে আগুন জ্বলে ওঠে, মানে দিয়ে কী করবে ? হাসপাতালে মরতে পাঠিয়ে তিন মাসের মধ্যে একবার খোঁজ নেবার সময় হল না, আমার কী হয়েছে না জানলেও তোমার বেশ চলে যাবে গিরীন।

দুবার হাসপাতালে গিয়েছিলাম মনসুর। আমায় দেখলেই তোমার মাথা বিগড়ে যেত, তাই....

দুবার গিয়েছিলে ? তোমার মাথাই বিগড়ে গেছে!

ক্ষীণ দুর্বল হাতে তাকে একটু পাশে ঠেলে দিয়ে মনসুর এগিয়ে যায়।

মনসুরের মনে নেই। তাকে বেইমান ভাবার কথা, তাকে দেখে খুন করতে চাওয়ার কথা সব মনসুর ভুলে গেছে। উলটে গিরীন কেন খবর নিতে যায়নি বলে প্রচণ্ড অভিমানে বন্ধুকে বাতিল করেছে মনসুর।

মাথায় চোট লেগে জ্বরবিকারের ঘোরে তার সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ধারণা জন্মেছিল, সেটা ভুলে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু কী তবে হয়েছে মনসুরের ? কীসে তাকে এমনভাবে কাবু করেছে, দেহে ও মনে ?

প্রেস কনফারেন্স শেষ হবার পর মনসুরকে পাকড়াও করতে গিয়ে গিরীন দ্যাখে, সে এমন এক উচ্চপদস্থ দলে ভিড়ে গেছে যে কাছে গিয়ে কথা বলা অসম্ভব। অধঃপতনের এত উঁচু স্তরে গিরীন নামতে শেখেনি। অগত্যা সে ফিরে যায়।

রাতে নীলিমা সব শুনে বলে, কাল আমি ওদের বাড়ি যাব। রশৌনার কাছে জেনে আসব ব্যাপার কী।

গিরীন বলে, না, তোমাদের স্তরে আমাদের ভুল বোঝার মীমাংসা হবে না। তুমি পরে যেয়ো কাল আমি যাব।

মনসুর বাড়ি ছিল না। ম্লান গম্ভীর মুখে রশৌনা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বসায়। সে অনেক দিনের বন্ধু। বাড়ি তাদের আসবাবপত্রে ভরে যায়নি, রশৌনার গায়ে জড়োয়া গয়নাও ওঠেনি। বরং ম্লান শুকনো মুখে তার ছাপ পড়েছে গভীর হতাশার।

অন্য এক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়িতে কিছু নতুন মানুষ এসেছে—ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে গিরীন দুটি পর্দানশিন মানুষের অস্তিত্ব টের পায়।

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোপন করা বোরখার আশ্রয় ছাড়া যাদের অন্দরের চৌকাঠ পার হওয়া নিষেধ।

মনসুর এখনই ফিরবে। কাছেই ডাক্তারের কাছে গেছে।

ডাক্তার ?

রশৌনা চোখ তুলে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। কিছু বলে না। সে-ও রোগা হয়ে গেছে। তারও কাজল-কালো চোখ দুটিতে গভীর হতাশা।

কী অসুখ রশৌনা ?

টি বি।

গিরীন চুপ করে বসে থাকে। অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায়। মনসুর কেন বিগড়ে গিয়েছে, তাও যেন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে তার কাছে।

রশৌনা এবার নিজে থেকেই অসুখের বিবরণ জানায়। মনসুরকে রোগটা ধরেছিল আগেই, কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তারা তখন ধরতেও পারেনি, অতটা গ্রাহ্যও করেনি। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়ে শরীরটা কাবু হওয়ায় রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফাটা মাথা আর গায়ের জখম থেকে যা রক্ত পড়বার পড়ে গিয়ে চুকেবুকে গিয়েছে, কিন্তু এবার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে মনসুরের।

এও জখম রশৌনা, জানো ? কারা এ জখম করেছে জানো ?

রশৌনা সায় দিয়ে বলে, জানি।

অসুখের জন্য চাকরি নিয়েছে ? নতুন ধরনে কবিতা লিখেছে ?

কী করবে ? বাঁচতে হবে তো! ভালো চিকিৎসা ছাড়া এ রোগ তো সারে না। আচ্ছা করেছে চাকরি নিয়েছে, নয়া কবিতা লিখছে। একশোবার! হাজারবার! লোকটা মরলে আপনারা খুশি হতেন ? কবরে ফুলের তোড়া পাঠাতেন ?

গিরীন চুপ করে থাকে। সে সমালোচনা করেনি, কৈফিয়ত চায়নি, মরণের আশঙ্কা তুচ্ছ করে যেচে এ পাড়ায় তাদের বাড়ি বয়ে খবর নিতে এসেছে—এটা খেয়াল করে রশৌনার ক্রোধ ও উত্তেজনা তাড়াতাড়ি ঝিমিয়ে যায়।

মেজাজ ঠিক থাকে না। নীলিমা আর স্বরুদির সাথে মিছে গিয়ে ঝগড়া করে এসেছিলাম, গিয়ে সব বলে আসতে সাধ যায়। কিন্তু কী আর যাব, কী আর বলব।

তার গভীর অতল হতাশার মধ্যে গিরীন মনসুরের মানসিক অবস্থারও পুরো হদিস খুঁজে পায়। আপশোশের তার সীমা থাকে না যে নিজেকে এত বড়ো বাস্তবধর্মী বলে জেনেও নিছক আদর্শবাদের খাতিরে বন্ধুর সঙ্গে এতদিন যোগাযোগ বন্ধ রেখেছে !

মনসুরের প্রচণ্ড অভিমানের মানে সে এখন বুঝতে পারে। নিরুপায় অসহায় একক হয়ে গিয়েছিল মনসুর—এ জগতে একজন, শুধু একজন মানুষও যদি তার কাছে থাকত, একটু তাকে সাহস দিত, ভরসা দিত।

না, মনের জোরের অভাব ছিল না মনসুরের। তার চেয়ে একবিন্দু কম ছিল না, নিজেকে সে যতই একনিষ্ঠ মনে করুক। আত্মবিক্রয়ের অনেক সুযোগ অনেক প্রলোভন বিনা দ্বিধায় বর্জন করে যে বিশ্বাস আর তেজের বিনিময়ে মনসুর এই রক্তক্ষয়ী রোগ অর্জন করেছে, তা ভুয়ো ছিল না। স্বার্থপর দুর্বল মন নিয়ে মনসুর বিগড়ে যায়নি।

অত সস্তা মানুষ ছিল না মনসুর।

তার প্রতিক্রিয়াও কি তাই প্রমাণ করে না ? রশৌনার মধ্যে তার যে সীমাহীন হতাশা প্রতিফলিত হয়েছে, প্রেস কনফারেন্সে যে সীমাহীন অভিমান সে প্রকাশ করেছে, এ সব তো ক্ষুদ্র-প্রাণ দুর্বল-হৃদয়ের ধর্ম নয়। ক্ষীণ-প্রাণ দুর্বল-হৃদয় সুবিধাবাদী হলে ডিগবাজি খাওয়াটা আরও সহজভাবে মনসুর গ্রহণ করত, অপরাধী মনের বাঁকা যুক্তি আর ফাঁকা অভিযোগ ফেনিয়ে তুলে নিজের কাজের সমর্থন সৃষ্টি করত, এমনভাবে বিচলিত হত না।

ছোটো মানুষের আশা যেমন হয় ভবিষ্যতে নিজের একটু সুখ-সুবিধা, হতাশাও তেমনি হয় মৃদু একটু মানসিক বেদনাবোধ।

নানাচিন্তা আনাগোনা করে গিরীনের মনে।

সে যদি সংযোগ রাখত মনসুরের সঙ্গে! রক্তবমি করার চরম হতাশার মুহূর্তে সে যদি মনসুরকে শুধু মনে পড়িয়ে দিত যে, বড়োলোকের দামি চিকিৎসায় সকলের রক্তবমি কবা রোগ সারে না, জীবন ফিরে পাবার এ সহজ পথ তার বা মনসুরের জন্য নয়। কোটি মানুষের খিদে ন্যাংটামি নোংরামি রোগ দিয়ে রক্তশোষণ আর লাঠি ও গুলিতে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থাকে চালু বাখতে সাহায্য করার বিনিময়ে সেরা খাওয়া-দাওয়া, সেরা আরাম-বিলাস পেলেও মনসুবের কাশতে কাশতে রক্ত তুলে মরার রোগ সারবে না।

নয়

গিরীনের হয়েছে আপশোশ, তার কবি-বন্ধু মনসুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার জন্য। প্রণবের হয়েছে কী ?

প্রণবকে মাঝে মাঝে খুব চিন্তিত দেখায়। গভীর দার্শনিক চিন্তায় মশগুল হয়ে গেছে, সেরকম চিন্তিত নয়। আমাদের মণি পর্যন্ত টের পায়, এ নতুন চিন্তা। আত্মচিন্তাকে প্রণব বলে দুশ্চিন্তা, তার মধ্যে ডুবে যাবার, বিচলিত হবার ধাত তার নয়। কিন্তু মুখে যেন আজকাল তার দুশ্চিন্তারই গাঢ় ছায়া পড়েছে।

দুদিনের জন্য বাড়িতে একটি নতুন লোক আসে। ধোয়া-মোছা-ঝাড়াই করা আলগা বিপ্লবী ঝড়ের মতো লোকটি। তার নাম মনস্বামী। দুদিন ধরে বাড়িটিকে সে সরগরম করে রাখে। কত রকমের কত লোক যে যাতায়াত করে, কত যে ছোটোবড়ো বৈঠক বসে, জীবনের পরিসর যে কত দিকে কতভাবে বেড়ে যায়।

মণি ভীষণভাবে দমে গিয়েছিল, সে-ও অদ্ভুতভাবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে মেতে গেছে। মনস্বামী তাকে বিশেষভাবে খাতিব করে বিশেষভাবে তার সঙ্গে আধঘণ্টা আলাপ করাব পর তাব এই পরিবর্তনটা দেখা যায় !

মনস্বামীর সঙ্গে আলোচনার মধ্যে প্রণবের মাথায কীসের চিন্তা ঢুকেছে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। মনস্বামী যেদিন এসেছিল সেইদিনই গভীর রাত্রে আলোচনা-মুখর এক ধরনের অবসর ভোগ করেছিল সকলে।

প্রণব বলে, আমার মনে খটকা লেগেছে। গান্ধী-জিন্না আপসে কিছু হবে না। ওটা আসলে ব্রিটিশের সাথে আপস।

মনস্বামী বলে, তা ছাড়া পথ কী আছে ?

গিরীন ও গোকুলকে নিয়ে জন-ছয়েক উপস্থিত ছিল। মণিও উঠি-উঠি করছিল কিন্তু উঠতে পারেনি, আলোচনা এমন এক পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল যে সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল—এ দেশের স্বাধীনতা মানেই জগতের মানুষের মুক্তি। এ সবের চেয়ে রসালো কথা আজকাল আর তাব কাছে কিছুই নেই।

সকলেই ছিল মুখর, সারাদিনের ছুটোছুটি ঝঞ্ঝাটের শ্রান্তি সকলেরই মুখ দিয়েছিল খুলে, প্রণবের কথা শুনে কিন্তু এমনভাবে সকলে চুপ হয়ে যায় যে, মণির বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে থাকে !

প্রণব বলে, আমাব মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধী-জিন্না আপসে চেযে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ওই স্তরে আপস হবেও না সে আপসে সাধারণ মানুষের লাভও নেই। গরিব খাটুয়ের মধ্যে খাঁটি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত, কংগ্রেস-লিগ মিলন নয়। কংগ্রেস-লিগ-ব্রিটিশ এই তিন পক্ষে আপস হতে পাবে, কংগ্রেস-লিগ আপস হবে না। ব্রিটিশের আপস আদরে কংগ্রেস-লিগ দুভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোযারা নিযে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে, ব্রিটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশকে বাতিল করতে তো পাবে না !

আমরা জনমত সৃষ্টি করব। চাপ দিয়ে ব্রিটিশকে বাতিল করাব।

জনমত ওদেবই কাজে লাগবে, কাজে লাগছে। ওদের পলিসির ফলে এই দাঙ্গা, ওদেব মধ্যে আপস চাওয়া মানেই এই ব্রিটিশের ফরমাসি পলিসি সমর্থন করা। আমরা বলছি, পরস্পবের পলিসিকে তোমরা মেনে নাও, একটু ত্যাগ স্বীকার কর দুপক্ষেই—পলিসি যে ভুল, দেশেব স্বার্থ-বিরোধী, তা তো আমরা বলছি না ! মজুর এলাকায় আমি যে হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি দেখেছি তাতে আমার চোখ খুলে গেছে।

তাই নাকি ?

বোঝা যায়, মনস্বামী বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে।

প্রণব সেটা লক্ষ করেও বলে, গান্ধী-জিন্নার বোঝাপড়া হোক, সেটা হিন্দু-মুসলিম মিলন হবে না, কৃত্রিম ব্যাপার হবে। আমরা এই মিথ্যেটাকেই ফাঁপিয়ে তুলছি। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্ট দেখছি, সাধারণ মজুর চাষি হিন্দুত্ব মুসলমানত্বের উপরে উঠে রাজনৈতিক স্বার্থে হাত মেলাতে পাবে, হাত মেলাচ্ছে। কলকাতার মজুরদের দাঙ্গায় নামানো যায়নি, তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে তারা একতা বজায় রেখেছে। এই মিলনটাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত, আমরা ভুল করছি।

এ সব তোমার ফ্যান্সি। বেশি বেশি বই পড়ে বাস্তব ভুলে যাচ্ছ !

তুমুল তর্ক বেধে যায়। প্রথম থেকেই বিরক্তি নিয়ে শুরু করেছিল বলে মনস্বামী বেশি রকম চটে উঠতে থাকে। প্রণব গরম হয় কিন্তু রাগে না, তর্ক অচল হয়ে পড়লে সে-ই এক রকম দুজনেরই

মেজাজের লকআউট মীমাংসা করে দিয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করে। কে বলবে দুজনে তারা সেই ভোর থেকে লোকের পর লোকের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শ করেছে, বৈঠক চালিয়েছে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করেছে—মাঝে রাত্রির আগে এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায়নি।

মণি অবাক হয়ে তাদের তর্কও শোনে, অন্য সকলে কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথা শুনছে তাও অবাক হয়ে দ্যাখে। বেশির ভাগ কথাই সে ভালো বুঝতে পারে না।

হঠাৎ এক সময় গোকুল বলে, আমারও মনে হয় প্রণবদার কথাই ঠিক। আমরা ভুল করছি। উপরতলার নীতি থেকে দাঙ্গা বেধেছে, কিন্তু উপরতলায় দাঙ্গার প্রতিকার নেই। নেতাদের মর্জির উপর নির্ভর করে আমরা সাধারণ খাটুয়ে মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

বিশ্বাসঘাতকতা ! কথাটা সরাসরি গোকুল না বললেও পারত। এত সহজ তো নয় বিচার আর সিদ্ধান্ত—প্রণবও কি সমগ্র জগতের সমস্যার সঙ্গে সমগ্র দেশের সমস্যাটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুলভাবে বিচার-বিবেচনা করে কীসের ভুল তা ঠিক করেছে, কথাটা তার মনে হয়েছে মাত্র। গোকুল বোঝে আরও কম। কবি মানুষ, কম বোঝাটুকুর মধ্যেই বিরাট খাঁটি সত্যের ইঙ্গিত তাকে ভুলের স্বরূপটা চিনিয়ে দিয়েছে। দশজনের ভালোমন্দের দায়িত্ব যে নেয় তার ভুল সাধারণ ভুল নয়, দশজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা !

দশের জন্যে যে দায়ি, তার ভুল করার অধিকাব নেই। তবু কথাটা গোকুল এ বকম চটাং চটাং ভাবে না বললেও পারত।

মনস্বামী আচমকা গম্ভীর ও চুপ হয়ে যায়। খানিক পরে মণিকে বলে, ঘুমোবার ব্যবস্থা করেছেন নিশ্চয় ?

মণি খুশি হয়ে বলে, আপনারা আবার ঘুমোন নাকি ?

মণির নিজেরই ঘুম আসে না অনেকক্ষণ। কী ঝগড়াটাই দুজনের মধ্যে হয়ে গেল ! কাল হয়তো ওরা পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবে না, দেশ ও দশের মুক্তিব জন্য জীবনপাত করে খাটবে দুজনে, কিন্তু একসাথে খাটবে না, তফাতে সরে যাবে।

কী আপশোশের কথা !

ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত্রি পর্যন্ত যেভাবে ঘরে-বাইরে তারা দুজনে শত শত মানুষকে পরিচালনা করেছে, আন্দোলন গড়েছে, কাজ করেছে—বাইরে না গেলেও ওদেরই আলাপ-আলোচনা পরামর্শ শুনে সেটা কল্পনা করা মণির পক্ষে শক্ত। কোথায় গিয়ে তারা কী করেছে, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে তার বিবরণ শুনে নিতেও সে কসুর করেনি। কাল থেকে ওরা পরামর্শ করবে না, পরিকল্পনা গড়বে না, একসাথে মিটিং শোভাযাত্রা করতে যাবে না। দুজনেই ওরা কুনো হয়ে যাবে। মণির গভীর বিষাদ জাগে।

তার দাম্পত্য জীবন সত্যিকারের জীবন ছিল না, ছিল ফাঁকি ; তাদের দাম্পত্য কলহও তেমনি সত্যিকারের কলহ ছিল না, তাও ছিল ফাঁকি। এখানে এসে স্বাধীন ও খাঁটি মতবিরোধের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে আসল ঝগড়া হয়ে গেছে, দুজনে আর তারা একসাথে সংসার চালাবে না। ক্ষুদ্র তুচ্ছ সংসার, কৃত্রিম কদর্য পারিবারিক জীবন। এতকাল একসাথে মিলেমিশে ভালোবেসে হেসে কেঁদে ন্যাকামি করে দুজনে তারা ফাঁকিতে ফাঁপানো পারিবারিক কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করার নামে ঝকমারি করে আসছিল, এতদিনে ঝগড়া করে পৃথক হয়ে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু মনস্বামী আর প্রণব তো এতদিন এ রকম ফাঁকির কারবার করেনি, তারা বিপ্লবী, ঈশ্বর আল্লা অহিংসা মাধুরীর ধোঁকাবাজি ফাঁকিবাজি বাতিল করে তারা টাকার পাহাড় আর দারিদ্র্যের অতল কুণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে ভেঙে চুরমার

করে দিতে দিতে গড়ে তুলবার সাধনায় নেমেছে। ওদের মতবিরোধও যদি তাদের দাম্পত্য কলহের চরম রূপ নেয়, সে তবে কীসের ভরসা করবে ?

এমনি এক রাতদুপুরে আরেক কেলেঙ্কারি। সুশীল একটু মত্ত অবস্থায় ফিরে আসে। ভূমিকা পর্যন্ত না করে সে চিরকালের অভ্যস্ত প্রথামতো মণিকে ভোগ করতে উদ্যত হয়। এ বিষয়ে চিরকালই সে ছিল নিরঙ্কুশ। মণিও অবশ্য প্রশ্রয় দিত, ঘরে নিরঙ্কুশ হতে না দিলে স্বামী বাইরে নিরঙ্কুশ হতে চাইবে, এটা আর কোন স্ত্রী না জানে ! হতাশায় ডুবে না গেলে মণি হয়তো বাঘিনির মতো গর্জে উঠে সুশীলের গলা টিপে ধরত লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দিত বিছানার বাইরে। কিন্তু বিষাদে-অবসাদে আজ সে দিশে হারিয়েছে। সে মৃতের মতো নির্বাক নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। সকালে ঠান্ডা মাথায় রাত্রির কথা স্মরণ করে মণি শিউরে ওঠে। কী সর্বনাশ, আবার যদি সে ফাঁদে পড়ে গিয়ে থাকে ! আবার যদি তাকে মা হতে হয় ওই মানুষটার সন্তানের ! তার ধারণা ছিল, মত ও মনের অমিল হওয়ায় তাদের মধ্যে চটাচটি হয়ে গেছে, সে শুধু ভীষণ রেগে আছে সুশীলের উপর। আজ সে প্রথম টের পায়, কী ঘেন্নাটাই তার জন্মেছে, সুশীলের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ছাড়া কোনো ভাবই তার মনে নেই।

সকালে মনস্বামী ও প্রণবকে চা খেতে খেতে গতকালের মতোই পরামর্শে এবং তারপর চারিপাশের সমস্ত বস্তি ঝেঁটিয়ে শোভাযাত্রা গঠনে মশগুল হতে দেখে মণি একটু বিমূঢ় হয়ে যায়। কে বলবে, ওদের কাল মতের অমিল ঘটেছিল গুরুতর, তর্ক হয়েছিল প্রায় ঝগড়ার মতো, মিলেমিশে একসাথে তারা কাজ করতে পারবে, কল্পনা করাও কঠিন ছিল মণির পক্ষে !

গোকুল শুনে বলে, ঝগড়া ? ঝগড়া কেন হবে !

কাল যে চটাচটি হল ?

চটাচটি নয়। মতের অমিল।

গোকুল মাথা নাড়ে। বলে, কাল ঝগড়াও হয়নি, আজ মতের মিলও হয়ে যায়নি। এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় যে মত না মিললে ঝগড়া হয়ে যাবে, আবার আসল প্রশ্ন বাদ দিয়েই আপসে মিল হয়ে যাবে। জিনিসটা আপনি ঠিক ধরতে পারছেন না মণিবউদি।

মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। তায় আবার মেয়েমানুষ।

গোকুল হাসে।—ওই তো, ওইখানেই ঠেকেছেন। নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রেখেছেন, মর্মগ্রহণ হচ্ছে না। আপনি মুখ্যু না মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে তো এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই ! মজুর চাষা কি আপনার চেয়ে বেশি বিদ্যা লাভ করেছে ? বিদ্বানের চেয়ে সহজে তারা বুঝে নেয়। মেয়েমানুষ হলে কি বুদ্ধি কম হয় ?

অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে মণিকে নীরবে হাতজোড় করতে দেখে গোকুল জোরে হেসে ওঠে। এই ভেবে সে খুশি হয় যে, মণি আজ চটেনি, বিরক্ত হয়নি, সহজভাবেই তার সমালোচনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবাদের ভঙ্গিটাই তার প্রমাণ।

এ একটা পরিবর্তন।

মণি বলে, কীসে কী হয় আর কীসে কী হয় না, সে বিচারে না গিয়ে সাদামাটা কথাটা স্পষ্ট করে বলো। থিয়োরি কষে দশ ঘণ্টা বোঝালেও মাথায় ঢুকবে না। যা নিয়ে কথা উঠল, ঠিক সেই বিষয়টা ধরে বুঝিয়ে বলো তো, কোন জিনিসটা ধরতে পারছি না। মনস্বামী আর ঠাকুরপোয় ঝগড়া কেন ঝগড়া নয়, মতের অমিল কেন মনের অমিল নয় ? কাল রাতে গরম হয়ে দুজনে দুজনকে স্পষ্ট বলল, তোমার কথা ভুল। ভোরে উঠে দুজনে দুজনার ভুল মেনে নিল কী করে ?

কে বললে তোমাকে, ভুল মেনে নিয়েছে ?

একজন নিশ্চয় নিয়েছে ! নইলে মত হল দুরকম, কাজের পথ এক হয় কী করে ? ঠাকুরপো বললে, কংগ্রেস-লিগের মিলনের ভরসা করা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। ভোরে ঘুম ভেঙে

ঠাকুরপো সুড়সুড় করে বেরোলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের আন্দোলন করতে। চা খেয়ে তুমিও ওই কাজে ছুটবে।

গোকুল বলে, আমি যাব খেপাতে। মন্ত্রী-কমিশনের বিরুদ্ধে একটা জবর ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে। নইলে অবশ্য ওদের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান মেলাতেই যেতাম। তোমার কথার জবাবটাও তাই দিতে হয়।

মণির মুখের কঠিন ভাব লক্ষ করে মাথা হেলিয়ে যেন তার মনোভাবে সায় দিয়ে বলে, তুমি যে সীমা বেঁধে দিয়েছ, তার বাইরে যাব না। তুমি কাল কোন জিনিসটা ধরতে পারনি জানো ? আমাদের কোনো ব্যক্তিগত পৃথক মত নেই। গরিব খাটুয়ের লড়ায়ে আমার মত, তোমার মত নেই, শুধু আছে আমাদের মত। সবাই যদি ভুল করে, আমিও সকলের সঙ্গে ভুল করব—যতক্ষণ সকলকে বোঝাতে না পারছি, ততক্ষণ আমি একলা কী বুঝলাম তার কানাকড়ি দাম আমার কাছেও নেই। সাধারণভাবে অনেকের মনে যে সব কথা জাগছে, কাল আমরা তাই নিয়ে ভাসা-ভাসা প্রাথমিক আলোচনা করেছি মাত্র, ঝগড়া নয়।

ভাসা-ভাসা প্রাথমিক আলোচনা ?

তা বইকী। আসল বিষয়ে আমাদের তো কোনো খটকা নেই, আমাদের লড়াইকে হিন্দুত্ব-মুসলমানত্বের উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, শুধু ইংরেজ নয়, কংগ্রেস আর লিগের হাত থেকেও দেশকে রক্ষা করতে হবে, এ নিয়ে কাল আমাদের তর্ক হয়নি। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস-লিগের আপসের কথা বলা ঠিক হচ্ছে কী হচ্ছে না, এই হল আমাদের তর্ক। কংগ্রেস-লিগের মিলন আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কি এক জিনিস ? আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, তা নয়। কংগ্রেস-লিগের মিলন যদিই বা হয়, সে হবে উপরতলার মানুষের স্বার্থে। আসল ঐক্য নীচের তলাতেই সম্ভব, সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মণি বলে, কংগ্রেস-লিগ সাধারণের স্বার্থ দ্যাখে না ? কংগ্রেস দেশকে স্বাধীন করলে সাধারণ লোক স্বাধীন হবে না ?

গোকুল স্পষ্ট ভাষায় বলে, না। কংগ্রেস বা লিগ সে রকম স্বাধীনতা চায় না যা মজুর-চাষি সাধারণ লোককে স্বাধীন করবে। ইংরেজের সঙ্গে আপসে ও রকম স্বাধীনতা মিলতেই পারে না। নইলে ইংরেজের ভারত ছাড়া নিয়ে এত মারামারি কেন ? এত শর্ত কীসের ? বিদেশি তোমরা ভাগো, আমাদের যা হবার হবে, আমরা বুঝব—এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া স্বাধীনতা খাঁটি হয় ? ফাঁকির স্বাধীনতা, তাই নানারকম শর্ত নিয়ে দরদস্তুর।

কিন্তু ক্ষমতা তো পাওয়া যাবে ? ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়েই তো মারামারি ?

সেটাই তো প্রমাণ যে, ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যে ফাঁকি আছে। সত্যিকারের ক্ষমতা মানেই জনসাধারণের ক্ষমতা, ধর্মের নামে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে জনসাধারণ মারামারি করে না। উপরতলার একদল লোক দেশ শাসনের নামে এক ধরনের কিছুটা ক্ষমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন। আপসে দরদস্তুর করছে তারাই। দেশে আগুন জ্বলেছে, সৈন্যেরা পর্যন্ত বিদ্রোহী। সোজাসুজি এ দেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত শোষার সাধ্য আর ইংরেজের নেই। তাই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা দিয়ে পরোক্ষ দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সে ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে কংগ্রেস আর লিগ।

বিশ্বাসঘাতকতা ঠাকুরপো ?

বিশ্বাসঘাতকতা। জনসাধারণ বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাসের মান না রাখাকে আর কী বলে বউদি ? এই দিকে আমাদের চোখ ফুটছে। একটা দিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এই দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে। জনসাধারণের মধ্যেই আসল দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব আছে, সত্যই তারা দাঙ্গা চায়

না। ঐক্যের খাঁটি বাস্তব ভিত্তি দেখেছি মজুরদের মধ্যে। এত কাণ্ডের মধ্যেও মজুর শ্রেণি স্থির রয়েছে, কারও ভাঁওতায় ভোলেনি, উসকানিতে বিচলিত হয়নি, হানাহানি দেখে উত্তেজিত হয়নি, বরং এগিয়ে গিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছে। মজুররাই এগিয়ে গিয়ে দাঙ্গা থামাতে পারত, ঐক্য গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারত, এটা আমাদের খেয়াল হয়নি, আমরা কংগ্রেস-লিগ আপসের ভরসায় থেকেছি।

মণি খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, গোকুল, মজুর-মেয়েরা শোভাযাত্রায় আসে ?

আসে না ? জমায়েতে আসে, বক্তৃতা পর্যন্ত দেয়। দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাদের সোজা স্পষ্ট কথা শুনে আমাদের জ্ঞান জন্মে যায়। বুঝতে পারি, কত সোজা কথাকে আমরা কত পেঁচিয়ে ভাবি।

সেদিনের শোভাযাত্রায় দুর্গা ঝি ছাড়া কাউকে দেখতে পাইনি। চোখের আমার সত্যি দোষ আছে গোকুল।

আপশোশ কোরো না। দোষ তোমার একার নয়। জন্ম থেকে এতকাল যে দৃষ্টিতে একজন জগৎ দেখে এসেছে, হঠাৎ চোখে তার বদলে নতুন দৃষ্টি কোথা থেকে আসবে। আমরা ও সব ম্যাজিকে বিশ্বাস করি না। আমাদের উচিত ছিল তোমায় দেখিয়ে দেওয়া।

আমি দেখতে চাইলে তবে তো !

গোকুল মাথা নাড়ে, উঁহু তা নয়। তুমি দেখতে চাও বা না চাও, তোমার চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তোমার চোখকে সমীহ করাটাই ভুল হয়েছে।

সুধীন বলে, মা, আমি গোকুলের সঙ্গে যাচ্ছি।

মণি চমকে ওঠে।

সুধীন স্পষ্ট দৃঢ় গলায় বলে, মানা করার আগে শুনে নাও। তুমি বারণ করলেও আমি যাবই। তোমাকে না বলেই যেতাম, গোকুল ছাড়ল না।

মণি বলে, গোকুল কি তোর সমবয়সি, নাম ধরে ডাকছিস ?

মানুষের নাম তো ডাকবার জন্যই।

আমায় তবে মা বলিস কেন ? আমার কি নাম নেই ?

সুধীন একটু থতোমতো খেয়ে যায়। গোকুল মণিকে বউদি বলে বলেই গোড়ায় সে দু-চারবার তাকে গোকুলকাকা বলে ডেকেছিল, গোকুল নিজেই তাকে নাম ধরে ডাকতে বলে দেয়। বয়সের তফাত হবে মোটে কয়েকটা বছরের, তাই যদিও জ্ঞান-বুদ্ধি-কার্যকলাপের পরিচয় পেয়ে অনেক বুড়ো গুরুজনের চেয়ে গোকুলকে সুধীন ঢের বেশি শ্রদ্ধা করে বসেছে, তবু কথাটা মেনে নিয়ে নাম ধরে ডাকতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। নির্দিষ্ট মানুষকে নির্দিষ্ট নামে ডাকার জন্যই যখন নাম, তখন ছোটো বড়োকে নাম ধরে ডাকতে পারবে না, এটা যে কুসংস্কার—এ কথাটাও তার গোকুলের কাছেই শেখা। কথাটা তার বড়ো ভালো লেগেছিল ! সত্যই তো, নাম থাকতে নাম ধরে ডাকা যাবে না, এ কৃত্রিম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দরকার। এখন মণির প্রশ্নে বেচারা ফাঁদে পড়ে যায়। বুঝতে পারে, যতখানি উৎসাহের সঙ্গে নামকে নির্ভেজাল করতে চেয়েছে, ততখানি তলিয়ে বুঝে দেখা হয়নি ব্যাপারটা !

মণি হেসে বলে, তা হবে না, আমার কথার জবাব দেবে, তবে তুমি যেতে পাবে। বড়ো বড়ো কথা বললেই হয় না। নাম ধরে ডাকার জন্যই যখন নাম, আমায় কেন মা বলবে, ওনাকে কেন বাবা বলবে, প্রণব ঠাকুরপোকে কেন কাকা বলবে, আমায় বুঝিয়ে দেওয়া চাই। নইলে তুমি যেতে পাবে না।

আজ সময় নেই মা।

সময়ের খবর জানি না। আজ না যাও, অন্যদিন যাবে। গোকুল আরও অনেকবার ছাত্র আন্দোলন করতে যাবে, আজকেই তো ছাত্রদের শেষ ডেমনস্ট্রেশন নয়।

মুখ কালো করে উনানে ভাতের ডেকচি চাপিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আজ এখন তার প্রথম খেয়াল হয়েছে, এ বাড়িতে এসে কী ভয়ানকভাবে সে উদাসীন হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। প্রথম প্রথম একটু খেয়াল রাখত, সময়মতো নাচ্ছে কিনা, খাচ্ছে কিনা, শুচ্ছে কিনা, শরীর ঠিক রেখে ঠিকভাবে চলছে কিনা। তারপর কখন যে ভুলে গিয়েছে ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে নিজে যে টেরও পায়নি, ওরা কখন নায় কখন খায় কখন ঘুমায় কোথায় যায় কী করে, জানবার কথাও মনে পড়েনি। সুশীলের সঙ্গে চরম ঝগড়ার পর তার মন থেকে যেন মুছে গিয়েছিল এত কষ্টে বিইয়ে এতকাল মানুষ করা ছেলেমেয়েগুলির অস্তিত্বের কথা !

যে সব কথা নিয়ে জীবনে কখনও মাথা ঘামায়নি, এ বাড়িতে এসে সেই সব কথা নিয়েই মেতে গেছে—কংগ্রেস, লিগ, কম্যুনিস্ট পার্টি, স্বাধীনতা, ধনিক, মালিক, শ্রমিক, চাষি, বিপ্লব। এমন মেতেছে যে, ছেলেমেয়েগুলি বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাও খেয়াল করার অবসর থাকেনি।

ছি !

অথবা ছি নয় ?

একটা ফাঁদে আটকে পড়েছিল। মুক্তি পেয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে, সেই ফাঁদের মায়ায় আবার ধিক্কার আসছে মুক্তির উপর। ছি ছি বলার বদলে তার জয়ধ্বনি করা উচিত।

সুধীন এসে বলে, তোমার ধাঁধার জবাব শোনো মা।

আমার ধাঁধা !

মা হল তোমার নাম, তাই তোমায় মা বলি। একটা নামে তো চলে না, সম্পর্ক বোঝবার জন্য নাম দরকার হয়। তাই বাবা কাকা দাদা মামা মাসি পিসি, এই সব নাম। গোকুলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই ওকে গোকুল বলি। বয়সে খুব বেশি বড়ো হলে গোকুলবাবু বলতাম।

মণি হেসে বলে, গোকুল শিখিয়ে দিয়েছে, না ?

মণির অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু গোল বাধায় সুশীল। ক্ষুব্ধ উদাসীন ভাব কাটিয়ে উঠে ক-দিন থেকে সে ধীরে ধীরে পরিবারের দিকে মন দিচ্ছিল। একটা বিষয় সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে এ বাড়িতে বাস করে যতীনের চোরাকারবারে অংশ নিয়ে মোটা রোজগারের আশা করা চলে না। এরা টের পেলে কেলেঙ্কারি হবে। কিছু চোরাবাজারি চাল জোগাড় করে দিলে পর্যন্ত এরা খেতে নারাজ হয় ! কেবল তাই নয়। শুধু এ বাড়িতে বাস করার জন্যই পুলিশ ইতিমধ্যে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করেছে। এখান থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয়।

মণির মনটা একটু ভেজাতে হবে। এখানে এসে যে সব পাগলামি ঢুকেছে মণির মাথায়, বিশ্ব-সংসার ভুলে উদ্ভট সব আদর্শ নিয়ে খেপে গেছে, এ বিকারকে ঘাঁটালে চলবে না। মেয়েদের এ রকম হয়, সংস্কারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অতিরিক্ত মেতে থাকতে থাকতে মাথা বিগড়ে গিয়ে কত মেয়েকে সুশীল ব্রত-পূজা নিয়ে পাগল হয়ে থাকতে দেখছে। ওদিকে না গিয়ে মণি প্রণবদের খাপছাড়া মতামত নিয়ে মেতেছে। ও একই ব্যাপার। কিছুদিন না ঘাঁটিয়ে খুশিমতো চলতে দিলে নিজেই সামলে উঠতে পারবে।

যতীনের সঙ্গে যোগ দেওয়া, যতীনের দয়ায় নিরাপদ এলাকায় ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া, এ সব কথা গোপন রাখতে হবে মণির কাছে। বলতে হবে, নিজেই বাড়ি খুঁজে সে সকলকে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ, এখানে থাকার অনেক অসুবিধা, আর বেশিদিন থাকা উচিতও নয়।

তবু যদি মণি না যেতে চায়—কথাটা ভাবলেও সুশীলের মাথার মধ্যে রাগের যেন ঝিলিক খেলে যায়—তবে মণিকে ফেলে রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যাবে। উপায় কী !

সুধীনকে শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে, এ সময় কোথায় বেরোচ্ছ ?

এমনি একটু কাজে যাচ্ছি।

সুশীল গম্ভীর কিন্তু সস্নেহ কণ্ঠে বলে, কলেজ যাচ্ছ না বলে কি পড়াশোনার সঙ্গেও সম্পর্ক ছেড়ে দিতে হবে ? কলেজ তো চিরকাল বন্ধ থাকবে না।

পড়াশোনা করছি।

সুশীল হুকুম দেয়, এখন আড্ডা দিতে বেরিয়ো না।

আমার জরুরি কাজ আছে।

কী তোমার জরুরি কাজ ?

সুধীন কথা বলে না। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

মণি রান্নাঘর থেকে শুনছিল, বেরিয়ে এসে বলে, যে কাজে যাচ্ছিস বলে যা। না বলে যাবি কেন ? অন্যায় করতে তো যাচ্ছিস না।

সুধীন বলে, আমি গোকুলের সঙ্গে ছাত্রদের মিটিংয়ে যাচ্ছি।

সুশীল চমকে ওঠে,—কীসের মিটিং ? পলিটিক্যাল মিটিং ? গোকুলের সঙ্গে যখন যাচ্ছ—

কীসের জন্য মিটিং শুনে সুশীলের চোখ কপালে উঠে যায়, বলে, কী সর্বনাশ ! তোরা কী ভেবেছিস, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট চলে গেছে, স্বাধীনতা পেয়ে গেছিস, মিটিং করবি, প্রসেশন করবি, পুলিশ কিছু বলবে না ? আগেও অমন ঢের পাওয়ার ট্রানস্‌ফারেন্সের কথা হয়েছে। আগে দাঙ্গা থামুক, স্বাধীনতা হোক, তারপর যত খুশি সভা আর শোভাযাত্রা করিস। তোর যাওয়া হবে না।

মণি বলে, এত ছেলে যাবে, ও যাবে না কেন ?

সুশীল বলে, পুলিশ লাঠি মারবে, গুলি চালাবে খেয়াল আছে ?

মণি বলে, উচিত কাজ করতে গিয়ে অন্য ছেলেরা যদি লাঠি-গুলি খেতে পারে, তোমার ছেলেও পারবে।

আমার ছেলে ! আমার ছেলে ! তোমার বুঝি ছেলে নয় ?

আমার ছেলে বলেই তো যেতে দিচ্ছি। আহ্লাদি জড়পিণ্ড হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে না থেকে, দশটি ছেলের সঙ্গে মানুষ বলে পরিচয় দেবে।

সুশীল গর্জন করে ওঠে, তোমায় পাগলা গারদে পাঠানো উচিত।

মণিও ফুঁসে ওঠে, গারদে রেখেই তো পাগল করেছ !

বাড়ির অনেকে এসে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়েছে, আশা গা ঘেঁষে এসেছে মায়ের, স্ফুরিত চোখে চেয়ে আছে সুশীলের দিকে। গোকুল জুতো-জামা পরে তৈরি হয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে বাইরে যাবার প্যাসেজটার মুখে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনছিল। এবার সে মৃদুস্বরে বলে, অত ভয় পাবেন না সুশীলদা। একটা এত বড়ো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাবে, এটুকু স্বাধীনতা ছেলেদের দিতে হবে বইকী।

সুশীল বলে, তুমি চুপ করো। তুমিই তো ওর মাথাটি খেয়েছ। যত সব ভ্যাগাবন্ড—

ও পাশ থেকে সরস্বতী বলে, ওই ভ্যাগাবন্ডটা আমার ভাই দাদা !

আশা হঠাৎ ক্ষোভে দুঃখে আকুল হয়ে বলে, তুমি কেলেঙ্কারি করছ বাবা। সবার সামনে মাকে অপমান করছ, আমাদের মাথা হেঁট করে দিচ্ছ !

সুশীল তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে শুধু একবার তাকায়, সুধীনকে বলে, সুধী, জামা-জুতো ছেড়ে পড়তে বোসো। তুমি যেতে পাবে না, আমার শেষ কথা।

মণি বলে, সুধী, তুই যদি কাপুরুষের মতো হার মানিস, গোকুলের সঙ্গে না যাস, জীবনে তোর মুখ দেখব না। তোকে পেটে ধরেছি বলে, মানুষ করেছি বলে, প্রায়শ্চিত্ত করব।

গোকুলের দিকে চেয়ে বলে, গোকুল সভায় ছাত্রীরা আসবে না ?

আসবে বইকী। বহু ছাত্রী আসবে।

তবে সুধী একা কেন যাবে ? আশাকেও নিয়ে যাও। আশা তুই যেতে চাস তো ?

আশা উৎফুল্ল হয়ে বলে, চাই, একশোবার চাই।

তবে যা।

গিরীন নিঃশব্দে এগিয়ে এসে সুশীলের হাত ধরে, তাকে এক রকম টেনে ঘরে নিয়ে যায়। সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্যে নয়, সে টের পেয়েছিল হাত ধরে মানুষটাকে সামলানো দরকার, এ রকম অবস্থায় ভয়ংকর কিছু করে বসা আশ্চর্য নয় লোকটার পক্ষে। অসহ্য ক্রোধে অপমানে মণিকে গুরুতর শারীরিক আঘাত করে বসতে পারে। তাকানি দেখে গিরীন অনুমান করেছিল যে ক্রোধের ধোঁয়া সম্ভবত ওই রকম উন্মাদ ইচ্ছার রূপ নিচ্ছে সুশীলের মগজে।

ঘরে নিয়ে গিয়ে সুশীলকে সে চৌকিতে বসায় কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলা শুধু নিরর্থক নয়, অনুচিতও বটে।

সুশীল কী ভাবল সেই জানে, আশ্চর্য রকম তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল, মানুষটাই যেন হতাশায় চুপসে গেছে। পলকে পলকে তার মুখের ভাবের দ্রুত পরিবর্তন, দ্রুত নিশ্বাস, ঝিমিয়ে আসা, হিংস্র ক্রোধের বদলে দুচোখে প্রশ্ন ও হতাশা ফুটে ওঠা, গিরীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে। অস্বস্তিও বোধ করে সে বিশেষ রকম।

সুশীল নিজেই প্রথম কথা বলে অদ্ভুত গলায়,—আমার সংসারটা ভেঙে গেল ! বুঝলে গিরীন, সংসারটা আমার চুরমার হয়ে গেল !

গিরীন মৃদুস্বরে বলে, কী বলব বলুন। এমনি কালের গতি।

কালের গতি ? বুকভাঙা দুঃখ-হতাশা-আপশোশ চাপা আর্তকান্নার মতো ধ্বনি হয় সুশীলের কণ্ঠে—কালের গতি ? কালের গতি কী কেবল আমার বেলা ? সবাই সুখে ঘর-সংসাব কবছে, কালের গতি শুধু আমার সংসাবে ভর করল !

গিরীন তেমনি মৃদুস্বরে বলে, শুধু আপনার সংসার কেন, সকলের সংসার ভেঙে যাচ্ছে, আগেকার ধরনের সংসার। নতুনভাবে গড়ে উঠবার জন্যই ভাঙছে। এ জন্য আপশোশ করে লাভ নেই।

কী বলছ তুমি পাগলের মতো ?

কী বলব তবে বলুন ? আপনি নিজের সংসারটা দেখছেন, আমি এ রকম শত শত সংসার দেখছি। কমবেশি একই ব্যাপার ঘটছে সব সংসারে।

সব সংসারে ?

সব সংসারে। আপনার আমার সংসারে যেমন স্পষ্ট হযেছে, অনেক সংসাবে হয়তো তা হয়নি। দেখলে হয়তো মনে হবে, সেই পুরানো দিনের সুখী শান্ত পরিবার। কিন্তু সবার গতি এক দিকে। মানুষ নিজে সমাজ-সংসার ভাঙছে নতুন সমাজ-সংসার গড়ার জন্য, এ তো আপনার আমার খেয়াল-খুশির ব্যাপার নয় বা ভগবানের ইচ্ছা নয়। মনুষ্যত্বের মানেই হল এই, দরকার হলে মানুষ নিজে যা গড়েছে তা ভাঙবেই, নতুন যা গড়তে চায় তা গড়বেই। নইলে ভাবুন দিকি, মণিবউদি কখনও নিজের ছেলেমেয়েকে পুলিশের গুলির মুখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ? আপনি বলবেন, আপনার সঙ্গে রেষারেষি করে ঝোঁকের মাথায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভাবুন তো, আপনার সঙ্গে এ রকম রেষারেষি কেন ? ছাত্রদের এ রকম বেপরোয়া সভা-শোভাযাত্রা করা কেন ? শুধু সুধী নয়, আশার পর্যন্ত লাঠিগুলির সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়াবার এ উন্মাদনা কেন ?

সুশীল চুপ করে শুনছিল। এবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তোমাদের জন্য। আবার কেন ! কী কুক্ষণেই তোমাদের যে এই আড্ডায় এসেছিলাম ! আগে জানলে কী এমন ঝকমারি করতাম।

গিরীন নির্বিকারভাবে বলে, করতেন। আজ ভুলে গেছেন,—প্রাণ বাঁচিয়ে উপকার করলেও আপনারা চটপট ভুলে যান কিনা, ভুলে গেলেই সুবিধা—নইলে আপনার খেয়াল থাকত কোথা থেকে, কী অবস্থা থেকে আপনাদের উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছিল। মণিবউদির মামা শহরে পৌঁছে প্রায় সারাটা দিন হত্যা দিয়ে তোষামোদ করে পুলিশ এসকর্ট জোটাতে পারেননি, তারপর মরিয়া হয়ে এসেছিলেন এখানে। তাই প্রণব গিয়ে আপনাদের জ্যান্ত উদ্ধার করে এনেছিল। তাই এখনও বেঁচে আছেন। নইলে—

গিরীন আপশোশের আওয়াজ করে।—নইলে, আশেপাশের বাড়ির লোকদের মতোই সপরিবারে অক্কা পেতেন। আপনাদের দক্ষিণের বাড়িটাতে হৃদয়বাবু থাকতেন না ? কপালে ফোঁটা-তিলক কেটে লুঙ্গির মস্ত কারবার করতেন ? তিনি প্রায় সপরিবারে এখন স্বর্গে বাস করছেন, স্বর্গ বলে যদি কোনো বসবাসের জায়গা থাকে। আপনাদের উত্তর দিকের বাড়ির—

চোখ বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে সুশীলের, ভয়ার্ত ভঙ্গিতে স্তম্ভিত শ্বাস টেনে সে বলে, সজনী সেন ?

গিরীন মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

সজনীর ছেলে দুটো ? তার মেয়ে বেবি ?

বেবি হালাতপুরের তেভাগার আন্দোলনে গান গাইতে গিয়েছিল, দলটা রাত্রে আটকা পড়ে যায়। ছোটো ছেলেটা বেঁচে গেছে। বড়ো ছেলে কানাই গুন্ডাদের একজনের গলায় কাটারি দিয়ে কোপ মারে, সে মরে গেছে। কানাইকেও শেষ করে দেয়।

সুশীল খানিক ঝিমিয়ে ঝাঁঝালো সুরে বলে, বেবি এখনও তেভাগার গান গাইছে তো ? যারা তার বাপ-ভাইকে মারল, তাদের মারার গান গাইছে না ?

গিরীন বলে, এক হিসাবে গাইছে, তবে তুমি যে হিসাব ধরছ, সে হিসাবে নয়। যারা তার বাপ-ভাইকে খুন করিয়েছে, তাদের মারার গান গাইছে।

খুন করিয়েছে মানে ?

মানে, যারা দেশের নামে জাতির নামে ধর্মের নামে দিশেহারা করিয়ে মানুষ দিয়ে মানুষ মারায়। সব কারসাজি তাদের, সব দায়িত্ব তাদের। হিন্দু-মুসলমান যারা অন্ধ আবেগে পরস্পরকে আঘাত করেছে, তারা কেউ খুনি নয়, খুনিরা উপর থেকে কল টিপছে। এটা না বুঝলে ওদেরই ফাঁদে গিয়ে পড়তে হয়। ওরাই তো চায় যে বেবির মাথা বিগড়ে যাক, বেবির পক্ষ নিয়ে আপনার আমার মাথা বিগড়ে যাক, ধনিক মালিক মজুব চাষির তফাত ভুলে আমরা জাতের তফাতটা শুধু দেখি। বজ্জাতি করি !

সুশীল নিশ্বাস ফেলে বলে, কী জানি, তোমাদের এ সব রাশিয়ান যুক্তি মাথায় ঢোকে না। আমার বাপ-ভাইকে যখন মারছে, তখন কী করে হিসাব করব, আসলে এরা মারছে না, আড়াল থেকে ওরা মারছে, এ আমার মোটা বুদ্ধিতে ঢুকবে না।

গিরীনও নিশ্বাস ফেলে বলে, বুদ্ধি আপনার মোটা নয়, সূক্ষ্ম। আপনি আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন আপনার নিজের ছাড়া কোনো যুক্তি মানবেন না, আপনাকে কে বোঝাবে বলুন ? বাপ-ভাইকে যখন মারছে, তখন কেউ আমার হিসাবটা করে, না আপনার হিসাবটা করে ? কানাই কি হিসাব করতে বসেছিল লোকগুলি কেন তার বাপকে মারছে, কাদের উসকানিতে মারছে কিংবা ওরা কোন জাতের লোক, আগে সেটা বুঝে তারপর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একা কাটারি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল। আপনি কেবল একমুখো নীতিকথা বোঝেন, সদা সত্য কথা বলিবে। জীবন কিন্তু চলে দুমুখী নীতিতে, সে জন্য চিরন্তন সত্যটা আসলে মিথ্যা। এভাবে না ধরলে জীবনের মানেই বোঝা যায় না।

সুশীল চুপ করে থাকে।

গিরীন নেয়ে-খেয়ে আপিস চলে যায়। সুশীল তার নিজের বিছানায় পা তুলে বসে ভাবে আর পা নাচায়। ভাবতে ভাবতে বেলা বারোটা নাগাদ তার মুখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে, দৃঢ় সংকল্পের ছাপ পড়ে। তখন সে উঠে গিয়ে ধীরভাবে স্নান করে, ধীর শান্ত গলায় মণিকে বলে, আমাকে ভাত দাও।

মণি একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। শান্তভাবে সুশীলের ভাত খাওয়া দেখতে দেখতে একটু ঘৃণাও বোধ করে। ভাবে, আবার কী সুশীল তাকে বিনা ভূমিকায় বিনা প্রতিশোধে ক্ষমা করল ?

খেয়ে উঠে সে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে বিকালে। তার রকম-সকম দেখে সত্যই মনে হয় সকালে স্বামীত্ব ও পিতৃত্বের যে চরম লাঞ্ছনা আর অপমানে সে খেপে যেতে বসেছিল, ইতিমধ্যে সে লাঞ্ছনা অপমান সে হজম করে বসে আছে।

সুধীন ও আশা ফিরেছিল আগেই। তাদের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন দুদিন পিছিয়ে গেছে। অন্য দুটি ছাত্র সংগঠনকে যোগ দিতে ডাকা হয়েছিল, তারা প্রথমে অস্বীকার করে। আজ দুটি সংগঠনের তরফ থেকেই হঠাৎ খবর পাঠানো হয়েছে যে, দুদিন পিছিয়ে দিলে তারা শোভাযাত্রায় যোগ দেবে। এ দুদিন তাদের অন্য অনুষ্ঠান আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে।

গোকুলদের সভায় স্থির হয়েছে, ডেমনস্ট্রেশন দুদিন পিছিয়ে দিলে ক্ষতি নেই। সাম্রাজ্যবাদের যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, দুদিনে তা পুরানো হয়ে যাবে না।

ছেলেমেয়ে দুজনকেই অক্ষত দেহে নিরাপদে ফিরতে দেখে মণির দেহমন হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল। ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে পর্যন্ত হাঙ্গামার মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে অনভ্যস্ত কর্তব্য পালনের রোখটা চড়া পর্দায় তুলে রাখতে অনেক কৃত্রিম ঘৃণা ক্রোধ ক্ষোভ অভিমানের ঠেক্‌নো দরকার হচ্ছিল গার্হস্থ্য জীবনের হীনতা দীনতা পঙ্গুতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে ! ওরা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসতে সে-ও যেন ভালোয় ভালোয় রেহাই পায়। এমনকী, আবেকটা মানুষ যে রহস্যজনক শান্তভাবে ভাত চেয়ে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, সে আবার কোনো একটা কাণ্ড না করে বসে, এ ভাবনাটাও ক্রমে ক্রমে উঁকি দিতে আরম্ভ করে মণির মনে।

সুশীল স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় সময়মতো বাড়ি ফিরতে সে আরও স্বস্তি বোধ করে। মুড়ির বদলে খুচরো ক-খানা বিস্কুট আনিয়ে চা-বিস্কুট দিয়ে নিজে থেকে যেচে জানায়, সুধী আর আশা ফিরেছে।

সুশীল বলে, ফিরেছে ? বেশ।

উদাসীনভাবে কথাটা বলে পরম নিশ্চিন্তভাবে কয়েক চুমুক চা খেয়ে সে আবার বলে, আমি কাল সকালে নূতন বাড়িতে চলে যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাব। তোমার বা তোমার ছেলে-মেয়েদের উপর আমি জোর করব না, ইচ্ছা করলে তোমরা যেতে পার, ইচ্ছা না করলে যেয়ো না।

মণি বলে, ও !

সুশীল বলে, তুমি যদি না যাও তোমার বিয়ের গয়না তুমি রেখো, আমি যা দিয়েছি, সেগুলি নিয়ে যাব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করেছি, সেই টাকায় গয়না দিয়েছি। কবে কোন মজুর উদ্ধারনি ফান্ডে দান করে বসবে, তাতে আমার কাজ নেই।

কয়েক মুহূর্ত মণি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার হাসি পায়।

তার মানে, সঙ্গে যাই তো ভালো, নইলে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না ?

তোমরা যদি সম্পর্ক রাখতে না চাও, গায়ের জোরে সম্পর্ক রেখে লাভ আছে কিছু ?

গায়ের জোরেই তো রাখতে চাইছ সম্পর্ক। সঙ্গে যেতে হুকম দিলে, যদি না যাই, তুমি মালিক, তুমি জিনিসপত্র গয়নাগাঁটি নিয়ে চলে যাবে, খরচপত্র বন্ধ করে দেবে। মোট কথাটা তো এই ?

জোড়হাত করে ক্ষমা চাইছি, আর উপদেশ ঝেড়ো না। দয়া করে রেহাই দাও। তোমরা স্বাধীন, যা খুশি করতে পার। কেবল আমার কি কোনো স্বাধীনতা নেই ? আমি কি দাসখত লিখে দিয়েছি যে তোমাদের খেয়াল-খুশিমতো আমাকে চলতে হবে ?

দাসখত ! দাসী আর দাসীর সন্তানদের জব্দ আর পদানত করার জন্য যে চরম চাল চেলেছে, সে বলে দাসখতের কথা ! এখানে এসে অবধি ছাঁটাই আর লকআউটের কথা শুনছে ক্রমাগত, মালিক চায় খুশিমতো ছাঁটাই করার স্বাধীনতা, মালিক নাকি তারস্বরে নালিশ জানায় যে কী এমন দাসখত লিখে দিয়েছে যে, গাঁটের পয়সা দিয়ে লোক রাখা বা না-রাখার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত থাকবে না ! এতদিন পরে আজ যেন প্রথম মণি বুঝতে পারে, মজুর-কেরানিরা কেন কাজ করার অধিকারকে বলে স্বাধীনতা, ছাঁটাই করার অধিকারকে বলে মানুষকে দাস করে রেখে রক্ত চোষার ভাঁওতা !

কিন্তু বুঝেই কি রেহাই আছে ? মণি ভাবে। ভাবতে ভাবতে তার ভাবনা বেড়ে যায়। দম্ভের সঙ্গে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সাত-আটবছর পরে ফিরে এসেছে। সবই স্বামীর ভরসায়, স্বামীর উপর নির্ভর করে। কাল সকালে স্বামী যদি মালপত্র গয়নাগাঁটি সব কিছু নিয়ে চলে যায়, যদি একটি পয়সা না দেয়, তবে সে কী করবে তার উপার্জনহীন জোয়ান ছেলে আর মেয়ে নিয়ে, কে খাওয়াবে-পরাবে তাদের, দু-মাস বা ছ-মাস পরে হাঙ্গামা মিটে গেলে ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়তে গেলে কে খরচ জোগাবে, কীভাবে সে কী করবে ?

মণির হাত-পা হিম হয়ে আসে।

তখন মাঝরাত্রি। নতুন শীতের থমকানো ধোঁয়াটে কুয়াশার আবরণে মানুষ ও কুকুরের চিৎকারে মাঝে মাঝে ফেটে যাওয়া স্তব্ধতা। মণি চরম ভয় ও হতাশা এবং চরম বেপরোয়া বিদ্রোহের মধ্যে দোল খায়। তখন ভাবে নিজের নিরুপায় অসহায় অবস্থার কথা, ছেলেমেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার কথা, ভবিষ্যতের কথা, সে একেবারে হাল ছেড়ে দেয়। অসম্ভবকে সে কী করে সম্ভব করবে ? মাথা নিচু করে মুখ বুজে গুটি-গুটি ফিরে তাদের যেতেই হবে সুশীলের কাছে, মেনে নিতে হবে শাসন আব জীবনযাপনের নীতি ও বিধান। তা ছাড়া কী আর করার আছে ?

আবার এই অসহায়তার অনুভূতি সর্বাঙ্গে অবশ করে এনে যখন প্রায় দম আটকে দিতে থাকে, তখন বিদ্রোহ গর্জন করে ওঠে তার মধ্যে। ভাবে, চুলোয় যাক ঘর-সংসার, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, ওই পচা জীবনে সুখ-সচ্ছলতার চেয়ে, দাসীপনার চেয়ে হাজার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাও ভালো। সুশীলের মনের মতো মানুষ হওযার চেয়ে ছেলেমেয়েদের কুলি-মজুর হওয়াও ভালো। চলে যাক সুশীল, একা ভোগ করুক তার রোজগার, আবার বিয়ে করে সংসার পাতুক।

কিন্তু ধীরে ধীরে আবার জুড়িয়ে যায়।

সকালে সুধীনকে বলে, আজ আমরা ওনার সঙ্গে অন্য বাড়িতে যাব।

সুধীনের মুখ শুকিয়ে যায়।

পরশু যে আমাদের ডেমনস্ট্রেশন !

ডেমনস্ট্রেশনে যাবি।

সুধীন মাথা নাড়ে।—ওখান থেকে বাবা যেতে দেবে ভেবেছ ? বলতে গেলে মেরে তাড়িয়ে দেবে। এমনিও তাড়িয়ে দেবে ওমনিও তাড়িয়ে দেবে, তার চেয়ে আমি না-ই বা গেলাম নতুন বাড়িতে ? তোমরা যাও।

আশা বলে, আমিও যাব না।

মণি তখন ভেবেচিন্তে সুশীলকে গিয়ে বলে, দ্যাখো, আজ না গিয়ে দুটো দিন পরে গেলে হয় না ? পরশুর পরদিন ? ওরা আর দুটো দিন থাকতে চাইছে।

সুশীল বলে, পরশুর পরদিন ? বেশ !

মণি আরও দুদিন এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে।

বিপ্লবীদের এই বিপজ্জনক আস্তানায়।

সুশীল খুশি হয়েই এ অনুমতি দিয়েছে।

তা, রকম সুবিধে নয় দেখলে স্ত্রীরা এ রকমভাবেই হার মানে, একটা ছোটোখাটো আপসের মধ্যে। ব্যাপারটা তুচ্ছ, দুদিন আগে আর পরে যাওয়ার প্রশ্ন, আর কিছুই নয় ! মণি দুদিন পরে যেতে চাইল এবং তার কথাই রইল। ব্যাস্, ব্যাপার গেল চুকে !

সুশীল পাকা লোক, ঝানু স্বামী। বহুকাল ধরে সে তার জীবন্ত সম্পত্তি বিয়ে করা বউটিকে ভোগদখল করেছে, স্ত্রী বশে রাখার কোনো কৌশল তার অজানা নয়। সে একেবারে নরম হয়ে যায়, মণির সঙ্গে প্রায় সবিনয়ে কথা বলে।

নরম হতে আর আপত্তি কী, সে সত্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে। এ বাড়ির আবহাওয়া আর মণির বিগড়ানো মেজাজ তাকে রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছিল। একেবারে ত্যাগ করার চরম নোটিশ দিয়েও শেষ পর্যন্ত মণিকে টলানো যাবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। এ বাড়ির মানুষগুলির ব্যারাম মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে, মাথা বিগড়ে দেয়। মাথা একবার বিগড়ে গেলে তার পক্ষে কিছুই আর অসম্ভব থাকে না, প্রাণের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রাখা, আদর্শের জন্য লড়াই করা। যেন প্রাণে বেঁচে থাকলে একটা ছেড়ে দশটা আদর্শের অভাব হয় !

ছেলেমেয়ে ডেমনস্ট্রেশনে যেতই ! জিদ যখন ধরেছে, এবারের মতো শখ মিটুক, ও বাড়িতে গিয়ে ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে !

সুশীল তাই এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি। অসময়ে সপরিবারে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, সুযোগ-সুবিধামতো আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে !

মণি আশ্চর্য হয় না। আশ্চর্য হবার দশা সে পার হয়ে গেছে। সে শুধু আকুল হয়ে ভাবে যে এই মানুষটার সঙ্গে, এই মানুষটার নিয়ম মেনে, বাকি জীবনটা কাটাব কী করে ?

খবরের কাগজে, অতি বাজে কাগজেও, কী দ্রুত ঘটনা ঘটছে। এ দেশে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সন্দেহ নেই, সাধারণ মানুষও সেটা জেনে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের কামনাই রূপ নিতে চলেছে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও মধ্যস্থের মারফতে, চারিদিকে ফেটে পড়ছে পরিবর্তনকামী মানুষের বিদ্রোহ। চারিদিকে বিদ্রোহ গুমরাচ্ছে, ফেটে পড়ছে—পুলিশ আর সৈন্যের মধ্যে পর্যন্ত এ আগুন ছড়িয়েছে। এমনই অবস্থা দেশের যে নেতা মশায়েরা একটিবার কোমর বেঁধে হাঁক দিলেই ব্রিটিশ শাসন জনতার ফুৎকারে উড়ে যায় !

জনতার ফুৎকারের হলকায় ব্রিটিশ পাছে ঝলসে পুড়ে উড়ে যায় এই ভয়ে নেতারাই হয়েছে সন্ত্রস্ত, মুশকিল হয়েছে ওইখানে। এত বেশি বিদ্রোহ দেখে নেতারা খুশি নন। বিদ্রোহ হবে মৃদু, অহিংস—আয়ত্তে থাকবে। নইলে নেতৃত্ব থাকে কীসে ?

স্বামীর সাথে আপস করে মণি সাগ্রহে ভোর থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত দেশের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিদ্রোহীদের আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক শোনে।

আর দুটি দিন। দুদিন পরে সব ওলট-পালট হয়ে যাবে।

শুধু মিথ্যার গাঢ় অন্ধকার। শুধু ফাঁকি, শুধু জোড়াতালি। সত্যের একটা ঝলকও চোখে পড়বে না।

মনে মনে মণি সংকল্প করে, না, তা চলবে না। অত শান্তশিষ্ট গোবেচারি ভালো মেয়ের মতো সুশীলের বিধান মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ওর জেলখানায় সে সিঁদ কাটবে! সুশীলকেও সে বুঝিয়ে দেবে, চালাক সে একা নয়। অবস্থার সুযোগ সে একা নিতে জানে না।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। নোংরামিকে মানাই অভ্যাস, নোংরামির সাথে লড়াই করার অভ্যাস নেই। লড়াই করার কথা ভাবলে একটা বিষাদ ঠেলে উঠতে চায়, সব যেন ফুরিয়ে যেতে বসেছে, বেঁচে থাকার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা সার্থকতা নেই।

আগে মণি কাবু হয়ে যেত। নিজের গভীর বেদনা ও অভিমানেই শেষ হয়ে যেত তার রাগ দুঃখ অপমান জ্বালা-বোধ। কোনোদিকে জীবনের কোনো সার্থকতার সম্ভাবনাই তার জানা ছিল না, দশজনের জীবনকে সুস্থ সুন্দর করতে কোমর বাঁধাই যে মানুষের জীবনের সেরা অবলম্বন, এ ছিল শুধু নীতিশাস্ত্রের ফাঁকা কথা। এখন হতাশ বেতনার অনুভূতিতে জোয়ার আসছে একভাবেই, কিন্তু হাল ছেড়ে ভেসে যাবার অবস্থায় মণি আর নেই। নিজেকে সে সামলাতে পারে। প্রক্রিয়াটা ঘটে, ঠেকাতে পারে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা থেকে যায় মানসিক ব্যাপার। বাস্তব পন্থাটা সে অন্য হিসাবে বেছে নেয়।

দ্বিধা তার কাটেনি। স্বভাব তার ঘোচেনি। নয় তো সুশীলের এক হুমকিতে কেন ভড়কে যাবে, সঙ্গে যাবার হুকুম মেনে নেবে! কিন্তু সঙ্গে সে যাচ্ছে না নিজেকে সমর্পণ করে দিতে, আগের জীবন ফিরে পেতে—সে কুৎসিত নিরাপত্তার লোভ আর তার নেই। জীবন সে নতুন করেই গড়বে, সুশীলকেও শিক্ষা দেবে। মানুষ মুক্তির স্বাদ পেলে গায়ের জোরে তাকে বেঁধে রাখা যায় না, সুশীলের এ জ্ঞানটুকু হওয়া দরকার।

সোজাসুজি সুশীলের হুকুম মানতে অস্বীকার করলে, সমস্ত ভয়-ভাবনা তুচ্ছ করে মাথা উঁচু রাখলে, সুশীলের যে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা হত, এটা অবশ্য মণি ভাবে না। সে শিক্ষাও সে পায়নি, অতখানি মনের জোরও তার নেই।

গোকুল বলে, আপনারা তাহলে চললেন ?

মণি বলে, আর কতকাল থাকব ? সেফ এরিয়ায় একটা বাসা যখন পাওয়া গেল—

সুশীলদা জোগাড়ে আছেন !

মণির ভেতরে ছ্যাঁত করে ছ্যাঁকা লাগে। সুশীলের এ বাহাদুরি তার কাছেও লজ্জার বিষয়—তবু গোকুল তাকে খোঁচা দিল !

তোমার সুশীলদার কথা আর বোলো না।

গোকুল একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। মণি যে তার প্রশংসার ব্যঙ্গের দিকটা ধরতে পারবে সে তা ভাবতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আসবেন তো ?

নিশ্চয়। এক ভদ্রলোকের গৃহিণী গৃহকর্ত্রী হয়ে এসেছিলাম, তোমরা মজুরনির অধম চাকরানি করে ফেরত পাঠাচ্ছ। মাঝে মাঝে না এসে থাকতে পারব কেন ! তোমরা খবর নেবে না ?

নিজের কবিতার কথা বলতে গিয়ে একদিন গোকুল আলাপে যে অকৃত্রিম সরলতা এনেছিল, মণি চলে যাবার আগেও সেই ধারা টানছে। উগ্র অভিমানের লাগসই চিকিৎসা করায় মণি সেই দিন থেকে চিকিৎসকের মতো তাকে আপন করেছে। নতুন চেতনা পেতে সে তাকে অনেক ধৈর্যের সঙ্গে সাহায্য করেছে, নিজের চেতনা মণি তার কাছে গোপন করবে না। এই নতুন আত্মীয়তার সূত্রপাত গোকুল আঁচ করছিল। এ আত্মীয়তা স্বার্থবোধের উপরে।

সুশীল কীভাবে কান ধরে মণিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এটা জেনে গোকুলের মধ্যে একটু ঘৃণা জেগেছিল বইকী ! যাওয়ার আগে মণির এ ভাব গোকুল আশা করেনি। সে বলে, খবর নেব বইকী মণিবউদি ! আমাদের তো একটা উদ্‌বেগ থাকবে আপনার সম্পর্কে।

কীসের উদ্‌বেগ ?

গোকুল সরলভাবেই বলে, আপনার মতিগতি কী দাঁড়ায়। আপনি নিজেই বোঝেন কী তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছিলেন, নিজেকে মজুরনির অধম চাকরানি বলে চিনতে পেরেছেন। এবার আপনি কী করবেন সেটাই ভাবনা। বন্ধু থাকবেন না শত্রু হবেন !

মণি বলে, কী বলছ বুঝতে পারছি না ভাই।

গোকুল বলে, দুদিক বজায় রেখে চলার মানুষ আপনি তো নন, আপনার ধাতে সেটা সয় না। ক্রমে ক্রমে হয়তো এখানে যা শিখলেন সব ফাঁকি মনে করা আপনার দরকার হবে—আমাদের ওপর ভীষণ চটে না গেলে চলবে না। এখন যা সব ঘেন্না করছেন, আমাদের ঘেন্না না করে তো আর সে সব ফের পছন্দ করতে পারবেন না !

মণি কথা বলতে গেলে হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে গোকুল জোরের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে ঠিক উল্‌টোটাও যে হবে না তা কিন্তু বলছি না ! কিছুদিনের মধ্যে হয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এসে মজুরদের সাথে ভিড়ে যাবেন ! তবে হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার—মাঝামাঝি কিছু ঘটবে না।

মণি শান্ত সুরে বলে, সংসার করলে তোমাদের বন্ধু থাকা যায় না ? কাজ করা যায় না ?

রাগ করবেন না তো ?

না।

সুশীলদার সংসার করে কিছুই করা যায় না।

এমনি সৃষ্টিছাড়া তোমার সুশীলদার সংসার ? অন্য সংসারে থেকে পারা যায়, এ সংসারে থেকে কিছুই পারা যায় না ?

সৃষ্টিছাড়া নয়, এমন সংসার অনেক আছে। এ সব সংসারে আদর্শকে সংসারের বড়ো করা অসম্ভব, মুশকিল ওইখানে। নতুন আদর্শের জন্য কাজ করা কি শখের ব্যাপার মণিবউদি ? জগৎকে বদলাবার কাজ কি ফাঁকি দিয়ে হয় ? সংসার করেও এ আদর্শ মানা যায়—দরকার হলে আদর্শের জন্য সংসারকে বাতিল করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। শুধু আজকের জগতের নতুন সত্যের জন্য নয়, মানুষ চিরদিন সত্যের জন্য—আদর্শের জন্য নিজের জীবন, নিজের সুখ-সুবিধা স্নেহ-মমতা সংসার সবকিছু তুচ্ছ করেছে। মনুষ্যত্বের আসল মানেই তাই।

গোকুল ভেবে বলে, নীতিকথার মতো শোনালো ? নীতি ছাড়া কী মানুষের চলে ! এ কিন্তু শূন্যে তোলা ফাঁকা নীতি নয় ! বনের মানুষেরও নীতি ছিল—সত্য ছিল। নীতি নিয়েই মানুষ এগিয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে বাস্তব অবস্থাকে বদলে নিজেকে উন্নত করেছে। কিন্তু একটা নীতি নিয়ে নয়—যে নীতি যখন মিথ্যা হয়ে গেছে, মানুষকে এগোবার বদলে পিছনে টেনে রাখতে চেয়েছে, তখন মানুষেরই অগ্রণী অংশ প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়াই করে নূতন নীতি চালু করিয়েছে—মানুষকে বাঁচিয়েছে। মানব সমাজের কাছে নিজের জীবন না ছেলেমেয়ে সংসার ? বাপ-মা ভাইবোন ? এটুকু বোঝার উপর সব কিছু নির্ভর করে। অনেকে বুঝছে। না বুঝে উপায় নেই। তাই না হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সংসারে থেকেও সংসারকে না মেনে, দরকার হলে সংসার চুলোয় পাঠিয়ে নতুন আদর্শের লড়ায়ে ভিড়ে গেছে। ছেলেমেয়েরাই অবশ্য বেশি। তাদের পক্ষে মায়া কাটিয়ে পুরোনো জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলা সহজ।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল বুঝে বলে, সংসারে থেকেও এমন অনেকে এসেছে, সংসারের অন্য সকলে যার কাজকর্ম চালচলন অপছন্দ করে। কিন্তু এ সব সংসারে হয় কী, একজনের মতিগতি সকলে অপছন্দ করলেও সকলের মতে ভয়-ভাবনা দ্বিধা-সংশয় থইথই করে। ছোঁয়াচ তো লেগেছে সবার মনেই। কেউ তাই জোর করে ঠেকায় না। শোভাযাত্রায় মালতীদিকে দেখেছিলেন ? ওই সামনের 'বাড়ির

মালতীদি ? ভূপেনবাবুর স্ত্রী ? দ্যাখেননি ? উনি সামনে ছিলেন। ওঁর তিনটি ছেলে, চারটি মেয়ে। স্বামী আর বড়ো ছেলে চাকরি করে। উনি মজুর-চাষির সঙ্গে ভিড়বেন এটা তাদের পছন্দ নয়। মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়, উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতে যান। মালতীদি পরিষ্কার বলেন, বেশ, তোমরা আমায় না চাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। দুজন নরম হয়ে যায়।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল বুঝে বলে, কেন নরম হয় জানেন ? সবাই ভালো করেই জানে যে, মালতীদির কথা আর কাজে তফাত নেই, নিজের মতে চলতে না দিলে তিনি সত্যিই বেরিয়ে যাবেন। তাছাড়া, পছন্দ না করুক, ওরা জানে মালতীদির আদর্শই খাঁটি ! মা-র জন্য চাকরি যাবার ভয়ে ছেলেই আগে রাগারাগি করত বেশি, এমনিতেই এখন ছাঁটাই তার মাথায় ঝুলছে। আজকাল সে চুপ করে থাকে।

মণি চুপ করে থাকে।

গোকুল একটা বিড়ি ধরায়। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে মণির মুখের দিকে। বুঝতে পারে, উদ্ধত অভিমানের সঙ্গে কোনো ইচ্ছার জোর চেতন মনের সঙ্গে লড়াই করছে। তার কথাটা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

সুশীলদা কিন্তু নরম হবেন না। ওঁর মতিগতি অন্য রকম। সংসারের চেয়ে ওঁর কাছে সংসারের দখলিস্বত্ব বড়ো, তার চেয়ে বড়ো টাকার সুখ, আরাম-বিলাস। মনে-প্রাণে টাকার কাছে দাসখত লিখে দিয়েছেন, বড়ো বড়ো ডাকাতরা যে লুট চালাচ্ছে উনি তার ছিঁটেফোঁটা ভাগ চান, অন্তত যাতে একখানা বাড়ি একখানা গাড়ির মতো আরাম-বিলাস মান-সম্মান হয়।

মণি চুপ করেই থাকে।

বউ ছেলেমেয়ে এই আদর্শ জীবনের বিরোধী হলে, বাধা দিলে, সুশীলদা সইবেন না। দরকার হলে সবাইকে তাড়িয়ে দেবেন, আবার বিয়ে করে সংসার পাতবেন।

মণি এবার হেসে ফেলে। গোকুলের কথাটা হাস্যকর বা অসম্ভব বলে নয়, সুশীল আবার বিয়ে করবে ভাবলেই তার হাসি পায়। বলে, দেখাই যাক। আমার কর্তব্য আমি করব, তাতে না পোষায়, তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমায় চরম নোটিশ দিয়েছে ? আমি তো কাউকে কিছু বলিনি !

নোটিশ ? কীসের নোটিশ ?

এমনিই আন্দাজ করছ তোমার সুশীলদা দরকার হলে আমায় ত্যাগও করতে পারে ?

মানুষ দেখে বোঝা যায় না তার পক্ষে কী সম্ভব ?

কেবল আশা ও সুধীন নয়, তাদের সঙ্গে মণিও গেল বিক্ষোভ প্রদর্শনে। বোধ হয় গোকুলের সঙ্গে আলোচনার ফলে।

গোকুল বলে, আপনি কিন্তু সুশীলদার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে যাচ্ছেন মণিবউদি !

মণি মাথা নাড়ে।

শুধুই সে জন্য নয়। তোমাদের মতো অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতেও যাচ্ছি। এমনি হয়তো যেতাম না, তা ঠিক। কিন্তু কারণ ছাড়া মানুষ কীভাবে এ সব কাজে নামে আমি বুঝি না ভাই। মানুষের মতো জীবন হলে এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কীসের গরজে ? আমার বেলা কারণটা খাপছাড়া হতেও পারে, কিন্তু কারণ তো একটা থাকবেই ! তুমিও কি অকারণে যাচ্ছ, ছাঁকা আদর্শের খাতিরে ? জীবনের কার্য-কারণের সঙ্গে যোগ নেই, সে কী রকম আদর্শ বুঝি না ভাই।

• গোকুল লজ্জিত হয়ে বলে, আমিই ভুল বলেছি।

সভায় লোক হয় প্রচুর। অনেক চেনা মুখ মণির চোখে পড়ে। প্রায় সব মুখই প্রণবদের বাড়ি আসার পর চেনা হয়েছে। সুধী ও আশার গরম গরম উৎসাহ দেখে বারবার মনটা আকুল হয়ে ওঠে মণির—মনুষ্যত্ববিরোধী কত দোষও ওরা অজান্তে অর্জন করেছে তার তো কিছুই অজানা নয়! এই তেজ উৎসাহ আনন্দ উদ্দীপনা সব ওরা পেয়েছে বাইরের জগতে নূতন কালের হাওয়া থেকে—ঘরে পায়নি। বাড়িতে মানুষ করতে চেয়ে কত মিথ্যায় ওদের মগজ বাপ-মা তারা দুজনে ঠেসেছে, কত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা হীনতা শিখিয়েছে। নতুন বাড়িতে আবার সুশীলের খপ্পরে গিয়ে পড়বে! কে জানে কী দাঁড়াবে ওদের মতিগতি? মন তো ওদের কাঁচা, সে মনে মনুষ্যত্বের ভিত্তি তারাই সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য এই, কেবল তার জন্য গোকুলের দুর্ভাবনা দেখা গেছে, সুশীলের সংসারে থেকে ওদের মতিগতি কী হয়ে যেতে পারে, সে জন্য গোকুলের তো কোনো ভাবনাই দেখা যায়নি!

সভার মধ্যেই মণি গোকুলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে। নিজেই একটা যুক্তি জুগিয়ে বলে, তুমি বুঝি ভেবেছ, আমি ঠিক থাকলে ওরাও বিগড়াবে না?

গোকুল বলে, মোটেই না। ওদের কথাই আলাদা, ওরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। ওরা আপনাদের কনট্রোলে নেই, যে সব শক্তি সমাজটাই পালটে দিচ্ছে তাই ওদের গড়ে-পিটে নেবে। তবে, নানা বিরোধী শক্তি আছে, ঘাত-প্রতিঘাত আছে, ভুল পথে গিয়ে বিগড়েও যেতে পারে। কিন্তু সেটাও আপনার বা সুশীলদার জন্য ঘটবে না, বাড়িতে কীরকম জীবন কাটায় সে জন্যও ঘটবে না। ঘরের পুকুরটা আপনারা প্রাণপণ চেষ্টায় ঘিরে-টিরে রেখে মোটামুটি শান্ত রাখতে পারেন কিছুকাল, কিন্তু বাইরে জীবন-সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ওদের বেলা সেটাই আসল।

সভা গরম হয়ে জমে গিয়েছে শুরু থেকেই। প্রতিবাদের পিছনে গভীর ও তীব্র অসন্তোষ। প্রতিবাদটা কুৎসিত কালো কানুনের বিরুদ্ধে, অতি নিরীহ শান্ত পশ্চাৎপদ মানুষেরও তার দেশে যে আইন চালু আছে ভাবলে গা জ্বালা করে, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অমানুষিক আইন মাথার উপর ঝুলছে জেনে সাধারণ মানুষের সাধ্য কী নিজেকে পুরোপুরি মানুষ মনে করে।

মণি অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের ভাবনা একেবারে ভুলে যায়। মন দিয়ে বক্তৃতা শোনে।

নিজের কথা একবার শুধু মণির মনে আসে, ভূষণের বক্তৃতার একটা কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। ভূষণ যখন বলে যে, এই ফ্যাসিস্ত আইন দেশের মানুষকে পদানত দাস করে রাখার অস্ত্র; তখন তার মনের মধ্যে ঝলক মেরে যায় এই কথাটা যে, তাকে আর তার ছেলেমেয়েকে সুশীলের গায়ের জোরে দাসদাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টাও অনেকটা এই রকম। কিন্তু এ রকম জোরালো প্রতিবাদ কি সুশীলের সইত, এ রকম স্পষ্ট নির্ভীক সমালোচনা? কী ভীরুর মতোই সে ঝগড়া করে সুশীলের সঙ্গে নিজের স্বাধীনতার চরম প্রশ্ন নিয়ে।

প্রতিবাদ ও সমালোচনা। দেশটা বিভক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে, সব আয়োজন প্রস্তুত। আংশিক আপসিক স্বাধীনতা, রক্তমাংস বাদ দিয়ে ছাড়ানো চামড়ায় খড়-কুটা-জঞ্জাল পোরা মেকি স্বাধীনতা। যে আইন চালু থাকলে চামড়া শুধরে না নেওয়া স্বাধীনতার মৃত প্রতিমূর্তি অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়, জ্যান্ত বাঘ পোষ মানাবার সাধ মেটার বদলে চামড়ার মরা বাঘে ঘর সাজিয়ে শখ মেটানো পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা।

এক সময় লাঠি ও গুলির কী ভয়ংকর আর্ত আঘাত যে নেমে আসে সভার উপর! কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে যায় যে দেশটা সত্যই স্বাধীন হতে চলেছে!

অনেকের সঙ্গে আশাও জখম হয়। মুখে।

দেশটা স্বাধীন হব হব করছে বলেই বোধ হয় শুধু জখম হয়! দেশটা স্বাধীন হয়ে গিয়ে থাকলে বোধ হয় খুন হয়ে যেত।

আশা ছাড়া প্রণবদের বাড়ির বাসিন্দা আরেকজন আহত হয়, গিরীন। আঘাত গুরুতর হয় গিরীন আর ভূষণের। গিরীনের লেগেছে মাথায়, ভূষণের বুকে। ভূষণের অবস্থাই হয় সবচেয়ে মারাত্মক, কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের হস্তক্ষেপ ছাড়া তার বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না।

সেটা জুটে যায়।

এও একটা সমসাময়িক যোগাযোগের ফল। পাড়ার ডাক্তার অসীম চক্রবর্তী ডাক্তারি পাশ করে বিয়ে করে বাজারের কাছে ছোটো একটি ডিসপেনসারি দিয়ে আজ বছর সাতেক সব রকম গোলমাল থেকে গা বাঁচিয়ে শুধু পশার বাড়াবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করেছে। অনেক চেষ্টায় বছর খানেক আগে একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনেছে। সেই গাড়িতে বউকে শহরের অন্য প্রান্তে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে নিছক কৌতূহলের বশেই সভার পাশে থেমেছিল। গাড়িতে বসেই তারপর সে জমে গিয়েছিল বক্তৃতা শুনে। সে-ও যেন একটা রোগের রোগী, স্পেশালিস্টের বক্তৃতা শুনছে, রোগের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিধান।

হাঙ্গামা শুরু হতেই আতঙ্কে ইঞ্জিন চালু করে গিয়ারের হাতল ধরে সে থেমে যায়। হুস্ করে পালিয়ে যাবার সাধটা হুস্ করেই একান্ত লজ্জাকর হয়ে ওঠে তাব নিজের মরচে-ধরা বিবেকের কাছে। যতই হোক, সে তো ডাক্তার, কত জীবনেব কত রকমেব কত মৃত্যু সে দেখেছে, কত মৃত্যুকে ঠেকিয়েছে, কত মৃত্যু তার সুনিশ্চিত বিশ্বাস আর বিধানের পাশ কাটিয়ে তার রোগীকে গ্রাস করে তাকে পরাস্ত করেছে। প্রাণভয়ে সে পালাবে ? ছি !

দু-একটা প্রাণ হয়তো সে বাঁচাতে পারবে—হাসপাতালে পৌঁছানোর দেরিটুকুই যে প্রাণকে খতম করে দেবে।

গাড়িতে সে স্টার্ট দেয়,—পালাবার জন্য নয়, এখানে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বাখা সম্ভব ছিল না বলে কয়েক হাত তফাতে সরিয়ে নেবার জন্য।

বুক দুরদুর করে কিন্তু তবু সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে ডাক্তার হিসাবে তার কর্তব্য পালনের জন্য।

অসীম ডাক্তারই বাঁচায় ভূষণকে এবং সম্ভবত গিবীনকেও।

অসীমের প্রথমে সংযোগ ঘটে মণি ও আশার সঙ্গে।

আশাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে নিয়ে মণিকে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসতে দেখে কেবল একটি মুহূর্তই অসীম স্তম্ভিত হয়ে থাকে। মণি তার চেনা, রক্ত-ঢাকা মুখ দেখে আশাকে চিনতে পারা না গেলেও মেয়েটি কে সে অনুমান করে নিতে পারে। দিন দশেক আগে মাঝরাত্রে সুশীলেব কলিকের ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে মণির উগ্র মন্তব্য কলিক-ব্যথাতুর স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য হিসাবে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল অসীম ডাক্তারের কাছে !

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে মণি বলেছিল, বড়োলোক বন্ধুর মন রাখতে যা তা খেয়ে আসবে, শরীরে সয় না জেনেও মুখ ফুটে না বলার সাধ্য নেই। বড়োলোকের মন জোগাতে মরতে পারে।

আশা বলেছিল, আঃ ! মাঃ !

অসীমের কাছে কিশোরী মেয়েটির মুখখানা আশ্চর্য রকম কোমল ও সুন্দর মনে হযেছিল। অসীম ডাক্তারের বউ এ পাড়ায় সকলের চেয়ে ফরসা বলে খ্যাত। তার সুন্দরী বউয়ের চেয়ে মেঘলা রঙের এ মেয়েটি তার কাছে বেশি রূপসি ঠেকেছিল।

এদিকে আসুন, এদিকে !

মণি তাকে দেখতে পায়নি। ডাক শুনে থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। ডাক দিয়েই অসীম নেমে আসে।

মণি চিনতে পেরে বলে, ডাক্তারবাবু ? বাঁচা গেল। একবার দেখুন তো।

আশাকে গাড়িতে বসিয়ে এক হাতে এক খাবলা তুলো নিয়ে তার মুখের রক্ত মুছতে মুছতে অসীম অন্য হাতে তার নাড়ী ধরে। অসীম ডাক্তার মানুষ, জ্যান্ত মানুষের গায়ে ছুরি চালিয়ে কাটাকাটি করা তার অভ্যাস, তবু আশার জখমের রকম দেখে তার ভেতরটা একটু শিউরে ওঠে। আশার গোটা কয়েক দাঁত উড়ে গেছে, উপরের ঠোঁটটা চিরে ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে। বাঁ চোখটাও বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে জন্মের মতো।

হাসপাতালে নিতে হবে। ভয় পাবেন না।

না। আর দুজনকে একটু দেখতে হবে ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি। একেবারে ওদের নিয়ে হাসপাতালে যাব।

আশাকে গাড়িতে রেখে অসীমকে মণি, ভূষণ আর গিরীনের কাছে নিয়ে যায়। অসীমের হিসাব সার্থক হয়, সত্যই সে ভূষণের প্রাণ বাঁচায়। নইলে হাসপাতালে নিতে নিতে সে শেষ হয়ে যেত।

তিনজনকে হাসপাতালে রেখে অসীমের গাড়িতেই মণি, গোকুল আর নীলিমা বাড়ি ফেরে।

গাড়িতে মণি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে। সত্যই যেন পরম স্বস্তির নিশ্বাস।

গোকুল, সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম।

এরা তিনজন চুপ করে থাকে। অসীম গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। এরা কী কথাবার্তা বলে শোনার ঔৎসুক্যে তার প্রাণটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল।

তোমাদের বলিনি, আজ বলছি। না বলে পারব না। স্বামী-দেবতা বড়োলোক বন্ধুর চোরাকারবারের এজেন্ট হবেন, বন্ধু বাড়ি জুটিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, যাব না। স্বামী-দেবতা নোটিশ দ্যান, না গেলে ত্যাগ করবেন, বিয়ের গয়না দানসামগ্রী ছাড়া যা কিছু দান করেছেন সব বাজেয়াপ্ত করবেন।

এরা তিনজন চুপ করে থাকে। মণির খোঁপা আলগা হয়ে মুখে চুল এসে পড়েছিল, নীলিমা চুলের গোছাটা সরিয়ে দেয়। অসীম গাড়ির গতি আরও কমিয়ে দেয়।

আমি ভয় পেয়ে হার মানি। পায়ে ধরে দুটি দিনের শুধু সময় চেয়ে নিই। আজ বুঝতে পারছি, তোমরা কেন আমার চোরাবাজারে কেনা চাল খেতে চাওনি। তখন ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি।

এবার গোকুল ধীরে ধীরে বলে, আশাব প্রাণের কোনো ভয় নেই।

অসীম সায় দিয়ে বলে, নাঃ, সে ভয় নেই। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবে।

মণি বলে, মরবে কী বাঁচবে, আর তা ভাবি না। সভায় গিয়েছিল বলে হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দিলেই বা আমি করছি কী ? বাপের চোরাবাজারি পয়সার ভাত-কাপড় ছুঁতে না চেয়ে মেয়েটা নিজেই ন্যাংটো হয়ে উপোস করে মরে গেলেই বা করছি কী ? আমি আজ তোমার সুশীলদাকে নোটিশ দেব গোকুল, ভালো বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বজ্জাতি করার মতলব যদি না ছাড়ে, আমিই ওকে জন্মের মতো ত্যাগ করব।

গোকুল বলে, সাবাস-!

মণি বলে, না, সাবাস বোলো না গোকুল। আমার মনে ভাবনা ঢুকেছে। তাই তো বলছিলাম, সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম। সারা দেশে রক্তপাতের মধ্যে তোমরা যে স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছ, তার মতো হয়ে যাবে না তো আমার স্বাধীনতা ?

আমাদের স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতা পৃথক ভাবছেন ? তাহলেই তো মুশকিল মণিদি !

কথাটা বলে নীলিমা। মণির মুখে আবার চুল এসে পড়েছিল, চুল সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে বিপর্যস্ত খোঁপার সঙ্গে জড়িয়ে দিতে দিতে নীলিমা বলে, স্বাধীনতা পাচ্ছি কই ? দেশের লোক খেপে গেছে, তাই লোক-ঠকানো একটা কিছু পাচ্ছি। স্বামী ত্যাগ করেই কি স্বাধীনতা পাওয়া যায় মণিদি ?

স্বাধীনতা কি এতই সস্তা ঘরোয়া ব্যাপার ? তাহলে আব ভাবনা কী ছিল ? ডাইভোর্স মামলায় মানুষ স্বাধীন হয়ে যেত।

গোকুল কড়া সুরে বলে, দিদি, তুমি বাজে কথা বলছ। মণিবউদি ও কথা বলেননি। মণিবউদি অনেক উঁচু কথা বলেছেন।

তাই নাকি !

নিশ্চয। মণিবউদি বলছেন, ওব মনে খটকা লেগেছে, ত্যাগে কি স্বাধীনতা মেলে ? এটা অত সোজা কথা নয়। কতকাল ধবে এই ভাঁওতা চলছে দেশ জুড়ে, ত্যাগেই স্বাধীনতা, ত্যাগেই মানবতা। ত্যাগ আর তাঁতবোনা এ দেশেব মানুষেব চবম ধর্ম। শুধু মণি বউদির নয়, সারা দেশে লাখ লাখ মানুষেব মনে এই খটকা জেগেছে। ত্যাগ ত্যাগ কবেই তো আমাদের এই দশা। আমাদেব ত্যাগধর্ম দুশো বছর ব্রিটিশের ভোগধর্মের রসদ জুগিযেছে। মণিদি ভাবছেন, সুশীলদাকে ত্যাগ করে আবার অন্যভাবে অন্যের সঙ্গে না আপস কবতে হয। তাই না মণিবউদি ?

খানিকটা তাই বইকী।

গোকুল জোর দিয়ে বলে, ভাববেন না। এ আপনাব ত্যাগ নয, জয় !

হাঙ্গামার খবর পেযে সুশীল ভযে ভাবনায দিশেহারার মতো ছটফট কবছিল। আশার খবর শুনে সে হাহাকাব করে ওঠে, আমাব সর্বনাশ হল !

পরক্ষণে প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষোভে সে আবার দিশে হারায। গর্জন কবে মণিকে বলে, সমস্ত তোমার বজ্জাতি। বজ্জাতদেব সঙ্গে মিলে—

কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি হয় না, মণি তাকে সে সুযোগ দেয না। সে-ও সমানে গর্জে ওঠে, সাবধানে কথা বলো বলছি। মেয়েমানুষ বলে অত অসহায় ভেব না। মান রেখে সমানভাবে কথা না বললে আমিও সইব না !

সুশীল ভড়কে যায়। মণির মুখ দেখে কড়া সুবে কথা বলাব সাহস আর তার হয না। তাব গলা নেমে আসে অনুযোগের সুরে।

আগেই বলিনি তোমাকে আমি, ও সব জায়গায যেতে নেই ? গেলেই এমনি বিপদ হয ?

হয কেন বিপদ ? মানুষ সভাও কবতে পাববে না, বিপদ হবে ! বিপদেব ভযে ভীবুর মতো হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে ঘরে বসে থাকবে ! আমার মেযের একার বিপদ হয়নি।

মেয়ে শুধু তোমার ? একলার ?

তোমারও মেয়ে। কিন্তু তোমার আমাব কারও সম্পত্তি নয়, সে-ও দশজনেরই একজন।

সুশীল গুম খেয়ে যায।

এ সব মণির কাপড় ছাড়ার আগে বোঝাপড়া, আশার রক্তে মাখামাখি কাপড়। মণি স্নান কবে কাপড় ছেড়ে এলে সুশীল মেঘাচ্ছন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করে, তোমাব মতলব কী ?

আমার মতলব ? বলছি। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।

পারবে না ?

মণি মাথা নাড়ে। —পারব না বলাই ভালো। যেতে পারি একটা কড়ারে, কিন্তু আমি জানি, তুমি তা মানবে না। তুমি যদি কথা দাও যতীন চক্রবর্তীর সংশ্রব ছেড়ে দেবে, টাকা রোজগারের যে সব ফন্দি করেছ বাতিল করবে, আর আমাদের নিজের মতে চলতে দেবে, তবে যেতে পারি।

সুশীলের ঠোঁটে ফোটে এক অস্বাভাবিক হাসি, চোখ জ্বল-জ্বল করে। ব্যঙ্গের সুরে সে বলে, সৎ পথে থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেভাবে পারি আমি টাকা রোজগার করব, তোমাদের

খাওয়াবো-পরাবো, তোমরা দয়া করে আমার বাড়িতে থেকে আমার রোজগারে খাবে-পরবে আর যা খুশি করে বেড়াবে। আমি কথাটি কইতে পারব না। তোমার কড়ারটি বেশ !

মণি শান্তকণ্ঠে বলে, তুমি ভুল বুঝলে। আমি শুধু এইটুকু কড়ার করছি, চোরাবাজারি গুন্ডা-দালালের বউ আমি হতে পারব না, মনুষ্যত্ব ভেস্তে যায় এমন হুকুম মানতে পারব না। ঝি-গিরি রাঁধুনিগিরি ছাড়া আমার রোজগারের ক্ষমতা নেই, আমি ঝিয়ের মতো রাঁধুনির মতোই খাটব তোমার সংসারে, স্বামীর মতোই তোমার সেবাযত্ন করব। অন্যায় হুকুম ছাড়া তোমার সব উচিত কথা শুনব। তোমার আমার মতে না মিলুক, তুমি যেমন আমার কথা বিবেচনা করবে, আমিও তেমনি তোমার কথা বিবেচনা করব।

সুশীল গম্ভীর মুখে ভাবনার ভান করে। বলে, ধরো, আমার কঠিন অসুখ। এখন যাই তখন যাই অবস্থা। এদিকে তোমাদের সভা হবে। আমায় একলা ফেলে রেখে তোমবা সভায় যাবে তো ?

মণির হাসি পেলেও হাসি চেপে সে মুখ গম্ভীর করে রাখে। বলে, না, সভায় যাব না। তোমার প্রাণটা বাঁচাবার জন্য যদি সভায় না যেতে হয়, যাব না।

বেশ। তোমার কড়ার মানলাম।

প্রাণটা খুশি হয় না মণির। একটা সভায় গিয়ে সন্তানের রক্তে শাড়ি রাঙিযে আসার পর আর ক-ঘন্টা সময় কেটেছে ! সুশীলের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ, এর কোনো প্রতিকার নেই, কোনো দ্বিতীয় পথ নেই, এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েই সে বাড়ি ফিরেছিল। এ সিদ্ধান্ত বদল হতে পারে সে কল্পনাও করেনি। অথচ শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটা আপস-রফার মধ্যে সুশীলের সঙ্গে সম্পর্কটা তার বজায় রয়েই গেল। তার কথাই মেনে নিল সুশীল, তার যে কড়ার সুশীলের পক্ষে মানা একেবারে অসম্ভব জেনে রেখেছিল, সেই কড়ারটাই সে মেনে নিয়ে তাকে যেন হারিয়ে দিল।

অথচ, আজ প্রায় বিশ বছর যে মানুষটার সঙ্গে ঘরকন্না করে এসেছে, তার শর্ত মেনে নিয়ে তার সঙ্গে ঘরকন্না চালিয়ে যেতে রাজি হলেই বা সে কী করে বলে, তবু আমি তোমার সঙ্গে যাব না !

জীবনে বিপ্লব যেন ভেস্তে গেল একটা আপসের জয়লাভে ! জীবনটার পুরানো দিনের গতানুগতিক দাসীত্বের জের টেনে চলা খতম করে দিয়ে একেবারে নতুন পথে চলার বিপ্লবী পরিকল্পনা যেন পরিণত হল নিছক চলার পথের দিক পরিবর্তনে !

ছাদে গিয়ে আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আধা-নির্জন পথ ও আধা-ঘুমন্ত বাড়িগুলির দিকে চেয়ে মণির চোখে জল আসে। সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক পথে চলতে চেয়ে নিজের কিশোরী মেয়ের রক্তে স্নান করে, সমস্ত সুখ-সুবিধা আরাম-বিলাসের আয়োজন বাতিল করে সমস্ত মানুষের অকারণ অর্থহীন দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাতে চেয়ে, কীভাবে যেন নিজের সংকীর্ণ কুৎসিত জীবনের হিসাব-নিকাশের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছে !

কথা দিলেও কাজে সুশীল তা পালন করতে পারবে না। এভাবে কখনও কারও স্বভাব বদলায়—কোণঠাসা হয়ে একজনের কাছে কথা দিয়েছে বলেই ! এতদিন এখানে বিপ্লবীদের সঙ্গে বসবাস করেও সুশীলের মন-প্রাণ রয়ে গেছে যতীনদের সঙ্গে ভিড়ে কিছু চুরি-চামারির পয়সা করার দিকে—উঁচুগাছের ডালে বসেও শকুনের দৃষ্টি যেমন আটক থাকে ভাগাড়ে।

গোকুলকে বোঝাতে হয় না। মণি নিজেই অনুভব করে। কিন্তু অনুভূতি কি মানুষকে মুক্তির পথ বাতলে দেয় !

ভূষণকে বারবার মনে পড়ে মণির। কারখানায় কালিঝুলি মাখা রুক্ষ কঠোর মূর্তি মানুষটার সোজা ও স্পষ্ট কথাগুলি কানে যেন ঝমঝম করে বাজে। মণির মনে হয়, গোকুলের বদলে ভূষণ বোধ হয় তাকে বলে দিতে পারত তার কী করা উচিত।

রাত বারোটার সময় সুধীন আর প্রণব ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে। সুধীন ছাদে গিয়ে ডাকে, মা ! মণি চমকে উঠে বলে, ওঃ ! চল, তোদের খেতে দি।

পরদিন সকালে দুজন মানুষ আসে এ বাড়িতে, মনসুর ও রশৌনা।

মনসুরের চেহারার কিছু উন্নতি হয়েছে। বোগা হয়ে গেছে রশৌনা।

সেই যে রশৌনা একদিন এসে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে গিয়েছিল, তারপর এ বাড়িতে তাব এই প্রথম পদার্পণ। বন্ধু হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে মনসুবকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খুন কবতে চেষ্টা করার কথা যা সব শুনিয়ে গিয়েছিল, রশৌনা ভোলেনি।

নীলিমাকে সে প্রথম কথাই বলে, মাপ চাইতে এলাম ভাই।

নীলিমা বলে, না চাইলেও চলবে।

মনসুর বলে, গিরীন ?

নীলিমা বলে, বাঁচবেন, সময় নেবে। মাথাটা প্রায় আপনার মতোই ভেঙেছে। আপনি কেমন আছেন ?

আছি ভালোই। কিন্তু ভালো থাকাটাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে। দামি দামি খাদ্য চাই, আরাম চাই, নয় তো ভালো থাকার টাগ অব ওযারে রোগটা জিতে যাবে।

তারা বসে। মণি ও গোকুল এসে যোগ দেয়। নীলিমা আপশোশের আওয়াজ করে বলে, ব্যবস্থা হচ্ছে না কবি ? ভালো থাকার ?

মনসুর বলে, হচ্ছিল—আপসে। আর হচ্ছে না। একটা বোগের খাতিরে কাঁহাতক খুনে-বজ্জাতদের সাথে আপস করা যায় ?

মণি সাগ্রহে বলে, কী ব্যাপার ?

ব্যাপার শুনে সে কিছুই বলে না। সকলের বেলাতেই কী সেই এক প্রশ্ন—হয় মান দাও, নয জান দাও ! এদের কথা সে শুনেছিল কিন্তু এদের সমস্যার কথাটা জানত না। শুধু শুনেছিল, গিরীনেব কবি-বন্ধু হার মেনেছে ; নিজেকে বেচে দিয়েছে।

আজ আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কবি নিজেকে বেচে দেয়নি, একটু বাস্তব পরীক্ষা করে দেখছিল যে কতটুকু সাময়িক আপস করে একটা সামঞ্জস্য সম্ভব। কবি নিজেই সিদ্ধান্তে এসেছে, আপসের পথে হয় না, এ যুগে মাঝামাঝি পথ নেই, হয় এস্পাব নয ওস্পাব। কবির পক্ষে একদিকে টি বি বোগে মৃত্যু সুনিশ্চিত হতে পারে কিন্তু অন্য দিকে রোগেব সঙ্গে লড়াই করার জন্যও দুদিন সুব নবম করে আপস করতে রাজি হওয়া সুনিশ্চিত জীবন্ত মৃত্যুকে বরণ করা।

সে কুৎসিত বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো !

মনসুর বলে, মরতে ভয় পেতাম। ক-মাস বুঝবার চেষ্টা করেছি মরণটা আসলে কী। বন্দুকের গুলি অগ্রাহ্য করে যে মজুর এগিয়ে যাচ্ছে তার কি একদম মরার ভয়টাই থাকে না ? অথবা ভয়টা সে জয় করে ? ব্যাপারটা খানিক বুঝতে পেরেছি। জীবনকে ভালোবাসি বলেই মরতে ভয় পাই, মরণ এড়াতে চেষ্টা করি। এ ভয় স্বাভাবিক। এই ভয়টাই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ভীষণ রকম বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, আমরা সাধারণ মানুষ যাতে মৃত্যুভয়ের গোলামি করি, দাম কষতে ভুল করি। নইলে রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে আমরা যা হই মরে গেলেও তাই হই—তফাত এই যে ঘুমোলে আবাব জীবন্ত হব, মরলে আর জাগব না।

মণি পলকহীন চোখে শুনছিল, সে বলে, তফাতটা কি সামান্য হল ?

মনসুর বলে, বাস্ রে, সামান্য ! সে কথাই তো বলছি। ঘুমটাও জীবনের অঙ্গ। না ঘুমোলে মানুষ বাঁচে না। ঘুমোতে আমরা ভয় পাই না। আরাম পাই। মরলে জীবন শেষ হয়ে যায়, তাই মরতে আমাদের ভয়। মানুষ মানেই তো জীবন, বিচিত্র জীবন।

মনসুর নাক ঝেড়ে পাটের সিল্কের রুমালে মুখ মুছে হাসে।—বাঁচতে চাই, মরতে চাই না। মরণে বাঁচার শেষ। জীবন হারাব, মরণকে ভয় করার এটাই তো তবে আসল কথা। মরলে জীবন শেষ হওয়ার বেশি আর তো কিছুই ঘটে না ? কিন্তু আমাদের মনে কৃত্রিম ভয়ংকর মিথ্যা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মরণ জীবন হারানোর চেয়ে ভীষণ ব্যাপার।

মনসুরের চোখ জ্বল-জ্বল করে। সকলে স্মিত মুখে চেয়ে থাকে তার দিকে। রশৌনা একটা পান আর অনেকটা জর্দা মুখে পুরে দেয়। গোকুল তার শেষ বিড়িটা ধরিয়ে ফেলে।

মরে গেলে জীবনটা হারাবো, এটাই তো সাংঘাতিক ক্ষতি। এটা বুঝতেই তো মরণপণ করে মানুষ চিরকাল লড়ছে। ব্যাটারা করেছে কী, মরে গেলে জীবনের আতঙ্ক বিকারের ভয়াবহ যন্ত্রণা থাকবে, এই ধারণা ছড়িয়েছে। মরলে শুধু জীবনটা শেষ হবে না, আরও বীভৎস অনেক কিছু ঘটবে। আসলে তা তো নয়। মরা মানে চিরন্তন ঘুম, স্বপ্নহীন ঘুম। মরে যাওয়ার পরে আর কিছুই থাকে না, মরা মানে বস্তুর যে বিশেষ সমন্বয় ঘটে একটা জীবন সৃষ্টি হয়েছিল সেই বস্তুগুলির আবার বস্তুর সঙ্গে মিশে যাওয়া।

মনসুর জোর দিয়ে বলে, বাঁচার জন্য লড়াই করব, মরণকে ভয় করব, ঠেকিয়ে রাখব। কিন্তু হিসাবটা কষব সব মানুষের মরণ-বাঁচন ধরে। আমার মরণটা ঠেকাতে যদি মানুষের বাঁচার চেষ্টায় সিঁদ কাটি, সবার বাঁচাকে ঘায়েল করে নিজে বাঁচার চেষ্টা করি, তবে আমার দশা হবে মরার বাড়া। জীবন হবে রোগীর বিকার। মানে, যে জীবন শেষ হবে বলে মরণকে ভয় করছি, সেই জীবনটাই হবে পচাগলা জীবনের ব্যভিচার—ওটা জীবন নয়, জীবনের শত্রুতা। জীবনকে ভালোবাসার জন্যই এ ক্ষেত্রে মিথ্যা কুৎসিত বেঁচে থাকার ওপর ঘৃণা মৃত্যুভয়কে ছাপিয়ে উঠবে।

মণি আপশোশের সুরে বলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া—

মনসুর মাথা উঁচু করে সতেজে বলে, হাল ছেড়ে দেওয়া ? এভাবেই তো হাল ধরা যায় ! এ শালার রোগকে আমি ছেড়ে কথা কইব ? আরও জোরের সঙ্গে লড়ব, আরও লড়ায়ে কায়দায় প্রাণপণে মরণকে ঠেকাব। তাতে যদি ছ-মাস বাঁচি, ক্ষতি নেই। ছ-টা মাস তো মানুষের খাঁটি জীবন ভোগ করব। রোগের খাতিরে দশ-বিশবছর বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করলে শত্রুর গোলাম বনলে শুধু বেঁচেই থাকব, মানুষের মতো বাঁচা হবে না।

মণি চেয়ে থাকে রশৌনার মুখের দিকে। মুখে তার আপশোশের ছাপ নেই, জীবনের লাভক্ষতির হিসাব দুজনের যেন এক হয়ে গেছে। তা তো হবেই। নিজের স্বার্থ ধরে তো এ হিসাব নয় !

আরেকটু বেলা বাড়লে তারা হাসপাতালে খবর নিতে যায়।

হাসপাতাল থেকে আগে ফিরে আসে আশা। কয়েক দিন পরে তার মুখের ব্যান্ডেজ খোলা হয়।

একনজর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মণি চোখ বোজে।

শুনতে পায়, আশা বলছে, আমায় একটা আয়না এনে দেবে গোকুলদা ?

মণি জানালায় সরে গিয়ে তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

প্রতি মুহূর্তে সে প্রতীক্ষা করে মেয়ের মুখে আর্তনাদ শোনার জন্য—আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়েই যে আর্তনাদ ধ্বনিত হবে আশার মুখে। এই মুখ নিয়ে কি বাঁচতে পারবে আশা ? আত্মঘাতিনী হবে না ? তা এর চেয়ে হাসপাতালে মরে গেলেই বোধ হয় চুকে যেত।

খানিক পরে আশার গলায় আর্তধ্বনির বদলে শান্ত কথাই শোনে, বা রে বা, বেশ সুন্দর হয়েছে তো মুখখানা !

গোকুলের কথা শোনে, সত্যি সুন্দর হয়েছে আশা। সুন্দর মুখ দেখে লোকের শুধু আনন্দ হয়, তোমার মুখ দেখে আমাদের আনন্দ হবে, গর্ব হবে। যতবার দেখব !

মণি ফিরে দাঁড়ায়।

গোকুল এক হাতে আশার একটি হাত ধরেছে, অন্য হাত জড়িয়েছে তার কাঁধে। ডান হাতে আশা আয়নাটা উঁচু করে ধরে চেয়ে আছে। আয়নার মধ্যে বোধ হয় সে গোকুলের মুখও দেখতে পাচ্ছে।

মণি আশ্চর্য হয়ে যায়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা যে কতভাবে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিতে পারে। মা হয়ে যে মেয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না, বিনা ভূমিকায় বিনা দ্বিধায় সকলের সামনে এমনভাবে গোকুল তাকে বুকে টেনে নিয়েছে যে সেটা হয়ে উঠেছে একটা স্পষ্ট ঘোষণার মতো !

মণি ভাবে, আমি কী স্বাধীন হলাম ? আমার দাসীত্ব ঘুচল ? কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা ! এ কেমন মুক্তি ক্রীতদাসীর !

দুদিন যেতে না যেতে সে টের পেতে থাকে, অত সহজ নয় স্বাধীনতা লাভ, অত সস্তা নয় মুক্তি। সব বজায় রইল, আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অবস্থা বদল হল না দশজনের, একজন শুধু তার নিজের স্বামীটির সঙ্গে ঘরোয়া খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্ত স্বাধীন নতুন জীবন আয়ত্তে এনে ফেলল—একটা ছেলেমানুষি চিন্তা।

গোকুল যেমন বলে, বিদেশি বড়োলাট দেশে ফিরে গেছে বলেই কি স্বাধীন হয়ে গেছে দেশটা ? আর কিছু না পালটালেও ? কৃত্রিম দেশ বিভাগ থেকে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলেও ? আরেকটা সর্বনাশা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র বিষবৃক্ষের চারার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করলেও ?

নিজের এতকালের আঁটঘাট-বাঁধা সাজানো-গোছানো অভ্যস্ত জীবন ওলট-পালট করে দিয়েছে—একটা আদর্শের জন্য। সুখের সংসারের ভিত্তিটাই ভেঙে ফেলেছে। সব দিক দিয়ে জীবন এবার নতুন করে গড়তে হবে, এখন শুরু হল অনেক দিক অনেক রকমের নতুন সংগ্রাম। এ জন্য দুর্বল মুহূর্তে, অতীত জীবনের মোহে কাবু থাকার অবস্থায়, মণির কিছু কিছু আপশোশ জাগে বইকী। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। সাধারণ মানুষের ও রকম হয়েই থাকে। মণির এই আপশোশের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই এই জন্য যে নত হয়ে আপসের চিন্তা তাতে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় না।

মুখোমুখি লড়াইটা চরমে উঠেছিল, সুশীল চলে যাবার পর ধীর-স্থিরভাবে সবকিছু পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয় স্তরে নেমে আসে আবেগ উত্তেজনা, সমস্তটুকু মনের জোর প্রয়োগ করে জয়লাভের পর জয়টা কী ও কেমন হয়েছে, হিসাব না করে উপায় থাকে না।

সুশীলকে এত তীব্রভাবে ঘৃণা করা কী করে তার পক্ষে সম্ভব হল ? বিশ বছর যার সোহাগে-আদরে খুশি থেকে হাসিমুখে ঘর-সংসার করেছে, মা হয়েছে সন্তানের ?

এখানে এসে মুক্ত স্বাধীন বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়ে টের পেয়ে গিয়েছে বলে যে খুশি থেকে হাসিমুখে করে এলেও আসলে সে দাসীত্বই করে এসেছে, সোহাগ-আদরটা ছিল তাকে ভুলিয়ে রাখার বকশিশ ? অর্থাৎ সোজা কথায় সে কি তার স্বামীকে ঘৃণা ও বর্জন করেছে শুধু এই জন্য যে আরও লাখ লাখ স্বামীস্ত্রীর মতো তাদেরও সম্পর্ক ছিল আদর-সোহাগের প্রলেপ মাখানো প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক ? কোটি কোটি স্ত্রী যে সম্পর্ক মেনে চলেছে আজও, এখানে এসে সে এমনই এক মহামানবীতে পরিণত হয়ে গেছে যে সে সম্পর্কটা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হল না ?

সুশীল যেদিন চলে যায় সমস্ত রাত্রি এই চিন্তাই মণিকে উতলা করে রেখেছিল।

তারপর দু-চারদিনের মধ্যে সে যখন টের পেতে আরম্ভ করে যে ব্যক্তিগত ঘরোয়া যুদ্ধে এত বড়ো জয়লাভ করেও সে জগৎটাকে কণামাত্র বদলাতে পারেনি, তার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি দেওয়ার মতো ত্যাগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি, শুধু তার নিজের মানুষ হিসাবে বাঁচার প্রয়োজনেই দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মরিয়া হয়ে এই জয়লাভ করা তার দরকার ছিল, তখন ধীরে ধীরে আসল কথাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

না, সোহাগ-আদরের ভন্ডামি-ভরা স্বামীর প্রভুত্ব টের পাওয়া তার বিশ বছরের আনুগত্য ঘুচে যাবার একমাত্র বা আসল কারণ নয়। সত্য কথা বলতে কী, তাদের বিশ বছরের সাধারণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেনি, সুশীলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না ! ওই একপেশে কৃত্রিম স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়ায়ে অংশ নেবার যে অধিকার দেশের মেয়ে-পুরুষ ছোটো-বড়ো-নিচু প্রত্যেকটি মানুষের আছে, নিজের সেই অধিকারটুকু সে খাটাতে চেয়েছিল।

সুশীলের সঙ্গে তার লড়াইটাও আসলে তাই।

সুশীল প্রভু আর সে দাসী বলে নয়, দাম্পত্য জীবনে তাদের অনেক মিথ্যা আর অনেক ফাঁকি ছিল বলে নয়,—এখানে এসে শুধু এই দিকটাই তার কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনি, অসহ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে এসে জীবনের আরও একটা সত্যও বড়ো হয়ে উঠেছে তার কাছে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য যার যেটুকু সাধ্য না করলে সে মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়, প্রকারান্তরে পোষা পশুর মতোই মেনে নেওয়া হয় বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব, যার যেটুকু লড়াই সেটুকু যদি সে না করে !

সুশীল তাকে এই লড়াইটুকু করতে দিতে চায়নি, স্বাধীনতার সংগ্রামে সামান্য অংশটুকু না নিলে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকে না যখন জেনে গেছে, তখন সুশীল তাব এই অংশ নেবার জন্মগত অধিকার মানতে চায়নি !

এটাই তার ঘৃণা ও বিক্ষোভকে প্রচণ্ড করে তুলেছে। এই একটি দিকে স্বামিত্বের জোবে তাকে আটকাতে চেয়ে সব দিক দিয়ে স্বামিত্বকে সুশীল তার কাছে অসহনীয় করে তুলেছে। নইলে ভয়ানক মতবিরোধ আর প্রচণ্ড কলহ আগে কি তাদের আর হয়নি ? কিন্তু অল্পেই মিটে গেছে সে সব ঝগড়া ! কারণ, কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার লড়াই আর সে লড়াইয়ে নিজের অংশটুকু গ্রহণ করে মনুষ্যত্ব বজায় রাখার প্রশ্ন উঁকিও মারেনি তাদের কলহে, চরম বিচ্ছেদ ঘটে যাবার মতো আপস-হীনতার চরম পর্যায়ে উঠে যায়নি তাদের ঘরোয়া যুদ্ধ।

মণির মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছিল। সে লক্ষ করছিল, ছেলেমেয়েরাও বেশ ঘাবড়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের ম্লান বিষণ্ণ মুখ আর স্তিমিত নিস্তেজ ভাবটাই তাকে পীড়ন করছিল সবচেয়ে বেশি।

সুশীলের সঙ্গে তার সংঘাতের আসল মর্ম বুঝতে পেরে তার স্বস্তি ফিরে আসে, মুখের কালো ছায়া মিলিয়ে যায়। নিজের ভুল-ত্রুটি আর দুর্বলতার হিসাব-নিকাশটাও এবার সে করতে পারে। সবচেয়ে বড়ো দোষ তার হয়েছে—কাণ্ডজ্ঞান হারানো। এটা নিছক তাদের দাম্পত্য-কলহ নয়, আদর্শের লড়াইও বটে, অথচ ক্রোধে ঘৃণায় দিশে হারিয়ে সুশীলকে সে শুধু আঘাতই করেছে, দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার সামনে আদর্শকে তুলে ধরেনি, স্নেহ আর উদারতা দিয়ে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেনি, পক্ষে রাখতে চায়নি। সে চেষ্টা করলে চোরকারবারি বন্ধুর উসকানিতেও সুশীল হয়তো এতটা বিগড়ে যেত না।

সুশীল আদালতে নালিশ করার পর এই কথাটা আরও বেশি করে তার মনে হয়েছে। সুশীল এভাবে সোজাসুজি মামলা করতে পারে প্রতিহিংসার জ্বালায়, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না।

প্রণব বলে, পিছনে তো আছে আরেকজন, তাকে ভুলো না। খবর পেয়েছি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে দাদা যতীনের কারবারে ঢেলেছে। জমিটা বেচেছে, আপিস থেকে যতটা পারে লোন নিয়েছে—

আমার তোলা গয়নাগুলিও নিয়ে গেছে। লাখপতি হবার এ ভূত কেন ঘাড়ে চাপল ঠাকুরপো ?

লাখপতি ভূত ঘাড়ে চেপেছে যে ! ছেলেবেলা দেখেছি, দাদার ওই একটি সত্যিকারের বন্ধু ছিল। বন্ধু ঠিক নয়, নেতা। যতীন যা বলে, যতীন যা করায়, তাই সই। এতকাল পরে আবার তার পাল্লায় পড়েছে। অনেক সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল তো, সেগুলি মেটেনি। যতীন আজ ভরসা দিয়েছে সে সব স্বপ্ন সফল করে দেবে, জীবনটা সার্থক করে দেবে। দশ কাঠা জমি দিয়ে কী হবে, একতলা কি দোতলা একটা ইঁটের কুঁড়ে তৈরি করার বেশি যদি সাধ্য না হয় ? যতীনের মতো পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড বাড়ি ছাড়া বেঁচে সুখ কী ?

মণি অধীর হয়ে বলে, তা তো বুঝলাম ঠাকুরপো, হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। অত ব্যাখ্যা কোরো না। কিন্তু বড়োলোক বন্ধু বড়োলোক করে দেবে বলে সংসার ছেলেমেয়ে ভেসে যায় ?

ভেসে গেল কোথায় ? তাহলে কি নালিশ করে ?

মণির যেন চমক ভাঙে। তাই বটে, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব, পৈত্রিক বাড়ির অংশ,—এ সবই তো সুশীলের নালিশ। মণি সুশীলকে জানে, আইন-আদালত পুলিশের সাহায্যে স্ত্রী-পুত্র আর সুখী দাম্পত্য জীবন পাওয়া যায়, এটা বিশ্বাস করার মতো ছেলেমানুষ সুশীল নয়, কোনো কোনো দিকে বুদ্ধি তার যতই কম হোক। এ শুধু একটা চাল, বাঁকাভাবে চাপ দেওয়া—আপসের জন্য। আদালতের সমনটা আসলে সুশীলের বাঁকা ঘোষণা,—এখনও মিটমাট করো, আমায় মেনে নাও, নইলে আদালতে প্রকাশ্যভাবে কুৎসিত অপমান মানতে হবে, খবরের কাগজে কেচ্ছা বার হবে।

কিন্তু সুশীলের কি মান-অপমান জ্ঞান নেই ? সে কি জানে না তার স্ত্রী-পুত্রের অপমানে, পিতৃপুরুষ আত্মীয়স্বজন ভাইদের অপমানে তার নিজেরও অপমান ?

প্রশ্ন শুনে প্রণব মুখ বাঁকায়। বলে, তাই তো শুধু দাবির নালিশ করেছে। একটা আমগাছ নিয়ে এ রকম মামলা করা চলে। তোমার আমার অপমান গায়ে লাগবে বলেই নিজের মান বাঁচিয়ে নালিশ করেছে। নইলে—

নইলে ?

প্রণবের মুখ দেখে মণির ভয় করে !

নইলে নালিশটা যত দূর পারে বীভৎস, কুৎসিত ক'রে তুলত। নিজের লজ্জা অপমান গ্রাহ্য করত না, যেভাবে হোক আমাদের অপদস্থ করতে পারলেই হল। আমাদের সঙ্গে তোমার খারাপ সম্পর্ক, তোমাদের আটকে রেখে ভোগ-দখল করছি, তোমাকে দিয়ে আশাকে দিয়ে ব্যাবসা করছি—

ছি ! ছি !

মণি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

কেন মণিবউদি ? মূর্ছা যেতে বসলে কেন ? খবরের কাগজে কি এ রকম মামলার বিবরণ পড় না ? আজকের কয়েকটা কাগজেই আছে—নামকরা কাগজ, অনেক বিক্রি। একটার প্রথম পাতার চার-পাঁচকলম জুড়ে স্বাধীনতা আসছে, তার পাশে দু-কলম জুড়ে মামলার খবর। একজন শিক্ষিত পদস্থ লোক তার স্ত্রী আর শ্বশুর-শালাদের নামে—

থাক, আর শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে ছাড়ছে কে মণিবউদি ? দাদা যে পথ ধরছে সেটা বড়ো পিছল। আজ এইটুকু পেরেছে, দুদিন পরে চরম নালিশের সমন আসবে না—এটা ধরে নিয়ো না।

মণির মুখ দেখে প্রণব ভরসা দিয়ে বলে, তবে পথটা পিছল বলে সবাই যে গড়িয়ে যায়, তা নয়। মানুষ তো—সামলে চলার ঝোঁকটাই স্বাভাবিক। আমি শুধু বললাম যে অসম্ভব নয়, এইমাত্র। কাজেই ভড়কে যেয়ো না।

মণির কথা শুনে বোঝা যায় ভরসা তার দরকার ছিল না। সে মাথা নেড়ে বলে, না ঠাকুরপো, আমি বিশ্বাস করি না। অতটা নামা তোমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি কেবল দাদাকে দেখছ। আমি দেখছি পিছনে দাদার বন্ধুটিকে। শনির চেয়েও সাংঘাতিক ভূত ঘাড়ে চেপেছে, এ সব নালিশ-টালিশ সব তার বুদ্ধি-পরামর্শ।

এ আরেকটা দিক, মণির কাছে যার তাৎপর্য ঠিকমতো ধরা পড়েনি। যার কথায় তাদের বরবাদ করে দিয়ে যথাসর্বস্ব চোরাকারবারে ঢালতে পেরেছে, সুশীল যে তার কতখানি বশংবদ সেটা ক্রমে ক্রমে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এ কথাও তার মনে হয় যে শুধু ওই লোকটার জন্য সুশীল এভাবে বিগড়ে গেছে। ওর সংস্পর্শে না এলে সুশীল হয়তো তাদের পথেই ঝুঁকত, অন্য দিকে যেত তার মনের গতি।

কথাটা ভেবে তাই তার আপশোশ বেড়ে যায় যে শুধু সুশীলের সঙ্গেই সে লড়াই করেছে, শুধু সুশীলকে আঘাত করেছে, পিছন থেকে সুশীলকে গ্রাস করছে যে শয়তানটা তার বিরোধিতা করার কথাটা মনেও আসেনি। ওর কবল থেকে স্বামীকে বাঁচাবার লড়াই যদি সে একটু করত!

মণি প্রশ্ন করে, আমরা এবার কী করব?

প্রণব বলে, সব দাবি-দাওয়া মেনে নেব। বলব যে নালিশ মিথ্যা, তার কোনো অধিকার কেউ অস্বীকার করেনি। তিনি আসুন, স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হোন, বাড়ির অংশ দখল করুন।

শেষকালে হার মানব!

হার মানবে? হার কীসের?

আমায় তো কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে?

প্রণব হাসে, যার যাবার ইচ্ছা নেই, কেউ তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে? যে পথে চলতে চায় না সে পথে চালাতে পারে? সৈন্য-পুলিশের সাঁড়াশি দিয়ে কান টানলেও কানটা হয়তো ছিঁড়ে যায়, প্রাণটা হয়তো বেরিয়ে যায়, কিন্তু মানুষটা যায় না বউদি"!

কিন্তু আমি যে দাবি মেনে নিচ্ছি—

কী দাবি মেনে নিচ্ছ? কান ধরে টানলে সঙ্গে যাবার দাবি? যা হুকুম করবে তাই তুমি করে যাবে, এই দাবি? যন্ত্রের মতো চিন্তা করার স্বভাবটা ছাড়ো তো মণিবউদি! নইলে এ রকম সস্তা চালে ভড়কেই যাবে শুধু, কিছু করতে পারবে না।

প্রণব একটু থামে, শান্ত স্পষ্ট কথাগুলিতে জোর দিয়ে বলে, যে দাবির সমন এসেছে, তার একটাও তুমি অস্বীকার করনি। এ সব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া নয়। আইন-সঙ্গত কেন, তুমি সমাজ-সঙ্গত স্ত্রী, এই সোজা সত্যটা কেন অস্বীকার করতে যাবে? নাবালক ছেলেমেয়ের অভিভাবকত্ব তার বাপের, এটাই বা মানবে না কেন? স্ত্রী বলেই স্বামীর হুকুমে তুমি গলায় দড়ি দেবে কী দেবে না, সে হল আলাদা কথা। বাপ চুরি করতে বললে নাবালক ছেলেমেয়ে চুরি করবে কী করবে না, সেটা আলাদা কথা। আইন-আদালতের সাধ্য আছে এখানে নাক গলায়?

কিন্তু—

তোমার কিন্তু বুঝেছি। স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী বড়ো জোর ভাতকাপড় দেওয়া বন্ধ করবে—ওটাই তো আসল সম্পর্ক। ছেলেমেয়ে অবাধ্য হলে বড়ো জোর তাদের ত্যাজ্য করবে—খেতে পরতে দেবে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব দেবে না।

এবার ব্যাপার বুঝে মণি কথা বলার বদলে কৌটো খুলে একটা পান মুখে দেয়। বাসি পান, কালকের সাজা। আদালতের মারফত স্বামীর সমন পাবার পর পান খেতেও তার সাধ যায়নি।

গোকুল এসে জুটেছিল, এতক্ষণ একটি কথা কয়নি। বলতে হলে গোকুলও কী কম কথা কয়! অথচ চুপ করে থাকার অসাধ্য সাধনাও এই বয়সে সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এতক্ষণে গোকুল বলে, আমায় একটা পান দিন। সর্দি-জ্বরে মুখটা বিশ্রী লাগছে।

ওমা, সর্দি-জ্বর নাকি তোমার ? ঠান্ডা লাগিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?

ঠান্ডা লাগাইনি। কড়া জোলাপ খেয়ে শোব, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

তার কল্পনা কী ছিল, আর আজ মেয়ের কী পাত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে ! পার্থক্যটা বাস্তবতার কঠোর স্পষ্টতা নিয়ে মনে ভেসে আসে মণির। রূপসি মেয়ে ছিল, কুরূপা বিক্ষতা হয়ে গেছে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ের বাজারে তার দাম গেছে শূন্যের কাছে নেবে। নতুন জীবন গড়ার কাজে রত এই সুস্থ সমর্থ বুদ্ধিমান প্রতিভাবান তরুণ মনুষ্যত্বের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই মেয়ে।

এ তার ঝোঁক নয়, গোঁয়ারতুমি নয়। এটুকু জেনেছে মণি। সে জানত, ছেলের মতো তার মেয়েও শুধু ভক্ত হয়ে উঠেছে গোকুলের—এবং তার মেয়ে বলে গোকুল শুধু একটু স্নেহ করে আশাকে। ছেলেমানুষি এত কম গোকুলের যে মুখের ব্যান্ডেজ খোলার পর সকলের চেয়ে বড়ো আশ্বাস ও আশ্রয় দেবার মতো আশাকে অনায়াসে গোকুলের বুকে টেনে নিতে দেখার আগে সেই স্নেহের স্বরূপ সে আঁচও করেনি।

গোকুলের জন্যই নিজের মুখের কুরূপ বীভৎসতাকে সেদিন অতটা সহজে সইতে পেরেছিল আশা।

নগদ টাকা গয়না-গাঁটি দানসামগ্রী সমেত সুন্দরী মেয়েটিকে ভালো একটি ছেলের হাতে সঁপে দেবার দুশ্চিন্তায় কত কাতর ছিল সে আর সুশীল ! মেয়ের আজ রূপ নেই, চাকুরে বাপও নেই !

সুশীল চলে যাবার পর একটা আতঙ্ক জেগেছিল মণির—গোকুল হয়তো পিছিয়ে যাবে। তার মনে সত্যই একটু খটকা ছিল যে, মেয়েটা কুৎসিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে ভালোবাসা বোধ হয় কাঁচা-বয়সি ছেলেটার প্রথম প্রেমের মহৎ ঝোঁক। কিন্তু কুৎসিত হওয়ার উপর মেয়েটার দীনহীনা হওয়ার চোট কি সইবে এ প্রেমের ?

দুদিন গোকুলের রকমসকম দেখে মণি লজ্জার সঙ্গে নিজের কাছে স্বীকার করেছে যে সারা জীবন ক্ষুদ্রতা আর হীনতাকে বড়ো করে দেখে তার নজরটা ছোটো হয়ে গেছে, চিনেও সে মানুষ চিনতে দ্বিধা করে !

দেশ ভাগ হয়ে যাবে, দেশের দুটো টুকরোয় প্রত্যক্ষ শাসনের সুযোগ পাবে কংগ্রেস ও লিগের প্রধানেরা। সময় ঘনিয়ে এসেছে। জল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনার জোয়ার এসেছিল—প্রায় তা বন্যায় পরিণত হয়েছে। আশা-প্রত্যাশা আনন্দ-বেদনা প্রীতিবোধ হতাশা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ ঘৃণার পাশাপাশি মেশামেশির কী উলঙ্গ উত্তাল রূপ !

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝিমিয়ে গিয়ে রূপ নিয়েছে ওলট-পালটের।

সে কী ওলট-পালট ! ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে দিন দিন মারাত্মক বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। অশান্তি উদ্‌বেগ ঝঞ্ঝাট আর প্রাণশক্তির ক্ষয় ও সম্পদের লোকসান—এ সবের সীমা-পরিসীমা থাকছে না।

বিশেষত যাদের ছড়ানো স্বাভাবিক জীবন স্থানে ও স্তানে ভাগ হয়ে যেতে বসেছে।

মুখ ম্লান হয়ে গেছে স্থান ও স্তানের হিন্দু ও মুসলমানের। যে মারাত্মক আত্মহননের মধ্যে জন্মেছে স্থান ও স্তান, কে জানে এই ভাগাভাগিতেই তার ইতি কি না ?

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা ঘরবাড়ি ফেলে পালিয়েছিল ভারাক্রান্ত বুক ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক প্রাণে নিয়ে, ধীরে ধীরে তাদের ফিরে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বস্তিবাসী অনেকের ফিরে যাবার বালাই নেই, ঘর পুড়ে গেছে কিংবা যথাসর্বস্ব লুঠ হয়েছে। অনেকে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করেছে বা করছে। অথবা করার কথা ভাবছে।

এ পাড়ার বস্তির পোড়া ঘরগুলি তেমনি পড়ে আছে, আধপোড়া বাঁশ আর দরজার কাঠ কিছু সাফ হয়েছে হাতে-হাতে। বুড়ি নানির মরণ থেকে যে হাঙ্গামার শুরু তার ধাক্কায় এ ছোটো বস্তির মানুষগুলি কাছের বড়ো বস্তিতে চলে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তাদের দু-চারজনের চেনামুখ এ পাড়ার পথেও দেখা যায়।

উষার নিরীহ গোবেচারি স্বামী ক্ষীণকণ্ঠে বাড়ি ফিরে যাবার কথা বলে। নিজেদের বাড়ি, কত খরচ করে কত কষ্টে তৈরি করা বাড়ি !

বলে, বাঁচলাম। এবার নিজের বাড়ি ফেরা যাবে। আমি তো ভেবেছিলাম, বাড়িটা আমার জন্মের মতো গেল।

উষা বলে, না বাবা, আমার কাজ নেই নিজের বাড়িতে গিয়ে। ও বাড়ি তুমি বেচে দাও।

এখানে, মানে কলকাতায় আর ভয় কি আছে ? কলকাতা তো হিন্দুস্থানে হল ?

ও সব বুঝিনে আমি ! আমি যাব না।

উষার একটা অন্ধ বিদ্বেষ আর আতঙ্ক জন্মে গেছে সাধারণ অনির্দিষ্ট একদল মানুষের বিরুদ্ধে, যারা তার কাছে মুসলমান। উঠতে বসতে সে মুসলমানদের গাল দেয়। রক্তমাংসের জীবন্ত মুসলমান দেখে কিন্তু সে এতটুকু ঘৃণা রাগ বা ভয় অনুভব করে না। কাল্লু, কাসেমরা প্রণবদের কাছে আসা-যাওয়া করে, দরকার হলে উষাই দরজা খুলে তাদের ছাদে নিয়ে যায়, চা খেতে দেয়—কথাবার্তা শোনে ! মনসুর আর রশৌনার সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব হয়েছে। ওরা ধৈর্য ধরে তার একঘেয়ে সুখ-দুঃখের কাহিনি শোনে বলে, বাড়ির লোকের চেয়ে ওদের কাছে নিজের কথা বলতে সে বেশি ভালোবাসে। বলতে বলতে মুসলমানদের গাল দিয়েও বসে !

মনসুর মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। রশৌনা মৃদু হেসে বলে, আমরাও কিন্তু মুসলমান !

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ! আপনাদের কিছু বলিনি !

মনসুর বলে, সেটা না বলতেই বুঝেছি। কাদের বলছেন ঠিক জানেন না, তারা শুধু মুসলমান। মুসলমান হয়েও তারা যে বহুকাল ধরে সাধারণ গরিব মুসলমানের ঘাড় ভাঙছে, মুসলমানেরাই সবে সেটা টের পেতে আরম্ভ করেছে, আপনার দোষ কী।

উষা বলে, ঠিক মুসলমানদের উপর নয়। কী জানেন, আমার রাগটা হল গিয়ে—

সে কথা খুঁজে পায় না।

রশৌনা বলে, আপনার কথা বুঝেছি ভাই।

কেবল নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতেই নয়, ছাদে নানা সমস্যা নিয়ে সকলের আলোচনা শুনতে শুনতেও গরম হয়ে উষা গাল দিয়ে বসে, মনসুর রশৌনা কাল্লু কাসেমদের সামনেই।

প্রণব গোকুলদের খোঁচা দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে উষা বলে, তোমরা বিপ্লবী না হাতি ! ওদের জিততে দিলে, তোমরা আর কথা বলো না।

প্রণব বলে, কাদের জিততে দিলাম ?

কাদের আবার, যাদের জন্য আমার আজ এই দশা ! নিজের ঘরবাড়ি থাকতে চোরের মতো এখানে পালিয়ে রয়েছি। বলতে বলতে গরম হয়ে উষা অভিশাপ দেয় !

তার গোবেচারি স্বামী বিব্রত হয়ে বলে, আহা, চুপ করো না !

মনসুর নির্বিকার হয়ে থাকে, রশৌনার মুখখানা একটু ম্লান দেখায়।

প্রণব সোজাসুজি বলে, এরাও মুসলমান কিন্তু উষা।

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ছি ! ওদের কিছু বলিনি !

কাসেম বলে, আপনার বলতে হবে না, সেটা জানি ! কাদের গাল দিচ্ছেন আপনি জানেন না। ঠিক কথা—কজন সেটা ঠিকমতো জানে ? যারা এত অশান্তি হাঙ্গামা ঘটিয়েছে তাদের আপনি গাল দিচ্ছেন। একটা নাম দিতে হয় তাই একটা নাম দিয়ে দিয়েছেন।

গোকুল বলে, তা নয় হল। কিন্তু সবাই তো অত তলিয়ে বুঝবে না ? গালাগালিটা বন্ধ কর না ঊষাদি ? এটাই চেয়েছে ব্রিটিশ—সাধারণ লোক অবুঝের মতো যত গালাগালি করবে ততই ভালো।

রশৌনা সখেদে বলে, সত্যি, ভাবলেও বুক জ্বলে যায়। রাজনীতি নয় না বুঝল, এই সোজা কথাটা সাধারণ মানুষ বোঝে না ? হিন্দু-মুসলমান লড়তে হয়, ভিন্ন রাষ্ট্র দরকার হয়, পরেই নয় লড়ব, ব্রিটিশরাজ ঘাড়ে চেপে আছে, ওটাকে আগে খতম করি !

গোকুল মৃদু হেসে বলে, সাধারণ মানুষকে অত বোকা ভেবো না ছোটোমাসি। সোজা কথা যদি না বুঝত, সহজে ভোলানো যেত, এত বড়ো বিরাট ভাঁওতার দরকার হত না। ব্রিটিশরাজকে খতম করেছি জেনেছে বলেই ঘর ভাগাভাগিব লড়াইটা তারা ঘটতে দিয়েছে। ওটাই তো মোক্ষম চাল ব্রিটিশের। ব্রিটিশরাজ ঘোষণা করেছে, এবার আমি খতম হয়েছি, তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে এবার পালাতে পারলে বাঁচি—কিন্তু যাবার আগে এসো তোমাদের দু-ভায়ের বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। দুশো বছরের বাপ আমি, দুশো বছর ধরে কত কষ্টে কত যত্নে লালন-পালন করে তোমাদের সাবালক করলাম, আমি চলে গেলে তোমরা মারামারি করে মরবে, সাগরপারে গিয়েও সেটা কী করে সইব বলো ?

মণি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গোকুলের ঘৃণায় বিকৃত মুখের দিকে। গুরুজন হলেও ক্রমে ক্রমে সে প্রায় ভক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোকুলের।

গোকুল তপ্ত নিশ্বাস ফেলে। আবার বলে, সত্যি সত্যি এবার স্বাধীনতা পেয়ে যাচ্ছি বিশ্বাস জন্মাতে না পারলে কারও সাধ্য ছিল এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধায় ?

সরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে, ঘটনাচক্রে এমন যোগাযোগ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতার জন্মের সঙ্গে তার সন্তানও জন্ম নিয়ে বসবে। মাঝখানে কাবু হয়ে পড়েছিল, আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, একটা অদ্ভুত বেপরোয়া সাহস এসেছে তার।

হাসপাতালে মরলে গিরীন স্বর্গে যেত, মরেনি বলে হাসপাতাল থেকে সোজা জেলে গেছে—স্বাধীনতাদাতা ব্রিটিশরাজের বেআইনি বিনা বিচারে আটক রাখার আইনে। খবর শুনে দেহের জড়তা আর অস্বস্তিবোধ কাটিয়ে উঠে মরিয়া হয়ে গেছে সরস্বতী। ডাক্তারের প্রত্যেকটি নির্দেশ ভঙ্গ করছে। তাকে বিয়োতে তার মা মরে গিয়েছিল। কিন্তু তার ঠাকুরমা নাকি দশ মাস পর্যন্ত মস্ত সংসারের হাঁড়ি ঠেলত, প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে বলত, মা গো, গেলাম !—বলে উঠানে তৈরি অস্থায়ী আঁতুড়ঘরে গিয়ে দু-দণ্ডে বিনা কষ্টে মা হত ! সরস্বতীও তাই ঠিক করেছে এই অন্যায় অনিয়মের জগতে একটা নিয়ম অন্তত মানবে—মা হওয়া সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার ! এতটুকু কাবু হলে চলবে না।

সরস্বতী বলে, যাই হোক, এবার তো শান্ত হয়েছে দেশটা ? ভালো হোক, মন্দ হোক, একটা মীমাংসা হয়েছে। এবার নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করা যাবে, কেমন স্বাধীনতা পাওয়া গেছে।

প্রণব একটু হাসে, মনসুরের মুখেও মৃদু হাসি ফোটে। রশৌনা দ্বিধার সঙ্গে বলে, নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করা যাবে কি ?

গোকুল বলে, কী করা যাবে ? ভাগাভাগিতে যার স্বার্থ, সেই হল ভাগ-বাঁটোয়ারা মিটমাটের মধ্যস্থ, কত বিষয়ে কত মামুলি বাধার রাস্তা খোলা রয়েছে জানো ? সত্যি যদি ব্রিটিশ চলে যেত,

এতকাল ধরে ব্রিটিশ যে ভেদাভেদ তৈরি করে গেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে সত্যি যদি হিন্দু-মুসলমান নিজেরা মারামারি করে অর্ধেক সাবাড় হয়ে গিয়েও নিজেরা একটা মিটমাট করত, তাহলে বরং একটা স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব ছিল। ব্রিটিশ করাচ্ছে মারামারি, ব্রিটিশ করে দিচ্ছে ভাগাভাগি মিটমাট, সে কী দেশের সাধারণ মানুষকে খাঁটি স্বাধীনতা দেবার জন্য, নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করতে দেওয়ার জন্য ?

ক-দিন আর লাগবে এ স্বাধীনতা তিতো হতে, দেশের লোকের চোখ খুলতে ? যাদের গর্জনে ব্রিটিশ পিছু হটেছে, আবার তাদের গর্জন শোনা যাবে হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে—সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই।

প্রণব মৃদুস্বরে বলে, অনেককালের পরাধীনতা গোকুল, দৃষ্টি বাঁকা হয়ে আছে অনেকভাবে। হাজার বছরের কুয়াশা জমে চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। চোখ খুললেই কি শত্রু-মিত্র চেনা যায়, সত্য চোখে পড়ে ? অত সোজা করে দিয়ো না ব্যাপারটা !

গোকুল একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, সোজা করিনি। আমি কী নিজেই জানি কতদিনে কী হবে, না ঠিক বুঝতে পেরে গেছি কীভাবে অবিকল কী ঘটবে ? তবে মোটামুটি যা ঘটবেই সে কথা বলছি। চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানকে তো চিরকাল বিদেশি আর স্বদেশি দালালরা শোষণ করতে পারবে না।

প্রণব হাসিমুখেই বলে, চিরকাল মানে জানো তো ? দুশো চারশো বছর না হয় ধরলাম না। দশ-বিশবছর তো ধরতে পারি ? এতেই তুমি খুশি যে আরও দশ-বিশবছর চললেও তার বেশি তো চলবে না ?

গোকুল জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় না। আজ সাধারণ লোকের মধ্যে যে চেতনা এসেছে, ষড়যন্ত্র ভাঁওতা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারলেই—

কে চুরমার করে দেবে ?

আমরা।

প্রণব বলে, এইখানেই তুমি সোজা করে দিচ্ছ ব্যাপারটা। সাধারণ লোকের চেতনা আজ ষড়যন্ত্র ভাঁওতা ভেঙে চুরমার করে দেবার বেশি রকম প্রতিকূল। এ স্বাধীনতা যারা আনছে এখনকার মতো তারাই দখল করে বসেছে চেতনা। স্বাধীনতা নিয়েই সবাই মশগুল, চিন্তিত। তাছাড়া, এ চেতনা বহুকালের জঞ্জালে আবিল হয়ে আছে। প্রাণ দিয়েও এখুনি ষড়যন্ত্র ভেঙে চুরমার করে এ চেতনাকে আরও সচেতন করার সাধ্য তোমার আমার নেই। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এবার এক হয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তারা এবার নিজেরাই হিসাব-নিকাশ নিতে বসবে কী পেলাম আর কী পেলাম না—নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে যাচাই করবে। সঙ্কট বাড়বে, বঞ্চিত হতে হতে খাঁটি স্বাধীনতার কামনা দিন দিন বাড়বে। এর সঙ্গে যদি চলে চেতনাকে সাফ করা, দেশ-বিদেশে ছড়ানো বজ্জাতির আসল চেহারা চিনে চিনে নেওয়া, তবে হয়তো বছরও ঘুরবে না, চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান গর্জন করে উঠবে। কিন্তু এতদিনের পরাধীন পিছনে ঠেলে রাখা দেশ, চেতনা কী দুদিনে সাফ হবে, সহজে হবে। কত অন্ধকার অলিতে গলিতে ঠেলে দিয়ে চেপে পিষে ঠেকিয়ে রাখবে দেশটার সভ্য স্বাধীন জগতে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার সাধ।

গোকুল সতেজে বলে, এ সব তোমার বাজে আতঙ্ক ! শ্রমিক জেগেছে, চাষি জেগেছে, মধ্যবিত্ত জেগেছে—কারও সাধ্য আছে এবার তাদের ঠেকিয়ে রাখে ? আজ সাহস করে ডাক দিলে তারা সাম্রাজ্যবাদের, ধনতন্ত্রের বনিয়াদ ছারখার করে দেবে !

প্রণব ধীরকণ্ঠে বলে, আজ শুধু ডাক দিলেই দেবে ? এতখানি প্রস্তুত আর সচেতন হয়ে আছে তোমার দেশের মানুষ ?

গোকুল সতেজে বলে, আছে। চরম বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

প্রণব চিন্তিতভাবে তাকায় গোকুলের দিকে, উপস্থিত সকলের মুখের ভাব সে লক্ষ করছিল প্রথম থেকেই। গোকুলের কথা শুনতে শুনতে আবেগের তাপে যেন স্ফুরিত হচ্ছিল সকলের মুখ-চোখ, উষার মতো দু-একজন ছাড়া। তার কথা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মুখগুলি, গোকুলের সতেজ উগ্র প্রতিবাদে সে মেঘ আবার কেটে গেছে মুখগুলি থেকে।

উষা মুখ বাঁকিয়ে বলে, তোমাদের সঙ্গে পারি না সত্যি। কী কথা বললাম, কী নিয়ে তোমরা মেতে গেলে। ধন্যি বাবা তোমাদের ! এমনিতেই কি পাজিরা জিতে গেছে ? কথা হচ্ছে মুসলমানদের নিয়ে, তোমাদের শুরু হল স্বাধীনতা, ব্রিটিশরাজ, সাম্রাজ্যবাদ, হাতি-ঘোড়া ! ধন্যি তোমাদের !

উষারা তাদের বাড়িতে ফিরে যায় স্বাধীনতা দিবসের দিন তিনেক আগে।

তার নিরীহ গোবেচারি স্বামী তাকে একদিন বলে, তোমায় যেতে হবে না ও বাড়িতে। বাড়িটা বেচেই দেব আমি। শুধু একবার বেড়িয়ে আসি চলো, দেখে আসি বাড়িটা কেমন আছে।

এমনভাবে সে কথাটা বলে যেন ইট-সুরকির বাড়ি নয়, জীবন্ত কোনো রুগ্ণ পরমাত্মীয় কেমন আছে একবার দেখে আসার কথা বলছে।

তবু উষা বলে, ওরে বাপ রে !

কিন্তু সে যায় ! গিয়ে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে তারই বাড়ির আশেপাশে মহাসমারোহে স্বাধীনতা দিবসকে বরণ করার আয়োজন চলছে। স্বাধীনতা দিবস বলে নতুন রকম বিশেষ রকম কিছু নয়, দুর্গাপূজা ইদ হোলির মতো উৎসবের আয়োজন।

পরদিন উষা মালপত্র এবং স্বামীপুত্র নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়। একদিনে তার সমস্ত ঝাঁঝ যেন উড়ে গেছে, একবার ভুলেও সে তার নির্দিষ্ট শত্রুদের গাল দেয় না রওনা হওয়া পর্যন্ত !

তারা যায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে, সন্ধ্যার পর প্রণব বাড়ি ফিরে মণিকে বলে, মণিবউদি, কাল একবার যাবে তোমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ?

মণি উষা নয়। সে ধীরভাবে কিন্তু উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে বলে ব্যাপার কী ঠাকুরপো ?

ব্যাপার কিছু নয়। বাড়িটা একবার দেখে আসব।

এবার মণি শান্ত কিন্তু কড়া সুরে বলে, ব্যাপার কী ঠাকুরপো ?

প্রণব একটু ভেবে বলে, তবে তোমায় খুলেই বলি। সকালে বলব ভেবেছিলাম।

খুলেই বলো।

বন্ধুটি দাদাকে পথে বসিয়েছে।

মানে ?

লাখপতি হবার লোভে যথাসর্বস্ব বন্ধুর চোরাকারবারে ঢেলেছিল। বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে টাকা তুলেছিল। কাল যতীন ওকে দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে।

মণি চুপ করে থাকে। সুধীন ও আশা এসে দাঁড়াতে প্রণব তাদের বলে, তোরা একটু ঘুরে আয় তো গিয়ে, আমরা একটা পরামর্শ ক'রনি।

মণি বলে, ওরা থাক।

প্রণব ঘামে ভেজা গেঞ্জি-পাঞ্জাবি ছাড়ে। গামছাটা টেনে নিয়ে গা মোছে। শুধু তাকে নয়, সুধীন আশার সামনেও সব কথা খুলে বলবে কিনা চিন্তা করার অজুহাত বলে এটা মণি নীরবে সহ্য করে যায়। সুধীন আশাদের প্রসব করার আগে তার যে রকম উদ্‌বেগ ব্যাকুলতায় ভারাক্রান্ত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা এসেছিল, ভয়ংকর দুর্ঘটনার খবর শোনার প্রস্তুতি হিসাবে তার প্রায় সেই রকম ধীরতা স্থিরতা এসেছে এখন।

হোগলার চালার নীচে শুধু তারে ঝোলানো বালব্‌টা জ্বলছে। প্রণবের এটা আস্তানা, এত সে খাটে অথচ তার এই আশ্রয়ে এলোমেলোভাবে স্তূপাকার বই, লেখা ও সাদা কাগজগুলি চাপা দিতেও কাজে লাগানো হয়েছে একখানা বই। কে জানে কী করে যে দিনেও লেখাপড়ার সময় করে নেয় অফুরন্ত কাজের মধ্যে।

গামছাটা কোমরে বেঁধে প্রণব বলে, যতীনের সঙ্গে আজ দাদার মারামারি হয়ে গেছে। যতীন পুলিশে দিয়েছিল ; সুকুমারবাবু জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাছেই সব শুনলাম।

খুন করতে গিয়েছিল, না ?

মণির প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রণব বলে, কী করে জানলে ?

মণি বলে, এ তো জানা কথা। বন্ধুর হাতের পুতুল ছিল, বন্ধু ঘাড় ভেঙে ডুবিয়ে দিয়েছে, আপনজনের সঙ্গে পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি কবিয়েছে। প্রথম ঝোঁকটাই হবে বন্ধুকে খুন করা।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে মণির। বলে, জামিনের কথা বললে শুনে যেন বেঁচেছি। খুন করলে তো জামিন দেয় না।

খুন করলে অসুখী হতে ?

হতাম। একটা জানোয়ারকে মেরে দশ-বিশবছর জেল খাটবে ?

ঠিক বলেছ। তার চেয়ে বরং যাতে সব চোরাকারবারির ফাঁসির ব্যবস্থা হয় সে জন্য জীবন উৎসর্গ করা ভালো। তবে ভেবো না, যতীনের অবস্থাও দাদার মতোই হবে। বেশি দেরি নেই।

কী করে ?

দাদাকে যেমন যতীন পার্টনার করেছিল, যতীনও তেমনি জীবনলাল মাড়োয়াবির পার্টনার। লাখোপতি হাত মিলিয়েছে কোটিপতির সঙ্গে, পুঁটিমাছ-খেকো রুইমাছ গেছে রাঘব বোয়ালের কাছে। কী হবে তা তো জানা কথাই, স্বাধীনতাটা একবার আসতে দাও।

মণি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দ্বিধার সঙ্গে বলে, দেখা করেছ না কি ?

করেছি। ভালোই আছে। তোমরাও চলো না কাল সকালে ?

প্রণবের প্রথম কথাটা মণি ভুলে গিয়েছিল। প্রণব বাড়ি এসে তাকে প্রথমে শুধু পরদিন সকালে তাদের ফেলে পালিয়ে আসা বাড়িটা দেখে আসার কথা বলেছি। এতক্ষণে মণি যোগাযোগ খুঁজে পায়।

তাই সকালে ও বাড়িটা দেখে আসার কথা বলছিলে ? কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে না গিয়ে খালি বাড়িতে গেল কেন ?

তা তো জানি না।

মণি আর্তনাদের সুরে বলে, ঠাকুরপো ! শিগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডাকো ! এত বোকা তুমি ?

প্রণবও চমকে উঠে বলে, সত্যি তো !

মণি অধীর হয়ে বলে, ট্যাক্সি ডেকে আনো একটা।

সুধীন বলে, চলো না বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় ট্যাক্সি নিয়ে নেব ? গিয়ে ডেকে আনতে দেরি হবে।

চারজনে তারা দ্রুতপদে রাস্তায় নেমে যায়। সরস্বতী প্রশ্ন করে, কিন্তু চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেবার সময়ও তাদের ছিল না। সরস্বতী ও গোকুল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর গোকুল ব্যাপার জানতে দ্রুতপদে এগিয়ে তাদের সঙ্গ নেয়।